THE

Principal Nations of India.

BY

J. MURDOCH, LL. D.

ভারতবর্ষের

প্রধান প্রধান জাতি
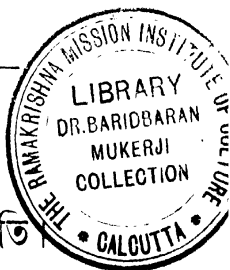
শ্রীহারাণচন্দ্র রাহাকর্ত্তৃক অনুবাদিত।

CALCUTTA:
CHRISTIAN LITERATURE SOCIETY,
23, CHOWRINGHEE.
1896.

সূচীপত্র।

ভারতের প্রধান প্রধান জাতি।

ভূমিকা।

আমরা ভারতবর্ষের নিবাসী, এ দেশীয় ভিন্ন ভিন্ন জাতির বিষয়ে কিছু কিছু জ্ঞাত থাকা আমাদের উচিত। এই পুস্তকে প্রধান প্রধান জাতির বিবরণ লিখিত হইবে। ভারতবর্ষে শতাধিক ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত; অতএব কেবল কএকটী জাতির বিষয় লিখিতে সমর্থ হইলাম, তাহাও আবার, অনেক স্থলে, সংক্ষেপে লিখিত হইবে।

দেশের স্থিতি ও আকারের বিষয় সর্ব্ব প্রথমে বলা বিহিত। ভারতবর্ষ দক্ষিণ-এশিয়ার মধ্যবর্ত্তী প্রায়দ্বীপ। উত্তরে হিমালয় পর্ব্বত, দক্ষিণে ভারত সাগর, ইহার মধ্যস্থলে ভারতবর্ষ স্থাপিত। ইহার পূর্ব্ব সীমানা ব্রহ্ম দেশ ও বঙ্গোপসাগর; পশ্চিম সীমানায় আরব সাগর, বেলুচিস্থান এবং আফ্গানিস্থান।

ইহার যে যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও প্রস্থ, তাহা প্রায় ৯০০ ক্রোশের অধিক হইবে না। সমগ্র দেশের ক্ষেত্র-পরিমাণ—৭৫০০০০ লক্ষ বর্গ ক্রোশ। ইহার আয়তন সমগ্র ইউরোপের তিন ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও অধিক। পৃথিবীস্থ সমস্ত দেশের সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার ক্ষেত্রপরিমাণ টাকাতে আধ আনা। ভারতবর্ষের লোক সংখ্যা ১৮৯১ সালে প্রায় ২৯ কোটি ছিল। পৃথিবীতে যত লোক আছে, তন্মধ্যে ছয় জনের এক জন ভারতবাসী।

ভারতবর্ষীয় বর্ত্তমান জাতি সমূহের অবস্থা বর্ণন করিবার পূর্ব্বে, অন্য যে সকল জাতি এ দেশে প্রবিষ্ট হইয়া আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়াছে, তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিত হইবে।

আদিম নিবাসী।—প্রথমে কোন্ জাতি, কোথা হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিল, আজি পর্য্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহা অবগত হওয়া যায় নাই। স্যর জর্জ কাম্বেল অনুমান করেন, খর্ব্বকায় কৃষ্ণবর্ণ কাফ্রি আকারের এক জাতীয় লোক, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষীয় আর্কিপিলেগোতে বিস্তৃত হইয়াছিল। এক্ষণে আণ্ডামান দ্বীপে তাহাদের কতক আদিম অবস্থায়ই রহিয়াছে।

নর্ম্মদা উপত্যকায় পাথরের সাদা-সিধা রকমের অস্ত্র পাওয়া গিয়াছে, বোধ হয়, এ সকল অতি পুরাকালীয় লোকদের চিহ্ন।
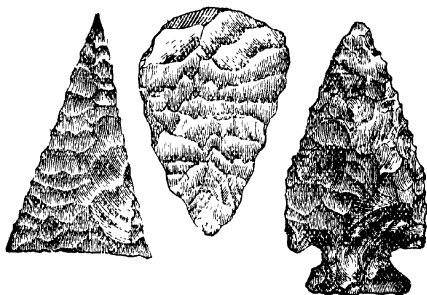
পাথরের অস্ত্র।

ভারতবর্ষের মধ্য-প্রদেশে ও অন্যান্য অঞ্চলে মাটীর ভিতরে পরিষ্কার কুড়াল ও অন্যান্য যন্ত্র পাওয়া গিয়াছে; ইউরোপের উত্তরাংশেও এইরূপ যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। এ সকল সভ্যতার কিঞ্চিৎ উন্নতির লক্ষণ।

ভারতবর্ষে এক্ষণে যেমন কোন২ জাতীয় লোক আছে, তদ্রূপ পরবর্ত্তী কালেও" ছিল, যাহারা এক প্রকার মৃণ্ময় গোলাকার পাত্র নির্ম্মাণ করিতে জানিত। তাহারা আবার যুদ্ধকালে লৌহ-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রের ব্যবহার, এবং তাম্র ও স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার

পরিধান করিত। তাহাদের কোন লিখিত বিবরণ নাই। তাহারাও কিছু রাখিয়া যায় নাই। ফলতঃ তাহারা লিখিতে, বা সামান্য চিহ্নদ্বারা লিখনের কাজ করিতে জানিতই না। ইহারা
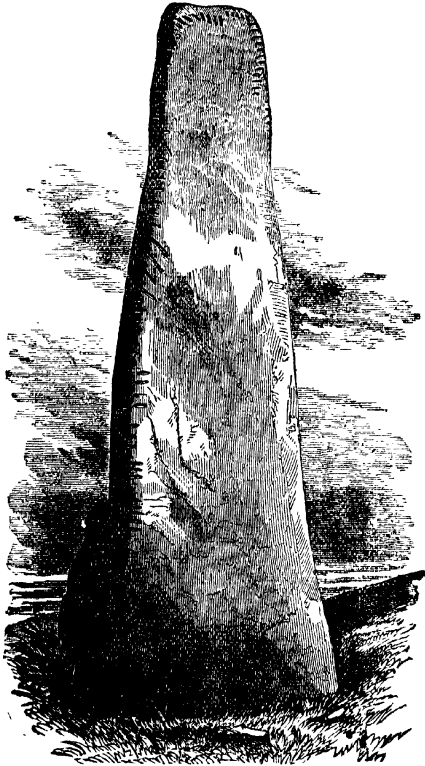
কবর স্তম্ভ।

যে সকল প্রস্তরনির্ম্মিত সামান্য চক্র ব্যবহার করিত, বা সমাধির উপরে যে সকল প্রস্তরখণ্ড পুতিয়া দিত, তাহা পাওয়া গিয়াছে। ইউরোপের সে কেলে লোকেরাও সমাধির উপরে পাথর খাড়া করিয়া দিত। এই সকল কবর হইতে রোমীয় রাজাদের আমলের মুদ্রা বাহির হইয়াছে। অতএব, বোধ হয়, ইহাদের কোন কোন জাতি খ্রীষ্টীয় অব্দের মধ্যেই বর্ত্তমান ছিল। ফলতঃ ভারতবর্ষের উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলে এখনও কোন২ জাতীয় লোক আছে, যাহারা এই প্রাচীন রীতি নীতি পালন করিয়া থাকে।

উত্তর-পূর্ব্বদিক হইতে অসভ্য জাতি।—অতি পূর্ব্বকালে কোন২ জাতীয় লোক মঙ্গলীয় ও চীনেদের পূর্ব্ব-পুরুষগণের সঙ্গে মধ্য-এশিয়ায় বাস করিত। তাহারা উত্তর-পূর্ব্ব গিরিপথ বা পাস দিয়া আসিয়া হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে ও উক্ত পর্ব্বতমালার উত্তর পূর্ব্ব-শাখায় বাস করে।

কোলারীয় জাতীয় লোকেরাও যেন বোধ হয়, উক্ত পথে ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ছড়াইয়া পড়ে। সাঁওতাল বা সন্তালেরা উক্ত কোলারীয় জাতিভুক্ত।

উত্তর-পশ্চিম হইতে দ্রাবিড়ীয় লোকদিগের আগমন।—দক্ষিণ-ভারতবর্ষ-নিবাসী প্রধান প্রদান জাতীয় লোকের পূর্ব্ব পুরুষেরা, বোধ হয়, উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হয়। আরো, বোধ হয়, উত্তর-পূর্ব্ব দিক হইতে কোলারীয় ও উত্তর-পশ্চিক দিক হইতে দ্রাবিড়ীয় জাতীয় লোকেরা দুটী জলস্রোতের ন্যায় আসিয়া মধ্যভারতে পরস্পর সম্মুখীন্ হয়। দ্রাবিড়ীয় লোকেরা বলবান হওয়াতে কোলারীয়দিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তাহাতে তাহাদের অবশিষ্ট লোকেরা তাড়িত হইয়া পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে চলিয়া যায়।

উত্তর-পশ্চিম হইতে আর্য্য-জাতির আগমন।—আর্য্য-জাতি-সমূহের পূর্ব্বপুরুষেরা, বোধ হয়, বহুকাল পূর্ব্বে, মধ্য-এশিয়ার পর্ব্বতাঞ্চলে বাস করিত। ক্রমে তাহাদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়া পড়ে যে, জন্মস্থানে থাকিলে উদরান্নের উত্তম সংস্থান হয় না; সুতরাং দলে দলে ভিন্ন২ দেশে যাইতে আরম্ভ করে। কোন কোন দল পশ্চিম দিকে, যে দিকে সূর্য্যাস্ত হয়, সেই দিকে চলিয়া যায়। আবার কোন কোন দল গিয়া এশিয়া-খণ্ডের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও ইউরোপে বাস করে। ইতিহাসরূপ নাটকের ইহারাই প্রধান নায়ক। আপনাদের আত্মীয়গণকে ভিন্ন২ দেশে চলিয়া যাইতে দেখিয়া, হিন্দুরা হয় ত পূর্ব্ব দিকে যাত্রা করত সিন্ধু-নদের উপত্যকা ভূমির দিকে আইসে। তাহারা অনেক লোক, স্ত্রী পুত্র, দাস দাসী ও গোমেষাদি লইয়া যাত্রা করিয়াছিল। সম্ভবতঃ পেশবারের নিকটবর্ত্তী পর্ব্বতপথে তাহারা ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

তৎকালে ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভূমি জঙ্গলময় ছিল; এখানে সেখানে দুই একখানি গ্রাম বা নগরে সে কালের লোকেরা বাস করিত। তাহারা কৃষ্ণবর্ণ ছিল, এবং আর্য্যেরা তাহাদের ভাষা বুঝিতেন না। আর্য্যদিগের বড়ই জাত্যভিমান ছিল, আর সকল জাতীয় লোককে অত্যন্ত ঘৃণা ও তুচ্ছ তাচ্ছল্য করিতেন। নবাগত আর্য্যেরা গৌরবর্ণ ছিলেন, আপনাদের গৌরবর্ণের বড় অহঙ্কার করিতেন, এই জন্য সংস্কৃত বর্ণ শব্দে জাতি বুঝায়। তাঁহারা দেশের আদিম-নিবাসীদিগকে "কৃষ্ণকায়" বলিতেন। আবার আর্য্যগণের নাসিকা বড়, কিন্তু আদিম-নিবাসিদিগের নাসিকা ছোট ছিল, এ জন্য আর্য্যেরা তাহাদিগকে "ছাগনাসিক" বা "নাসিকাশূন্য" বলিতেন। বেদের এক জন সূচক আপনার সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট দেবতার প্রশংসার্থ "ব্রাহ্মণ" স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। যজ্ঞের বিঘ্নকারী, মাংসাশী, কাঁচা খেকো, ইত্যাদি

বলিয়া বেদে সে কেলে লোকদিগের বর্ণনা আছে। আর্য্যেরা তাহাদিগকে দস্যু বলিতেন, অনেকে বলেন, সে কালে দস্যু শব্দের অর্থ শক্র ছিল। আদিম-নিবাসীদিগের এত লোককে আর্য্যেরা আপনাদিগের অধীনে রাখেন যে, শেষে ভৃত্যকে "দাস" বলা হইত। এই দস্যুদের অনেক জাতি বর্ত্তমান ভারতবর্ষের ভিল বা নাগা, কুকি ইত্যাদি বন্য লোকদিগের ন্যায় অসভ্য, আবার অনেক জাতি কিয়ৎপরিমাণে সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বেদের কোন কোন শ্লোকে দস্যুগণের ঐশ্বর্য্যের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, যথা, দাসের ধন জয় কর; তাহার সঞ্চিত ধন যেন আমরা ইন্দ্রের সাহায্যে বণ্টন করিয়া লইতে পারি; হে ইন্দ্র, হে মহাবল, তুমি নিজ বজ্র দ্বারা পুরুর ৯৯টী নগর ভগ্ন করিয়াছিলে।

আর্য্যেরা আসিয়া ক্রমে আদিম-বাসিদিগের বন, ক্ষেত্র ও গ্রাম অধিকার করিয়া লয়েন। আদিম-নিবাসিরা শক্রসঙ্গে যথা-সাধ্য যুদ্ধ করিয়াছিল। আদিম-নিবাসিরা কৃষ্ণকায়, অসভ্য, কর্কশ ভাষাবাদী ছিল, এবং রাত্রিকালে আক্রমণ করিতে আসিলে, বা আক্রান্ত হইলে, বিকট চীৎকার করিত, এই জন্য আর্য্যেরা তাহাদিগকে অসুর বলিতেন।

আদিম-নিবাসিগণ অপেক্ষা আর্য্যগণ অধিকতর বলবীর্য্যশালী ছিলেন। তাহাদিগকে আসিতে দেখিলে দস্যুরা হয় পলাইয়া যাইত, না হয় আর্য্যেরা তাঁহাদিগকে দাস করিয়া রাখিতেন। তখন শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণকায়, বিজয়ী ও বিজিত, এবং স্বাধীন ও দাস, এই রূপ প্রভেদ ভারতে প্রথমে আরব্ধ হয়। প্রথমে শূদ্রেরা আর্য্যগণের অধীনতা স্বীকার করে, তদনুসারে অনার্য্য মাত্রকেই শূদ্র বলা হইত। এই প্রকারে আর্য্যে অনার্য্যে শত শত বৎসর যুদ্ধ চলে। কোন কালেই আর্য্যকর্ত্তৃক অনার্য্যগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয় নাই। বেদেতে সিন্ধু-নদেরই বহুল উল্লেখ দেখিতে পাই, গঙ্গার নাম কেবল দুই বার উল্লেখিত হইয়াছে।

আর্য্যেরা ক্রমাগত পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সরস্বতী নদীর তীর পর্য্যন্ত গমন করেন; বৈদিক সময়ে উক্ত নদী আর্য্যাধিকারের পূর্ব্ব সীমানা ছিল।

কালক্রমে আর্য্যেরা পূর্ব্ব দিকে অগ্রসর হইয়া বঙ্গদেশে, ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইয়া দাক্ষিণাত্যে গিয়া বাস করেন। দক্ষিণ ভারতবর্ষের দ্রাবিড়ীয় জাতিরা বড় ক্ষমতাশালী ছিলেন, ব্রাহ্মণদিগের নানা ধর্ম্মানুষ্ঠান যদিও তাঁহারা অবাধে অবলম্বন করেন, তথাপি উত্তর ভারতের লোকদিগের ন্যায় তাঁহারা আর্য্যগণের সঙ্গে মিশিয়া যান নাই।

পারসিক।—ভারতবর্ষের পারসিক বা পারসিরা পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছে। পারস্য দেশ মুসলমানদিগের হস্তগত হইলে, পারসিক ধর্ম্মের প্রতি তাড়না উপস্থিত হয়, তজ্জন্য অনেক পারসি ভারতবর্ষে আসিয়া বাস করে।

মুসলমান।—৭১১ খ্রীঃ অব্দে আরবেরা সিন্ধুদেশের এক অংশ হস্তগত করে। কিন্তু পর শতাব্দীতে হিন্দুরা পুনরায় সেই অংশ দখল করেন। ইহার পর বহু বৎসর কাল ভারতবিজয়ের চিন্তা মুসলমানদের মনেও হয় নাই। ৯৭৭ শালে লাহোরের মহারাজা জয় পাল গিজনির সবক্তাজিনকে আক্রমণ করিতে গিয়া পরাজিত হয়েন। সবক্তাজিনের পুত্র মহম্মদ গিজ্‌নি অনেক বার ভারতবর্ষ আক্রমণ, জয় ও লুঠ করেন। কিন্তু মহম্মদ ঘোরিকেই ভারতে মুসলমান রাজত্বের পত্তনকর্ত্তা বলা উচিত। ১২০৬ শালে তাঁহার মৃত্যু কালে, উত্তর-ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ তাঁহার অধীন ছিল।

১৫২৬ সালে, মোগল সাম্রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা বাবর ভারতবর্ষ জয় করেন, অনন্তর দুই শত শতাব্দী কাল তদ্বংশীয় লোকেরা ভারতে রাজত্ব করেন। ইহাতে ভারতবর্ষে মুসলমান ধর্ম্ম বিল-

ক্ষণ বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এক্ষণে দেশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ লোক মুসলমান।

পর্ত্তুগীজ।—১৪৯৮ খ্রীঃ অব্দে ভাস্কো দি গামা কালীকূটে পঁহুছেন। তাহার পরে আরো পর্ত্তুগীজ নাবিকেরা আসাতে পশ্চিমে স্থরাট হইতে পূর্ব্বে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত নানা স্থানে পর্ত্তুগীজেরা কুঠী স্থাপন করে।

ইংরাজ।—১৬০০ খ্রীঃ অব্দে, রাণী এলিজাবেথের রাজত্ব কালের শেষ ভাগে, বিদেশে বাণিজ্য করণার্থ ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে এক বণিক সম্প্রদায় স্থাপিত হয়। ১৬২০ শালে তাঁহারা আসিয়া সর্ব্বপ্রথমে স্থরাটে কুঠী স্থাপন করেন। ১৬৩৯ সালে তাঁহারা মান্দ্রাজ ক্রয় করেন। এক্ষণে কলিকাতা নগর যে স্থানে স্থাপিত, এই স্থানে ১৬৯৮ শালে তিন খানি গ্রাম ক্রয় করা হয়। রাজারা পরস্পর যুদ্ধকালে ইংরাজদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। কালক্রমে স্থযোগ মতে ইংরাজেরা দেশের একাধিপতি হইয়া পড়িয়াছেন।

দিনেমার, ওলন্দাজ, ফরাসি ইত্যাদি ইউরোপীয়েরাও এ দেশে আইসে, কিন্তু তাহাদের সংখ্যা বড় কম।

এক্ষণে ভারতে যে সকল প্রধান জাতীয় লোকের বাস, তাহাদের বিবরণ লিখিত হইবে। প্রথমে বাঙ্গালি জাতির বিবরণ বিবৃত করি।

বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ান ও তাহার কন্যাদ্বয়।

বাঙ্গালি।

হিন্দি ভাষাবাদী লোকের পরেই বাঙ্গালা ভাষাবাদী লোকের সংখ্যা অধিক। বাঙ্গালিদিগের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি; ভারতবর্ষে যত লোক আছে, তাহার সাত জনের এক জন বাঙ্গালি।

দেশ।—প্রাচীন বঙ্গ আর্য্যভারতের দূরবর্ত্তী পঞ্চরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। ভাগলপুর হইতে দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভূমি-খণ্ড বঙ্গদেশ নামে পরিচিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে বঙ্গদেশ আরও বিস্তৃত হইয়াছে।

বাঙ্গালা নদীমাতৃক দেশ। এদেশে দুটী প্রশস্ত নদীর দুটী উপত্যকা বা সমতল ভূমি আছে। পশ্চিম দিকের তলভূমি দিয়া গঙ্গা উত্তর-ভারতের জলরাশি আনিয়া সমুদ্রে ঢালে। পূর্ব্ব দিকের উপত্যকা দিয়া, তিব্বতের সমভূমি নিঙ্গড়াইয়া আসিয়া, ব্রহ্মপুত্র নদ বঙ্গদেশে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। উত্তর-বাঙ্গালায় হিমালয় শ্রেণীসম্ভূত ছোট ছোট পাহাড় উঠিয়া সমভূমিকে বন্ধুর করিয়া তুলিয়াছে। দেশের প্রায় মধ্যস্থলে আসিয়া দুটী প্রকাণ্ড নদী মিলিত হওতঃ উভয় পার্শ্বে নানা খাল বাহির করিয়া দিয়াছে। তাহাতে স্রোতোবেগ হ্রস্ব হওয়াতে, যে মাটী জলের সঙ্গে আইসে, তাহা বরাবর সহজে সমুদ্রের দিকে চলিয়া যাইতে পারে না। সুতরাং খাল দিয়া অনেক মাটী চলিয়া যায়, আবার অনেক মাটী উভয় তীরে থাকিয়া যায়। বর্ষাকালে উভয় তীর প্লাবিত হওয়াতে মাঠ ঘাট সমস্ত ডুবিয়া যায়, তাহাতে ভূমি উর্ব্বরা হয়। নদী গুলি যতই ব-দ্বীপের নিম্ন দিকে গিয়াছে, ততই মন্দগতি হইয়াছে। সমুদ্রের নিকটবর্ত্তী হইয়া বাদা বা জঙ্গলময় প্রদেশ দিয়া শত সহস্র খাল ও নালা হইয়া

নদী দুটী সমুদ্রে গিয়া পতিত হইয়াছে। এই জন্য লোকে বলে, গঙ্গা শতমুখী হইয়া সমুদ্রে পড়িয়াছে।

বাঙ্গালা ধান্যপ্রধান দেশ, কিন্তু তিল, সর্ষপ, পাট, নীল, ইক্ষু, এবং তামাকুও অনেক জন্মে। নদীতে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য; নিবাসিরাও নিতান্ত মৎস্যাশী।

বাঙ্গালি জাতি।—বিখ্যাত সিবিলিয়ান বিভার্লি সাহেব বলেন;—

"প্রকৃত বঙ্গদেশবাসিরা শারীরিক ভাবে ভারতবর্ষের আর কোন জাতির অনুরূপ নহে। দেশের জল-বায়ু বা প্রাকৃতিক অবস্থা, অথবা আদিম নিবাসীর রক্ত বহুল পরিমাণে থাকা হেতু বাঙ্গালিদের জাতীয় বিশেষতা এরূপ হইয়াছে; নদী নালা ও খাল বিলে পরিপূর্ণ দেশে বাস, ও সিদ্ধ চাউলের ভাত উদরস্থ করাতে উভচর বাঙ্গালি দেখিতে দুর্ব্বল, কিন্তু সে যে প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে পারে, হিন্দুস্থানী লোকে তাহা সহ্য করিতে গেলে মরিয়া যায়। ক্ষীপ্রকারিতায় বাঙ্গালি কিছু নয়; ভীরু ও দীর্ঘসূত্রী, কিন্তু তাহার বুদ্ধি তীক্ষ্ণ, সুতরাং সে বিলক্ষণ চতুর। কিন্তু এ দিকে শ্রমশীল, ও শ্রমসাধ্য কার্য্যও ভাল বাসে; এই জন্য দেশের সর্ব্বত্র সরকারি কার্য্যে বাঙ্গালি দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রধান কতকগুলি দেওয়ানী কার্য্যে বাঙ্গালি উন্নীত হইয়াছে। প্রকৃত বঙ্গদেশ ব্যতীত, পূর্ণিয়া, সাঁওতাল পরগণা, মানভূম, গোয়াল পাড়া ইত্যাদি সীমানাস্থ জিলায়ও বাঙ্গালি বাস করে।"

ভাষা।—বাঙ্গালা ভাষা উত্তরাঞ্চলীয় ভাষা পরিবারভুক্ত। বর্ণমালা নাগরি বর্ণমালার অনুরূপ, কিন্তু গোলাকার, সহজে লিখিতে পারা যায়।

বাঙ্গালা ও উড়িয়া ভাষাতে যত বিশুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের ব্যক-

হার হয়, উত্তরাঞ্চলীয় ভাষা পরিবারস্থ আর কোন ভাষায় তেমন দেখা যায় না। বিম্ সাহেব আধুনিক আর্য্যভাষার ব্যাকরণে আক্ষেপ করিয় বলিয়াছেন যে, পুস্তকের ভাষায় বাংলা শব্দের স্থলে সংস্কৃত আকারের শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে; সুতরাং অনেক সময়ে উত্তম বাংলা শব্দের পরিবর্ত্তে কদর্য্য সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার হইয়া থাকে। আবার অপ্রচলিত বৈয়াকরণিক নিয়মও পুনরায় প্রচলিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এই কারণে অনেক বাংলা পুস্তক সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না।

বিগত কএক বৎসরের মধ্যে ভালর পক্ষে কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই। সংবাদপত্রে সচরাচর যে দৈনিক ঘটনা ঘটে, তাহাই লিখিত হয়, সুতরাং পুস্তকের সাধু ভাষা খাটে না; কিন্তু তাহাতে করিয়া অন্যান্য প্রকার সাহিত্যের ভাষা সরল হইতেছে। বিস্তর নাটক লিখিত হইতেছে, তাহাতে যে যে শ্রেণীর লোক, তাহার মুখে তদুপযুক্ত কথা দেওয়া হইতেছে।

বাঙ্গালি মুসলমানেরা আপনাদের ভাষায় অনেক আরবি ও পারসি কথা মিশায়। তাহাদের ভাষায় যে সকল পুস্তক প্রকাশ হয়, তাহাকে মুসলমানী বাঙ্গালা বহি বলে।

পল্লীগ্রাম।—পল্লীগ্রামের লোকেরা প্রায়ই কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। বঙ্গদেশে কএকটী বড় ২ নগর আছে।

পল্লীগ্রাম বাসিদিগের ঘরের দেওয়াল প্রায়ই মাটীর; পূর্ব্ব-বাংলায় কিন্তু দরমা, পাটী বা ইকড়ের বেড়া। চালের কাঠাম বাঁশের, তাহার উপরে খড়ের ছাউনি; অনেকে তাল পাতা দিয়াও ছায়। ছবিতে কলিকাতার দক্ষিণাঞ্চলের বাঙ্গালি ঘরের নমুনা দেওয়া গেল। মাটী দিয়া ভিটা বাঁধিয়া তাহার উপরে ঘর বাঁধিতে হয়, নহিলে বর্ষাকালে উঠানে ও ঘরে জল উঠে। দিল্লী

অঞ্চলে ঘরের দেওয়াল মাটীর, সমতল ছাদও মাটীর ; বৃষ্টিপাত বড় কম, তাই গলিয়া যায় না। আর সে মাটীও বড় শক্ত। সে প্রকার ঘর বঙ্গদেশে চলে না। অনেক গ্রামে এত বড় বড় গাছ যে, ঘরবাড়ী দেখা যায় না।

বাঙ্গালির ঘর।

ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশে যেমন, বঙ্গদেশের পল্লীগ্রামস্থ লোকের গৃহেও তৈজষ পত্র বড় কম। বঙ্গদেশে উদখলের প্রচলন নাই, তাহার পরিবর্ত্তে ঢেকি যন্ত্র আছে। বর্ষাকালে যে যে অংশে ঘাট মাঠ জলে ডুবিয়া যায়, সেই সেই অংশে প্রায় প্রতি গৃহে শালতি বা নৌকা থাকে। কলিকাতা অঞ্চলে শালতির প্রচলন অধিক, পূর্ব্ব বাঙ্গালায় ছোট বড় নৌকার যথেষ্ট ব্যবহার।

ঢেঁকিযন্ত্র।

নিম্নে সুন্দর বনে ব্যবহৃত শালতির ছবি দেওয়া গেল। তাল গাছ দিয়া এক প্রকার ডোঙ্গা তৈয়ার করিয়া লোকে নৌকার ন্যায় ব্যবহার করে। সে গুলি কাঁধে করিয়া লইয়া যাওয়া যায়।

বঙ্গদেশে নগর বড় কম, গ্রামই বেশি ; এই জন্য পল্লীগ্রামে হাট নহিলে চলে না। যেখানে যে প্রকার সুবিধা, সেখানে হয় শালতি, না হয় নৌকা, বা মাথায় করিয়া লোকে ধান, চাউল ইত্যাদি বিক্রয়ার্থ হাটে বাজারে লইয়া যায়।

হাট।
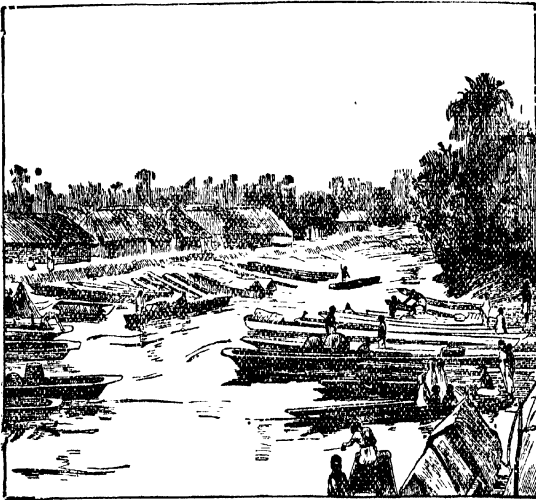
খাল ও নালার ত অবধিই নাই, এই জন্য তাহার উপরে লোক চলাচলের জন্য সাঁকো থাকে। সাঁকো প্রায় বাঁশের ; আবশ্যক হইলে সরাইয়া রাখা যাইতে পারে। লোকে খালি পায়ে অনায়াসে এক খানি বাঁশের উপর দিয়া খাল পার হইয়া যায়।

বঙ্গদেশে গবর্ণমেণ্টের সহিত জমিদারদিগের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। গবর্ণমেণ্ট খাজানা বৃদ্ধি করিতে পারেন না, কিন্তু জমিদারেরা পারেন;—বড় সহজে পারেন না। তথাপি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হেতু জমিদারদিগেরই লাভ, গবর্ণমেণ্ট বা প্রজার লাভ নাই।

অনেক জমিদার নগদ টাকার লোভে জমিদারী পত্তনি দিয়াছেন, পত্তনিদার আবার অপরকে মৌরস্ দিয়াছেন। এই প্রকারে ভূমির স্বত্ব নানা ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে প্রজার কষ্ট। আবার অনেক জমিদারির অনেক শরিক হওয়াতে প্রজাদিগকে নানা জমিদারকে খাজানা দিতে হয়।
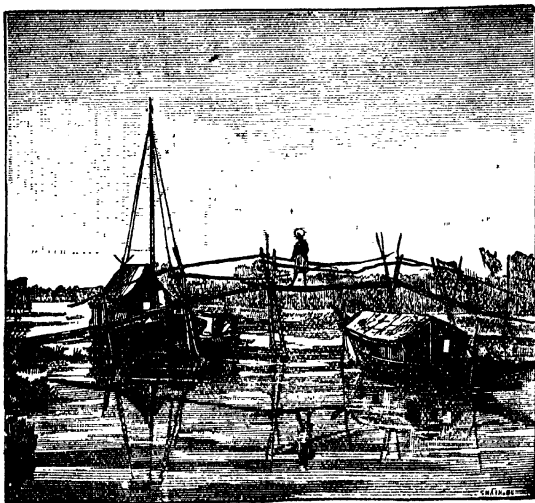
বাঁশের সাঁকো।

নগরের লোক।—কলিকাতা শহরে অনেক বাঙ্গালির বাস। প্রতিদিন সকাল বেলা ও বৈকাল বেলা কলিকাতার রাস্তায় নানা রকমের পোষাক পরা নানা রকমের বাঙ্গালি, খালি মাথায়, কেহ বগি হাঁকিয়া, কেহ বা ট্রামগাড়িতে, কেহ বা ভাড়াটে ও নিজের গাড়িতে আপিসে, দোকানে, বা অন্যবিধ কর্ম্মস্থানে গমনাগমন করেন। ইহাঁদের কেহ হৌসের মুচ্ছুদ্দি, কেহ বা দালাল, কেহ বা নিজে সওদাগরি করেন, কেহ বা উকিল, কেহ বা মুহুরি। অনেকে উত্তম নকল নবিস, আবার অনেকে ইংরাজিতে চিটি পত্র লিখিতেও বিলক্ষণ পটু। এই রূপে অনেক পরিবারের প্রতিপালন হইতেছে। কলিকাতায় অনেক বিচক্ষণ আইনজ্ঞ বাঙ্গালি আছেন, তাঁহাদের কেহ কেহ হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন।

আজি কালি অনেক বাঙ্গালি দোকানদারী করিয়া খায়। বড় বড় শহরে বাঙ্গালি ধনিরা বড় বড় কারবার করেন।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতীয় লোকের ন্যায় বাঙ্গালিদিগেরও দোষ গুণ উভয়ই আছে। অনেক বাঙ্গালি লেখক আপনাদের জাতীয় দোষ স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। এক জন বলিয়াছেন ;—

"বাঙ্গালির চরিত্র এক্ষণে উন্নতির পথে চলিতেছে, বাঙ্গালি-জিহ্বার বাচালতা শেষে কার্য্যতৎপরতায় পরিণত হইতে পারে ; কিন্তু বড় বড় কথা কহা বাঙ্গালির স্বভাবসিদ্ধ। আমাদের এক জন কবি জাতীয় চরিত্র বর্ণন উপলক্ষ্যে বলিয়াছেন যে, কথায় পর্ব্বত, কিন্তু কার্য্যে সর্ষপ প্রমাণ। বলা বাহুল্য যে, এই কয়টী কথায় সংক্ষেপে বাঙ্গালি-চরিত্রের প্রধান দোষগুণ ব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস এই, সুশিক্ষার গুণে, সংস্কৃত সামাজিক নিয়মের দ্বারা, এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মপ্রভাবে বাঙ্গালির জাতীয় চরিত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইবে ; কিন্তু যত দিন তাহা না হইতেছে, তত দিন বাঙ্গালির প্রধান দোষ—কথা, কথা, কেবল কথা।"

কলিকাতার বাঙ্গালি নাট্যশালায় বেশ্যারা অভিনয় করে। তাই এই প্রকার নাট্যশালার দ্বারা বাঙ্গালি যুবকের যত অনিষ্ট হইয়াছে, আর কিছুতে তত হয় নাই। নাট্যশালায় নর্ত্তকীর হাব ভাব দেখিয়া, অনেকে গোপনে তাহার গৃহে পদধূলি দিতে ইচ্ছুক হয়েন,—দিয়াও থাকেন। এই লজ্জাকর প্রথা যাহাতে রহিত হয়, তজ্জন্য বিশেষ উদ্যোগ ও চেষ্টার বড়ই প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের আর কোন কোন অঞ্চলের ন্যায় বঙ্গদেশে রাজনীতি বিষয়ে লোকের অতিরিক্ত উদ্যোগ দেখিতে পাই। "ইণ্ডিয়ান মিরার" পত্রে লিখিত হইয়াছে ;—

"আমরা আজি কালি দিবারাত্র রাজনীতি বিষয়েই কথা কহি ; যদিও আমরা নিজেরাই রাজনীতি বিষয়ে সদা ব্যস্ত, তথাপি স্বীকার করি যে, এই রাজনীতিই আমাদের সমাজের যত অনিষ্টের মূল। কারণ যাহা আমাদের বর্ত্তমান উন্নতি ও ভাবি মঙ্গলের মূল, তদ্বিষয় অবহেলা করিয়া কেবল রাজনীতি লইয়াই ব্যস্ত থাকি।"*

ইহার অনিষ্টকর ফল যুবকদিগের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। মান্দ্রাজের "হিন্দু" নামক সংবাদপত্রে লিখিত হইয়াছে ;—

"বিদ্যালয়ের বালকেরা যে রাজনীতির আলোচনা করিয়া আপনাদিগের অনিষ্ট করিতেছে, তাহা নিবারণের জন্য কলিকাতার কোন সহযোগী পরামর্শ দেন।......সহযোগী বিশেষ করিয়া বলেন যে, এ উপায় অবলম্বন না করিলে, এই মিথ্যা বাচালতার নিবারণ জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হইবে, নহিলে বৎসর কতকের মধ্যে শিক্ষিত বাঙ্গালি সমাজে উক্ত প্রকার লোকেরই প্রাদুর্ভাব হইবে।" †

বাঙ্গালিদিগের অনেক অবস্থান্তর হইয়াছে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারাই সামাজিক ও অন্যান্য সংস্কার বিষয়ে নেতা ছিলেন। মিথ্যা দেশহিতৈষিতার প্রাদুর্ভাব হওয়াতে অনেকের পরিবর্ত্তন

* অক্টোবর ৩, ১৮৮৬। † ৩১শে অক্টোবর ১৮৮৫।

দেখিতেছি। তাঁহাদের মতে যাহা কিছু ভারতবর্ষীয়, ভারতবর্ষীয় বলিয়া তাহাই উৎকৃষ্ট। তেমনি যাহা কিছু বিদেশীয়, বিদেশীয় বলিয়া তাহাই নিন্দনীয়। বুদ্ধিমান বাঙ্গালিরা ইহার ফল দেখিতে পাই-তেছেন। এক জন বাঙ্গালি কোন সভায় বক্তৃতাকালে যথার্থই বলিয়াছেন যে, "জাতীয়তার অনুরোধে যুক্তিযুক্ততা পায়ে ঠেলিলে চলিবে না। মূল কথা এই, কোন দেশীয় রীতি প্রকৃত পক্ষে ভাল কি মন্দ, তাহারই বিচার করিতে হইবে।"

সম্প্রতি "বাঙ্গালি" নামক সংবাদপত্র এই রূপে সাবধান হইতে পরামর্শ দিয়াছেন ;—

"বঙ্গদেশে সমাজসংস্কার বিষয়টী আমাদের মতে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় বিষয়। বাঙ্গালি বাবু যখন গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে কোন বিষয়ে চীৎকার করেন, তখন যেন কেহ না বলেন যে, ইহারা কেবল গলাবাজি করিতে জানে ; সামাজিক সংস্কার-নিবন্ধন যে সকল ক্ষতি হইবে, তাহা সহ্য করিতে তিনি কাতর। লোক দেখান যুক্তিযুক্ত এই প্রকার কথা বলিতে দিলে, রাজ-নীতিক ও সামাজিক, উভয় প্রকার উন্নতির পথে কাঁটা পড়িবে।"

"ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" নামক পত্র এই প্রকার পরিবর্ত্তনে ভয় করেন না। তাঁহার মতে ইহাতে সংস্কার কার্য্যের কোন প্রকার বাধা হইবে না ; কিন্তু দুঃখ করিয়া বলেন যে, ইহাতে করিয়া ভাবি বংশের বুদ্ধিগত সাধুতার হানি হইবে, এবং কপটতা ও আত্মসন্তোষের বৃদ্ধি হইবে।"

আবার এ দিকে যে সকল ভারতবর্ষীয় লোক বিশেষ বিখ্যাত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কয়েক জন বাঙ্গালী দেখিতে পাই। ডাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এবং কয়েক জন হিন্দু ব্যবস্থাশাস্ত্রের টীকাকার অতি বিখ্যাত পণ্ডিত বলিয়া গণ্য। সংবাদপত্র সম্পাদকের মধ্যে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধায় ও কৃষ্ণদাস পাল ; সমাজসংস্কারকদিগের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র

বিদ্যাসাগরের নাম অগ্রে করা উচিত। রামমোহন রায়, ও কেশবচন্দ্র সেনের মতন ধর্ম্মসংস্কারক বর্ত্তমান শতাব্দীতে এদেশে আর জন্মে নাই।

ধর্ম্ম।—গণনা দ্বারা স্থির হইয়াছে, বঙ্গদেশে যত হিন্দু আছে, তাহার বারো আনা লোক **শক্তির** উপাসক। ইঁহারা শিবের ভার্য্যাকে কালী বা দুর্গা নামে উপাসনা করিয়া থাকেন। কালীর মূর্ত্তি অতি বিভৎস; কালী উলঙ্গা, চতুর্ভুজা, মুণ্ডমালিনা, মহাদেবের বক্ষের উপরে দণ্ডায়মানা। অসুর বিনাশ করতঃ তিনি আনন্দভরে এরূপ নৃত্য করেন যে, তাঁহার পদভরে ধরণী কম্পিতা হয়েন। যখন কোন মতেই শিবের কথায় থামেন না, তখন মহাদেব যুদ্ধে হত লোকদিগের সঙ্গে গিয়া শুইয়া পড়েন। নাচিতে নাচিতে যেই স্বামির বুকের উপরে গিয়া পড়িয়াছেন, অমনি তাঁহাকে দেখিয়া চেতনা হয়। চেতনা হওয়া মাত্র লজ্জায় জিহ্বা কাটিয়া ফেলেন।

কালী।

নিম্নে যে কালীর ছবি দেওয়া গেল, এই রূপ মূর্ত্তির পূজা বঙ্গদেশে হয় না, মান্দ্রাজে হয়। এখানকার কালী মূর্ত্তি সুন্দর।

কালিকা পুরাণে লিখিত আছে, "যথারীতি নরশোণিত দান করিলে, দেবী সহস্র বৎসর কাল সন্তুষ্ট থাকেন।" ডাঃ রাজেন্দ্র-লাল মিত্র বলিয়াছেন, বঙ্গদেশে এমন ভদ্র পরিবার প্রায় নাই, যে পরিবারের গৃহিণী কোন না কোন সময়ে মহামায়াকে তৃপ্ত করিবার জন্য আপনার দেহের রক্তপাত করেন নাই।

কালীঘাটে এখনও কত স্ত্রীলোক গিয়া, আপনাদের বুক চিরিয়া কালীকে রক্ত দান করিয়া থাকে।

বঙ্গদেশের প্রধান পর্ব্ব দুর্গোৎসব। দেবতাদের ভয়ে অসুর-রাজ শুম্ভ মহিষের উদরে আশ্রয় লইয়াছিল, দুর্গা তাহাকে বধ করেন। এই ঘটনার স্মরণার্থ দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। এই কারণে দুর্গার এক নাম মহিষমর্দ্দিনী। এই গল্প হিন্দু ভিন্ন আর কেহ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না; বিশ্বাস করা দূরে থাকুক, শুনিলে হাসিয়া অস্থির হইবে।

প্রথমে বোধন করিয়া নিদ্রিত দেবগণকে জাগাইতে হয়, কারণ তাঁহারা শরৎকালে নিদ্রা যান। পরে প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়। এই ক্রিয়ার গুণে দুর্গা আসিয়া মৃণ্ময়ী প্রতিমাতে বাস

করেন। ক্রমাগত তিন দিবস পূজা হয়। নানা প্রকারের নৈবেদ্য উৎসর্গ এবং ছাগ ও মহিষ বলি দেওয়া হয়। লোকে দেবতার নিকট দীর্ঘজীবন, সুনাম, সৌভাগ্য, পুত্র, ধন ইত্যাদি কামনা করে।

তৃতীয় দিবস দর্পণে প্রতিমার বিসর্জ্জন হয়। অবশেষে লোকে প্রতিমা লইয়া গিয়া জলে বিসর্জ্জন দেয়।

"ছুটি প্রাপ্ত বালকদিগের আমোদে, পরিশ্রমক্লান্ত লোকদিগের বিশ্রামে, ভ্রাতৃভাবসুলভ আতিথেয়তায়, সজনগণের পরস্পর অভ্যর্থনায়, পারিবারিক সম্মিলনজনিত আনন্দে, এবং দীর্ঘ বিচ্ছেদের পরে প্রেম সম্মিলনে, আমরা সকলেই যোগ দিয়া উল্লাস করিতে পারি। তথাপি, দুঃখের বিষয় এই যে, সৃষ্টিকর্ত্তা ও সকল মঙ্গলদাতা ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে হস্তকৃত দেবতার আরাধনা রূপ গর্হিত কার্য্যের সহিত এই নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদের সংস্রব রহিয়াছে।" "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" নামক সংবাদপত্রে এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

"প্রায় সমস্ত দেশের লোক, সত্য ঈশ্বরের আধ্যাত্মিক উপাসনা না জানিয়া, প্রতিমার রক্তাক্ত উপাসনায় ব্যস্ত। ইহা দেখিতে অতি শোচনীয় ; কিন্তু শিক্ষিত লোকেরা যে প্রতিমা-পূজার দূষণীয়তা জানিয়াও ঈশ্বরের আত্মিক উপাসনা-অজ্ঞাত জনসাধারণের সহিত প্রতিমা-পূজায় যোগ দেন, ইহা আরও শোচনীয়।

"যাঁহারা সরল মনে সত্য ভাল বাসেন, তাঁহারা শিক্ষিত লোকদের ব্যবহার দৃষ্টে দুঃখিত না হইয়া থাকিতে পারেন না। ইংরাজি শিক্ষা মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিকে স্বাধীনা করিয়া তুলে বটে, কিন্তু মানুষের সংবেদকে স্বাধীনা করিয়া তুলিতে পারে নাই ; এবং মানুষকে সত্যপ্রিয় ও সাধু করিয়া তুলে নাই ; বরং ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে লোকে এমন কৌশল শিখিয়াছেন যে, যেমন নৈতিক কাপুরুষত্ব হউক না কেন, তাহার পক্ষসমর্থনার্থ

নানা তর্কজাল বিস্তার করিতে পারেন। শিক্ষিত সমাজেও এমন লোক আছেন, যাঁহারা প্রতিমা-পূজা এবং কুসংস্কারসুলভ কার্য্যে যোগ দিতে লজ্জিত হন না,—নিদান পক্ষে বলিয়া থাকেন, যোগ দিতে লজ্জিত হই না।”

১৪৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-কুলে, নবদ্বীপ নগরে চৈতন্য জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নিজে পৌত্তলিক ছিলেন, এবং পুরুষোত্তমে গিয়া দারুময় জগন্নাথের আরাধনা করেন, তথাপি বঙ্গদেশের অনেক লোকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়া থাকে। নবদ্বীপে তাঁহার ও তদীয় গর্ভ-ধারিণী সচি দেবীর মূর্ত্তি আছে। যত রাজ্যের নবশাখ, ও বর্ণ-সঙ্কর চৈতন্যের উপাসক। চৈতন্যের ভেকধারী উপাসকদিগকে বৈষ্ণব বলা যায়, অধিকাংশ নীচ জাতীয়, বা জাতিভ্রষ্ট লোক ভেক ধারণ করতঃ এই দলে প্রবেশ করে। এই জন্য প্রবাদ রটিয়াছে যে, লোকে “জাতি হারাইলেই বৈষ্ণব” হয়। হিন্দুরা যে কিরূপে উপাস্য দেবতার আবিষ্কার করেন, চৈতন্যই তাহার দৃষ্টান্ত। শ্রীহট্ট জিলার অন্তর্গত ঢাকা-দক্ষিণ গ্রাম চৈতন্যের পৈতৃক বাসস্থান, সেখানেও মন্দির ও চৈতন্যের মূর্ত্তি আছে, লোকে এই মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে।

অর্দ্ধেক বাঙ্গালি মুসলমান। আবার বাঙ্গালার কোন কোন জিলার বারো আনা লোক মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী। ইহাদের অধিকাংশই নীচ জাতীয় হিন্দু ছিল; আপনাদের সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন জন্য মুসলমান রাজাদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ইহাদিগের অধিকাংশ কেবল নামে মুসলমান ছিল; ফলে ইহারা ত্বকছেদী নীচ জাতীয় হিন্দু মাত্র ছিল; ফরাজি মতের প্রাদুর্ভাব হইয়া অবধি মুসলমান ধর্ম্ম কিয়ৎ পরিমাণে শিখিয়াছে, তথাপি এখনও অনেক মুসলমানের নাম গোপাল, কৈলাস, রাখাল ইত্যাদি।

১৭৫৮ শালে কিয়ারেন্দর নামক প্রথম মিশনরি মান্দ্রাজ হইতে বঙ্গদেশে আইসেন। তিনি কলিকাতাস্থ মিশন-রো নামক রাস্তায় মিশন চর্চ্চ নামক গির্জা নির্ম্মাণ করেন। ১৭৯৩ শালে কেরি কলিকাতায় পঁহুছেন। ১৭৯৯ শালে আরো চারি জন মিশনরি আইসেন। তখন বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট (ভারতবর্ষে) মিশনরিদিগের প্রতিকূল থাকায় কেরি ও তাঁহার সঙ্গিরা শ্রীরামপুরে দিনামারদিগের এলাকায় গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। ১৮১৩ শালে গবর্ণমেণ্ট মিশনরিদিগকে অবাধে ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে অনুমতি দেন। ১৮৩০ শালে পাদ্রি আলেকজান্দর ডফ্‌ কলিকাতায় আসিয়া ইংরেজি বিদ্যা শিক্ষার যার পর নাই উন্নতি সাধন করেন। ১৮৮১ শালে প্রটেষ্টাণ্ট বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা বঙ্গদেশে ২১,০০০ ছিল।

মিশনরিদিগের সংসর্গে উত্তেজিত হইয়া রামমোহন রায় স্বদেশের ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হয়েন। কেশব চন্দ্র সেনও কিছু কাল ধর্ম্মসংস্কার কার্য্যে বিলক্ষণ শ্রম করেন, কিন্তু শেষ কালে হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বড় টান হয়। তাঁহার মৃত্যুর পরে তদীয় শিষ্যদলে অনেক দলভেদ জন্মিয়াছে।

সাধারণ ব্রাহ্মেরা কেবল একেশ্বরবাদী।

সাহিত্য ও মুদ্রাযন্ত্র। বাঙ্গালা সাহিত্য, বলিতে গেলে, আধুনিক। ব্রাহ্মণেরা সকলই সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন। প্রচলিত ভাষা "অসুর ও স্ত্রীলোকের" ভাষা বলিয়া ব্রাহ্মণেরা বড় ঘৃণা করিতেন। মুসলমানেরা ভারতবর্ষ অধিকার করতঃ কেবল পারস্য ভাষার আলোচনায় উৎসাহ দিতেন। রামকমল সেন নিজ সঙ্কলিত ইংরাজি-বাঙ্গালা অভিধানের ভূমিকায় বলিয়াছেন, "৩০৭ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপ নগরে চৈতন্যের আবির্ভাব হইবার পর বাঙ্গালা ভাষায় জীবনচরিত এবং ইতিহাস লেখা আরব্ধ হয়;

তাঁহার শিষ্যেরা বৈষ্ণব ধর্ম্মসংক্রান্ত মূলশিক্ষা বিষয়ে নানা গ্রন্থ রচনা করেন।”

১৭৭৮ শালে হুগলি নগরে হলহেড সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, ইহাই বাঙ্গালা মুদ্রিত পুস্তকের অতি প্রাচীন নমুনা। স্যার সি, উলকিনস্ সাহেব এই ব্যাকরণ ছাপিবার জন্য স্বহস্তে অক্ষর প্রস্তুত করেন। পঞ্চানন নামে এক জন কর্ম্মকারকে তিনি অক্ষর কাটা শিক্ষা দেন। পরে অনেকে পঞ্চাননের নিকট বাঙ্গালা অক্ষর কাটিতে শিখে।

১৮০১ শালে শ্রীরামপুর নগরে রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনচরিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। পাদ্রি লং সাহেব বলিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষায় আর কোন গদ্য পুস্তক লিখিত হয় নাই। উক্ত পুস্তকের ভাষা কতক পারস্য ও কতক বাঙ্গালা। ১৮২০ শালে, শ্রীরামপুরের ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া সম্পাদক অতি সন্তোষ সহকারে বাঙ্গালা যন্ত্রে মুদ্রিত ১০ বৎসরের ২৭ খানি বাঙ্গালা পুস্তকের এক তালিকা প্রকাশ করেন। “বিগত ১০ বৎসরে ১৫০০০ হাজার পুস্তক মুদ্রিত ও দেশীয় লোকদিগের নিকটে বিক্রীত হইয়াছে। বেদ সংগৃহীত হইবার পর অবধি এদেশে এরূপ ব্যাপার কখন ঘটে নাই।”

১৮৮৮ শালে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের পুস্তকালয়ে অনেক পুস্তক প্রেরিত হয়,—“বাঙ্গালা ১১৬৬, মুসলমানি বাংলা - ৫৪; বাংলা ও ইংরাজি ৮৯; বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ২০৩; বাঙ্গালা, ইংরাজী ও সংস্কৃত ২২। সাধারণ শিক্ষা বিভাগের কর্ত্তা টনি সাহেব উক্ত রিপোর্টের আলোচনা কালে বলেন;—

“এত শীঘ্র ২ এত ঐতিহাসিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে যে, চিন্তা করিলে আশ্চর্য্য বোধ হয়। বঙ্গদেশে এত ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে যে, পুস্তকালয়ের কর্ত্তা তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। জর্ম্মান সম্পাদকের দ্বারা সম্পাদিত

পুস্তকখানি ভিন্ন আর কোন খানিতেই সমালোচনার ভাব না দেখিয়া হয়ত তিনি অবাক হইয়া থাকিবেন।

"গল্প ও কবিতার বিশেষ ছড়া-ছড়ি। কিন্তু ইংরাজদিগের এদেশে আসিবার পূর্ব্বেও গল্প ও কবিতার এই রূপ প্রাদুর্ভাব ছিল। ইংরাজদিগের দ্বারা এই দেশ অধিকৃত হইবার পর বাঙ্গালা আখ্যায়িকার আকার ও ভাবগত উন্নতি হইয়াছে কি না, সন্দেহ। ইংরাজি শিক্ষা দ্বারা বাঙ্গালী অন্তঃকরণের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কি না, তাহা বুঝিয়া উঠা দুষ্কর। নানা প্রকারের পরীক্ষা ও সেই পরীক্ষায় বহুসংখ্যক যুবক উপস্থিত হওয়াতে টীকা টীপ্পনী ও আদর্শ প্রশ্নের ত অভাবই নাই। পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষ ইহা অতি অনিষ্টের কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আমারও মত তাই। তাঁহার রিপোর্টে বিলাতী বিজ্ঞান চর্চ্চাজনিত কোন সুফল অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না; দর্শন শাস্ত্রের ভাব পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে, চিকিৎসা বিদ্যারও গতি সেই রূপ দেখি। বাঙ্গালী নিউটন ও বাঙ্গালী ফারাদে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।" ৩৬ পৃষ্ঠা।

সংবাদ পত্র।—ভারতবর্ষে যে সকল উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট সংবাদ পত্র আছে, তাহার কতকগুলি কলিকাতায় দেখিতে পাওয়া যায়। কৃষ্ণদাস পালের হাতে "হিন্দু পেট্রিয়ট" বিলক্ষণ ভদ্রভাবে চলিত। নিরপেক্ষতা, সুনীতি এবং সম্মার্জ্জিত রুচি প্রযুক্ত আজ কাল "ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জারের" বড় আদর। কিন্তু বিপরীত ভাবের অনেকগুলি সংবাদ পত্র আছে। ১৮৭৪ শালে "ইণ্ডিয়ান মিরার" যাহা লিখেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করা গেল, কিন্তু তদবধি এবিষয়ে কোন উন্নতি হয় নাই;—

"দেশী সংবাদ পত্রের বিষয়ে প্রতি সপ্তাহে যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, আমাদের সহযোগীগণের ভাষায় সুশিক্ষা অর্থে গবর্ণমেণ্টের প্রতি অসম্মান; দেশহিতৈষিতা

অর্থে বাক্যাড়ম্বর; স্বজাতিহিতৈষিতা অর্থে ইংরাজবিদ্বেষ এবং ন্যায়পরতা অর্থে গালা-গালি বুঝায়।"

"ইণ্ডিয়ান মেসেঞ্জার" বলেন;—"আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, এত গৌরবের সভ্যতা নীচ ভাবের পরদোষচর্চ্চায় যত প্রকাশ পাইতেছে, সাধারণের উপকারজনক কার্য্যে তত নহে।"

যে ব্যক্তি ভারতের পূর্ব্ব গৌরব উল্লেখ করতঃ দর্প এবং বর্ত্তমান উন্নতির নিতান্ত নিন্দাবাদ করে; যে ব্যক্তি দেশীয় বিশ্বাস এবং আচার ব্যবহারের পক্ষসমর্থন এবং যাহা কিছু বিদেশী, তাহারই নিন্দাবাদ করে; এবং যে ব্যক্তি ইংরাজ-শাসনের দোষ চর্চ্চা করে, অনেকের মতে সেই ব্যক্তি দেশ-হিতৈষী।

যাঁহারা বিলাত হইতে দেশে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করতঃ সমাজে উঠেন, তাঁহাদিগের বিষয়ে কৃষ্ণদাস পাল লিখিয়াছিলেন যে, "তাঁহারা প্রায়শ্চিত্তার্থক বটিকা-গলাধঃকরণকারী দুর্ব্বল প্রাণী।" এইরূপ বীরত্ব এবং সৎক্রিয়াসাহস প্রযুক্ত "অমৃতবাজার পত্রিকা" পঞ্চমুখে তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছেন। এই বিষয়ে কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, "এই প্রকার লোকের এই প্রকার লজ্জাকর কাজের গৌরব করিয়া অনেক ভদ্রলোক আপনাদিগকে এবং আপনার আত্মীয় বন্ধুগণকে সমস্ত জগতের সাক্ষাতে হাস্যাস্পদ করিয়া থাকেন।"

সর্ব্বসাধারণ লোকে পুরাতন বিষয় এত ভাল বাসে যে, কোন বিষয়ে পরিবর্ত্তন চাহে না। যে সকল সংবাদ পত্রে তাহাদের মতের পোষকতা হয়, সেই সকলেরই কাট্‌তি বেশী।

আসাম দেশ।

আসাম দেশ অপ্রশস্ত ও দীর্ঘাকার উপত্যকা বিশেষ, ব্রহ্মপুত্র এ দেশের প্রধান নদ। আসাম দেশী লোকেরা যদিও বহু-

কাল হইল, ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তথাপি আকারে ও ইতিহাসে হিন্দু জাতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আসাম, কামরূপ রাজ্যের এক অংশ; কামরূপের রাজধানী গৌহাটী নগর ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা এই রাজ্যটী নষ্ট করে। পরে কোচ নামক এক জাতীয় আদিম-নিবাসিরা এক রাজ্য স্থাপন করে, এ রাজ্যও এক সময়ে কামরূপ রাজ্যের ন্যায় বিলক্ষণ বিস্তৃত ছিল। কুচবিহারের মহারাজা এই বংশীয়। আহমেরা শান জাতীয় এবং শ্যাম বংশীয়। এই আহমেরা কোচদিগকে পরাজয় করে। আবার ব্রহ্ম দেশীয় লোকেরা আসামে আসিয়া আহমদিগকে নির্ব্বংশ করিবার উপক্রম করাতে তাহারা ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করে। অনন্তর ১৮২৪ শালে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের পর আসাম দেশ বৃটিশ ভারতের এলাকাভুক্ত হয়।

১৮৮১ শালের তালিকা দেখিলে জানা যায় যে, ১৪ লক্ষ লোকে আসামী ভাষা কহে। অনেকের মতে আসামী ভাষা বাঙ্গালার বিকৃতি বা শাখামাত্র। কিন্তু আসামিরা তাহা স্বীকার করে না, বরং আপনাদের ভাষার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছে। এ ভাষায় বিস্তর সংস্কৃতমূলক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। ফস্ত্ সাহেব বলেন, আসামী শব্দের উচ্চারণ অনেকটা হিন্দির ন্যায়। এ ভাষায়, দুই তিন শত বৎসর পূর্ব্বেকার লিখিত ঐতিহাসিক পুস্তক পাওয়া যায়।

বিখ্যাত সিবিলিয়ান বিভার্লি সাহেব আসামিদিগের এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন :—

"বাঙ্গালা দেশের অপর প্রান্তে আসামী নামে আর এক স্বতন্ত্র জাতীয় লোক বাস করে—ইহাদের ভাষার সহিত বাঙ্গালা ভাষার বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে; কিন্তু চীনেদের বা মগেদের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে ইহাদের আকৃতি ঠিক বাঙ্গালিদিগের ন্যায় নহে। আসাম দেশ ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকামাত্র; এ

দেশে বিস্তর বিপ্লব হইয়া গিয়াছে,—এক জাতিকে যুদ্ধে পরাজয় করতঃ অপর জাতি আধিপত্য লাভ করিয়াছে, এক্ষণকার নিবাসিদিগের আকৃতিতে এই সকলের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শিবসাগর জিলায় আহম নামে যে জাতি আছে, অনেকের মতে তাহারাই বিশুদ্ধ আসামী। কিন্তু তাহাদেরও অনেকের শরীরে অপর জাতীয় শোণিত আছে। কিন্তু আহম, চৈত্য, কোচ্, বদু, ও আর্য্য, এই কয় জাতির মিশ্রণে বর্ত্তমান জাতি হইয়াছে। আসামীরা অহঙ্কারী, উগ্রস্বভাব, ও নিশ্চেষ্ট; অহিফেণ সেবনে ইহাদের এই রূপ শোচনীয় অবস্থা দাঁড়াইয়াছে।"*

অহিফেণ সেবন যাহাতে কমিয়া যায়, কএক বৎসর হইতে অনেক হিতৈষী লোকে তাহার চেষ্টা করিতেছেন।

এক্ষণে এ দেশে কলের জাহাজ যাওয়া আসা করে, আবার রেল পথও হইতেছে।

আসামের পর্ব্বতে অনেক জাতীয় পাহাড়ী লোকের বাস, কএকটী জাতির বিষয় বর্ণিত হইবে।

নাগা।

কাছাড়ের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে যে পর্ব্বত আছে, তাহাকে নাগা পাহাড় বলে। এই সকল পাহাড়ে নাগা নামে এক জাতীয় অসভ্য লোক বাস করে। তাহাদের সংখ্যা এক লক্ষ। তাহাদের আকৃতি মগেদের মতন; তাহাদের নাক খাঁদা, ও চোয়ালির হাড় উচ্চ। খেস নামে এক প্রকার মোটা কাপড় ইহারা কোমরে জড়ায়, তাহাতে কড়ি বসান। কিন্তু গলাবন্ধই বড় আদরের জিনিস; ছাগলের চামড়ায় লাল রং মাখাইয়া, যুদ্ধে হত শত্রুর মাথার খুলি গাঁথিয়া মুণ্ডমালার ন্যায় ইহারা পরে। হয় ত হিন

(* Bengal Census of 1872, p. 145.)

নাগা।

দেবতা কালীর মুণ্ডমালা দেখিয়া নাগারা তাহার এই রূপে অনুকরণ করিয়া থাকে।

বল্লম, ঢাল, ও দা ইহাদের জাতীয় অস্ত্র। এক্ষণে অনেকে

বন্দুকের ব্যবহার করিয়া থাকে। ইহারা যখন শিকার করিতে বাহির হয়, তখন বাঁশের ছোট ছোট গোঁজ রাস্তায় পুতিতে পুতিতে যায়; শত্রু তাহাদের অনুসরণে বাহির হইলে, গতির ব্যাঘাত হয়। যুদ্ধ কার্য্যে ইহাদের বিলক্ষণ সাহস আছে, কিন্তু বড় বিশ্বাসঘাতক এবং প্রতিহিংসেচ্ছু; দলস্থ কোন ব্যক্তি শত্রু-হস্তে হত হইলে, প্রতিশোধ না লইলে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না।

নাগারা বড় কুসংস্কারাপন্ন; প্রতি গ্রামে গণক আছে, লক্ষণা-লক্ষণ ইহারা বড় মানে। ইহারা যত পূজানুষ্ঠান বা বলিদান করে, সে সকলই কেবল ভূতের সন্তোষের জন্য। ইহারা ভূত প্রেত বড়ই মানে।

ইহাদের অন্ত্যেষ্ঠি ক্রিয়া বড় চমৎকার। দীর্ঘকাল পীড়া ভোগের পর কাহারও মৃত্যু হইলে, বাড়ীতে এক উচ্চ মাচা বান্ধিয়া দেহটী তাহার উপর রাখিয়া দিবারাত্র চৌকি দেওয়া হয়। অল্পকাল পীড়া ভোগের পর মৃত্যু হইলে নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে মাচা বাঁধিয়া দেহটা কাপড়ে জড়াইয়া তাহাতে রাখিয়া আইসে, রৌদ্রে ও বৃষ্টিতে তাহা আপনি গলিয়া নষ্ট হইয়া যায়। ছয় মাস এই রূপে থাকিলে পর প্রকৃত আন্ত্যেষ্টিক অনুষ্ঠান হয়। আত্মীয় সজনেরা আসিয়া জমা হয়; আপনাদের প্রস্তুত সুরাপান ও তৎসঙ্গে সমস্ত দিন এবং রাত্রি বাদ্য ও নৃত্য হয়; গায়কেরা শোকসূচক গান গাহিতে থাকে। নৃত্য কালে হাতে বল্লম থাকে, তাহাও নানা কৌশলে ঘুরায়, ভূতের স্তব হয়, কারণ ইহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষ মরিলে ভূতে তাহাকে লইয়া যায়।

মিশ্মি।

আসামের পূর্ব্ব সীমানাস্থ পর্ব্বতে মিশ্মি নামে এক জাতীয় লোক বাস করে। চীন দেশের পশ্চিমে য়ুনান দেশে যে আদিম

জাতীয় লোক বাস করে, অনেকের মতে মিশ্মিরা তাহাদের বংশজাত। ইহারা খর্ব্বকায়, বলবান, ইহাদের বর্ণ পরিষ্কার, মুখাকৃতি মার্জ্জিত মঙ্গলীয়দিগের সদৃশ। ডোরাওয়ালা কাপড় দিয়া ইহারা পোষাক প্রস্তুত করে; ইহাদের জাতীয় অস্ত্র ঢাল,

বল্লম, ও তরোয়াল ; স্ত্রীলোকেরা পলাকাটির এবং রূপার গহনা পরিয়া থাকে। মিশ্মিদের আবার নানা শ্রেণী আছে; এক শ্রেণীর লোক মাথার চুল ছাঁটিয়া ফেলে, আবার কোন কোন শ্রেণীর লোক চুলগুলি উল্টাইয়া কৃষ্ণচূড়ার ন্যায় খোপা করিয়া বাঁধে। মিশ্মিরা বড় অপরিষ্কার, কখনও স্নান করে না।

মিশ্মিরা বাণিজ্য-ব্যবসায়ী। পুরুষমাত্রেই কোন না কোন প্রকার ক্রয় বিক্রয় করে। কামারের কাজ সকলেই জানে; আপনারাই আপনাদের বল্লমের ফলা তৈয়ার করে। সুবিধা পাইলে এ সকল ক্রয় করিয়াও থাকে। ইহারা অতি উৎকৃষ্ট ঝুলান পুল নির্ম্মাণ করিয়া থাকে।

মিশ্মি গ্রামে খান কতক মাত্র ঘর; অনেক স্থলে একখানি ঘরই একখানি গ্রাম বলিয়া বিদিত। কিন্তু ঘর গুলি এত বড় যে, একখানির মধ্যেই পরিবারস্থ সকলের, দাস দাসী ও চাকর বাকরের স্থান কুলায়। এক রাজার এক খানি মাত্র ঘর ছিল। বর্ম্মা ও নাগাদিগের ন্যায়, ইহাদের ঘরও মাচার উপরে স্থাপিত। এই ঘরে ১২টী কুঠরী, তাহাতে স্ত্রীলোক, পুরুষ ও বালক বালিকায় একশত লোক বাস করিত। আর একখানি ঘরে ২০টী কুঠরী ছিল। এই সকল ঘর বাঁশ, বেত, কাষ্ঠ ও খড়দ্বারা নির্ম্মিত।

ইহাদের সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। যাহার যত আয়, সে ততটা বিবাহ করে। স্ত্রী সম্পত্তিবিশেষ; অতটা গোরু ছাগল দিলে, একটী স্ত্রী পাওয়া যায়। বাঙ্গালি স্ত্রীদিগের ন্যায় মিশ্মি সুন্দরীরা ঘোমটা দিয়া ঘরে বসিয়া থাকে না, পুরুষদিগের নিকট অবাধে বাহির হয়, এবং সকল প্রকারে স্বামির সাহায্য করিয়া থাকে। কেবল পুরুষেরা শিকারে বাহির হইলে স্ত্রীলোকেরা সঙ্গে যায় না।

মিশ্মিদিগের গোমেষাদি বিস্তর। ইহাদের পাহাড়ে গোরুর পাল অতি চমৎকার। এ গুলিকে আমরা বন-গোরু বলিয়া থাকি। কৃষিকার্য্য বা দুধের জন্য ইহারা বন-গোরু পোষে না, উৎসবকালে বন-গোরু বধ করিয়া, মাংস আহার করে; আর বিবাহকালে পণস্বরূপ কন্যাকর্ত্তাকে বন-গোরু দিতে হয়। ইহাদের বন গোরু আল্‌গাই যেখানে ইচ্ছা, চরিয়া বেড়ায়, চারি দিকে জঙ্গল, স্থানের ত অভাব নাই; কিন্তু গৃহস্থ নিয়মিত সময়ে ডাকিয়া ইহাদিগকে লবণ খাওয়ায়, সুতরাং গৃহস্থকে ইহারা বিলক্ষণ চিনে।

স্ত্রীলোকের বড় আদর। যাহার অনেক গুলি মেয়ে, সে ত বড় মানুষ। ছেলে গুলি মেয়েদের অপেক্ষা খাটে বেশি, কন্যা-পণ সংগ্রহের জন্য তাহাদিগকে কঠিন পরিশ্রম করিতে হয়। পণের কতক অংশ দিলে বিবাহ হইতে পারে, এবং পুরুষ শ্বশুরালয়ে গিয়া স্ত্রীর সঙ্গে মধ্যে মধ্যে বাস করিতে পারে, কিন্তু বাকি পণ না দিলে স্ত্রী বা তাহার গর্ভজাত সন্তানদিগকে নিজ গৃহে লইয়া যাইবার জো নাই।

রাজার বাড়ী বড় চমৎকাররূপে সাজান। গৃহের বারাণ্ডায় বাঁশের আল্‌না টাঙ্গাইয়া, বাড়ীতে উৎসব উপলক্ষ্যে কত গোমহিষ বধ করা হইয়াছে, সেই সকলের মাথার খুলি ধূঁয়াতে শুকাইয়া তাহাতে ঝুলাইয়া রাখা হয়। এ সকলের দ্বারা আপনার দাতৃত্ব-শক্তির পরিচয় হয় বলিয়া, তিনি গৌরব করিয়া থাকেন। কোন রাজা মরিয়া গেলে তাঁহার দেহ দুই দিন পরে দাহ করিয়া, বাড়ীর নিকটে ঠাকুর ঘরের মতন একখানি ছোট ঘর বাঁধিয়া, তাহাতে চিতার ভস্মগুলি রাখিয়া দেওয়া হয়। বাড়ীতে যে সকল মাথার খুলি ছিল, রাজার নিজের কবর-স্থানে পুতিয়া রাখা হয়। রাজ-পুত্র রাজা হইয়া আবার পশুবধ করতঃ লোক জন খাওয়াইবেন, তিনিও যথাসাধ্য পশুকপাল সংগ্রহ করিবেন। পিতার আমলে

যে সকল বাঁশের আল্নায় পশুকপাল ছিল, তিনিও তাহাতেই সে সকল টাঙ্গাইয়া রাখিবেন।

কোন বিপদ ঘটিলে মিশ্মি কুক্কুট, শূকর বা অন্য কোন প্রাণী বধ করিয়া ভূতের পূজা দেয় এবং গৃহের দ্বারে ডাল পালা রাখিয়া দেয়, তাহাতে জানা যায় যে, এই গৃহে বিপদ ঘটিয়াছে, ইহাতে কাহারও প্রবেশ করা বিহিত নহে।

যদি কোন মিশ্মিকে বল যে, এক পবিত্র আত্মা আছেন, তিনি সমস্ত ভূত প্রেতকে জব্দ করেন। তাহা হইলে সে বলিবে, "এরূপ ক্ষমতাশালী আত্মা দেশে থাকাতেই তোমরা (ইংরাজেরা) এত সুখী, আমরা (মিশ্মিরা) বড় দুর্ভাগা, আমাদিগের চারি দিকে ভূত প্রেত। নদীতে, পাহাড়ে, বৃক্ষে, যেখানে যাই, সেই খানেই ভূতের ভয়; তাহারা অন্ধকারে বেড়াইয়া বেড়ায়, ও বাতাসেও বাস করে। ভূতের জ্বালায় আমরা অস্থির।"

গারো।

সুরমা ও ব্রহ্মপুত্রের তল-ভূমির মধ্যস্থলে যে পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহার পশ্চিম প্রান্তে গারো জাতীয় লোকেরা বাস করে। ইহাদের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ।

গারোরা বলবান এবং উদ্যোগী, নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব্ব, বর্ণ ঘন কটা। ইহাদের গাড়ির হাড় উচ্চ, নাক প্রশস্ত, ওষ্ঠ পুরু, কাণ বড় বড়, চক্ষু একটু কটাবর্ণ। পুরুষের দাড়ি গোঁপ নাই, উঠিতে আরম্ভ হইলেই সাবধানে তুলিয়া ফেলে। স্ত্রী পুরুষ কেহই মাথার চুল কাটে না, বিনুনি করিয়া বাঁধিয়া রাখে। পুরুষেরা তিন হাত লম্বা এক খণ্ড কাপড় কোমরে জড়াইয়া রাখে। স্ত্রীলোকেরা যে কাপড় পরে, তাহার বহর বেশি। এতদ্ব্যতীত সকলেই একখানি খেস গায়ে দেয়, কোন বৃক্ষের ছাল দিয়া এই খেস প্রস্তুত হয়। বৃক্ষের ছাল প্রথমে জলে

পচাইয়া পাটের মতন আঁশ বাহির করিয়া লয়। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গহনা বড় ভাল বাসে। পুরুষের কাণে তিন চারিটা মাকড়ি এবং গলায় কতকগুলি পুঁতির মালা থাকে। যাহারা মান্যবান লোকের সন্তান, তাহাদের হাতে পিতল বা লোহার বাজু এবং মাথায় পিতলের শিরস্ত্রাণ থাকে, যে ব্যক্তি যুদ্ধে শত্রু-নিপাত করিয়াছে, কেবল সেই ব্যক্তিই শিরস্ত্রাণ পরিতে পারে।

স্ত্রীলোকেরা গলায় হাঁসুলি পরে এবং কাণে ভারি২ মাকড়ি দেয়। মাকড়ির ভারে যে সুন্দরীর কাণের পাতা ছিঁড়িয়া যায়, সমাজে তাহার বড়ই মান। কাণের পাতা ছিঁড়িয়া গেলে মাকড়িগুলি চুলে বান্ধিয়া ঝুলাইয়া দেয়।

বড়শা, তরোয়াল ও ঢাল গারোর জাতীয় অস্ত্র। ইহাদের তরোয়াল দ্বিধার। ইহার দ্বারা যুদ্ধ ও কৃষিকার্য্য উভয়ই হইয়া থাকে। বাঁশের চটা দিয়া এমন সুন্দর রূপে ঢাল বুনে যে, বড়শার ফলা প্রবেশ করিতে পারে না। ঢালের ভিতর দিকে একটা থলি আছে, তাহাতে বাঁশের গোঁজ থাকে, তাহা আগমন পথে পুতিয়া দিলে শত্রু আসিতে পারে না।

গারোদিগের অখাদ্য প্রায় কিছুই নাই; গোমাংস, শূকর-মাংস, বাঘ, কুকুর, সাপ, বেঙ্গ, এ সকলই গারোদিগের প্রিয় খাদ্য। ভাত ও ধেনো মদ উহারা যথেষ্ট পায় ও খায়। সুরমা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী অন্যান্য পাহাড়িয়াদিগের ন্যায় গো-দুগ্ধ ইহাদিগেরও বড় ঘৃণার বস্তু। মণিপুরীদিগের ন্যায় ইহারাও বড় তামাক-খোর, কিন্তু গুলি, গাঁজা স্পর্শ করে না।

হিমালয় পর্ব্বতবাসী পাহাড়িয়া ও ত্রিবাঙ্কোরের নায়ার এবং নীলাচলের তোদাদিগের ন্যায় গারো পরিবারেও স্ত্রীই কর্ত্রী; এই নিয়মানুসারে তিন চারি ভ্রাতায় মিলিয়া এক স্ত্রী বিবাহ করে, এবং পুরুষের সম্পত্তি তাহার নিজের ছেলেরা না পাইয়া ভগিনীর ছেলেরা পাইয়া থাকে। গারো জাতীয়

নিয়মানুসারে পুত্রসন্তান পৈতৃক সম্পত্তি পায় না, কন্যারা পায়। পুত্রেরা বিবাহ করিলে স্ত্রী যে সম্পত্তি পায়, তাহাতেই তাহাদের প্রতিপালন হয়। পুত্র বিবাহ করিয়া বাড়ীতে স্ত্রী লইয়া আসিতে পারে না। সে বিবাহ করিয়া শ্বশুরের বাড়ীতে থাকে; কিন্তু বিবাহ হইলে কন্যা আপন স্বামিদিগকে আনিয়া পিতৃগৃহে বাস করে।

মানুষ মরিলে গারোরা দাহ করে, এবং চিতার ভস্ম গৃহদ্বারে পুতিয়া রাখে। দাহকালে কুকুর বলি দেওয়ার রীতি আছে; কুকুরেরা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পথ দেখাইয়া পরলোকে লইয়া যায়। গ্রামের রাজা মরিলে নরবলিও দেওয়া হইত; অতি অল্প দিন হইল, তাহা বন্ধ হইয়াছে। বলিদানের জন্য মানুষ কিনিতে না পাওয়া গেলে গারোরা নামিয়া সমভূমিস্থ কোন গ্রামে গিয়া মানুষ ধরিয়া আনিয়া বলি দিত। যুদ্ধকালে যাহাদিগকে বধ করিত, তাহাদিগের মস্তক ঘরের দরজায় টাঙ্গাইয়া দিত, যাহার দরজায় যত মস্তক, তাহার তত মান। এই প্রকার অত্যাচার নিবারণ উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ১৮৬৬ শালে গারো পর্ব্বত ভারতসাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। যে আয় হয়, শাসন কার্য্যে তাহার দ্বিগুণ ব্যয় হইয়া থাকে।

এদেশস্থ অন্যান্য আদিম জাতীয় লোকের ন্যায় গারোরাও ভূত প্রেত ও মায়ামন্ত্র মানে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, কোন কোন মনুষ্য মন্ত্রবলে মানবদেহ ত্যাগ করিয়া বাঘ, বা অন্য কোন জন্তুর দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারে। মরা পোড়াইবার সময়ে স্ত্রীলোক ও পুরুষ, এবং ছেলে মেয়ে সকলেই বিলক্ষণ মদ খায়।

খাসিয়া জাতি।

গারো পর্ব্বতের পূর্ব্ব দিকস্থ পাহাড়ে খাসিয়ারা বাস করে। চিরাপুঞ্জি খাসিয়া পর্ব্বতের অন্তর্গত, এখানে যে পরিমাণে বৃষ্টি-

পাত হয়, পৃথিবীর আর কোন স্থানে তেমন হয় না। খাসিয়া পাহাড়ে অপর্য্যাপ্ত চুনা পাথর আছে। তাহা পোড়াইয়া চুন করতঃ লোকে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে পাঠাইয়া দেয়। এই চুন লোকে পানে খায়, এবং ইহার দ্বারা ইট দিয়া বাটী নির্ম্মাণ করে।

১৮৮১ সালে খাসিয়া ভাষাবাদী ১১০,০০০ লোক ছিল। ইহাদের ভাষা একস্বরবিশিষ্ট, এবং আরও অনেক বিষয়ে বড় আশ্চর্য্য। নিম্নে নমুনা দেওয়া গেল।—

"নব কুম্‌তা উ ব্লি অ লা এত্‌ ইয়া কা"

বিলাতী সে কেলে গোব।

মানুষ মরিলে খাসিয়ারা দাহ করতঃ ছাইগুলি পুতিয়া রাখে। পুতিয়া চারি দিকে চারি খানা পাথর খাড়া করিয়া

দিয়া, আর এক খানা পাথর গর্ত্তের উপরে চাপা দেয়। ছবিতে যেরূপ পাথর সাজান দেখ, সে কালে ইউরোপে ঐরূপে লোকে মানুষের অস্থি পুতিয়া রাখিত। ইহাকে ক্রম্‌লেক্ বলে।

খাসিয়ারাও গারো বা লুসাইদিগের ন্যায় অসভ্য ছিল। তাহাদের দেশ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে পর, মিশনরিরা গিয়া, তাহাদিগের ভাষায় পুস্তক ছাপিয়াছেন, ও বিদ্যালয় করিয়া তাহাদিগকে লেখাপড়া শিখাইয়াছেন। খাসিয়ারা লিখিতে জানিত না। বর্ণমালা ছিল না, মিশনরিরা বর্ণমালা করিয়াছেন। এক্ষণে উহাদের ভাষায় ব্যাকরণ পর্য্যন্ত হইয়াছে। ১৮৮১ সালে খাসিয়া খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ২,৭৬৩ জন এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২,২৪২ জন ছিল।

বাঙ্গালা দেশের কাছারি ও আফিসে যেমন বাঙ্গালী কেরাণী দেখিতে পাও, সিলঙ্গেও তেমনি খাসিয়া কেরাণী, ও পোষ্ট মাষ্টার ইত্যাদি আছে। কএক জন খাসিয়া ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আছেন।

লুসাই বা কুকি।

চট্টগ্রামের পূর্ব্ব দিকে ও কাছাড়ের দক্ষিণ দিকের পর্ব্বতে লুসাই জাতীয় লোকেরা বাস করে। ইহাদিগের রাজা আছে। রাজা মরিলে রাজপুত্র রাজা হইয়া থাকে। সীমা প্রদেশে গিয়া লুঠপাট করতঃ যা পাইত, তাহাতেই ইহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গ্রামের মধ্যে রাজাই সর্ব্বপ্রধান ; আর সকলে তাঁহার আজ্ঞাধীন। রাজার অনেক দাস থাকে, তা ছাড়া স্বাধীন প্রজারাও আবশ্যক হইলে রাজবাটীতে বেগার দিয়া থাকে। অন্যান্য পাহাড়িয়া লোকের ন্যায় ইহারাও জঙ্গল কাটিয়া চাস করে। ইহাকে “জুম” করা বলে, কিন্তু ইহাদের প্রধান

কার্য্য শিকার ও যুদ্ধ। লুসাইরা বলবান ও হৃষ্টপুষ্ট, কিন্তু মুখাকৃতি ভাল নহে।

ইহারাও বড় তামাকখোর, ইহাদের স্ত্রীপুরুষ, ছেলে বুড়া, সকলেই তামাক খায়। মণিপুরিদিগের ন্যায় ইহারা হুঁকায় তামাক খায় না, অথবা বর্ম্মা বা উড়িয়াদিগের ন্যায় চুরুট টানে না; চীনাদিগের ন্যায় পাইপ টানে। বাঁশের চুঙ্গায় দোক্তার জল থাকে, লোকে মধ্যে মধ্যে তাই মুখে দিয়া কুলকুচি করে। কোথাও যাইতে হইলে দোক্তা-জলের চুঙ্গাটা সঙ্গে লইয়া যাইতে হয়। দোক্তার জল বড় উপাদেয় বস্তু; বাড়ীতে কুটুম্ব আসিলে বাঙ্গালিরা যেমন জলযোগ করিতে অনুরোধ করেন, লুসাইরা তাহা অপেক্ষা আগ্রহসহকারে তামাকের জল আনিয়া দেয়। ইহা না করিলে বড় অভদ্রতা প্রকাশ হয়। পুরুষেরা গলায় শলাকাটির মালা পরে, বাঘের দাঁত রূপা দিয়া বান্ধিয়া যদি কেহ গলায় পরে, তবে সে ত বড় ভাগ্যবান,—তাহাকে আর বাঘে স্পর্শ করিবে না।

চিরকালই লুসাইরা বৃটিশ এলাকায় আসিয়া লুঠপাট ও কাটাকাটি করিত। শ্রাদ্ধাদির সময়ে অনেক মানুষের মাথার প্রয়োজন। এই জন্য তাহারা বৃটিশ এলাকায় আসিয়া মানুষ মারিয়া মাথা লইয়া যাইত। প্রতি গ্রামে কাষ্ঠময় একটা মানুষের মূর্ত্তি আছে। ইহা তাহাদের দেবতা। লুঠপাট করিয়া দেশে ফিরিয়া গেলে মানুষের মাথাগুলি এই দেবতার সম্মুখে রাখিয়া দিত। যে যত মাথা আনিতে পারিত, তাহা দেবতার সম্মুখে সাজাইতে হইত। যাহার যত বেশি মাথা, তাহার তত মান।

বিগত ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লুসাইরা ত্রিপুরা জিলার ১৮৬ খানি গ্রাম আক্রমণ করতঃ এক শত লোককে ধরিয়া লইয়া যায়, অবশিষ্ট লোককে মারিয়া ফেলে। ১৮৭১ সালে আবার কাছাড়,

শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরা জিলার কতকগুলি গ্রাম আক্রমণ করে। এক জন চা-কর সাহেবকে বধ করতঃ তাঁহার কন্যাটীকে ধরিয়া লইয়া যায়। তাহাতেই লুসাইদেশে এক দল বৃটিশ সৈন্য প্রেরিত হওয়াতে ১৫ জন রাজা বশীভূত হয়, এবং চা-কর সাহেবের কন্যাটীকে এবং এক শত বাঙ্গালী বন্দী ফিরিয়া দেয়।

১৮৯০ সালে লুসাইরা আবার উৎপাত আরম্ভ করাতে একদল বৃটিশ সৈন্য চট্টগ্রাম হইতে, আব একদল ব্রহ্মদেশ হইতে গিয়া লুসাইদিগকে আক্রমণ করে। তদবধি কয়েকটী দুর্গ স্থাপিত হইয়াছে এবং বৃটিশ সৈন্য তাহাতে বাস কবিতেছে। উত্তম রাস্তা হইয়াছে, লোকেরা ক্রমেই শান্ত হইয়া আসিতেছে।

লেপ্‌চা।

কলিকাতা হইতে ঠিক উত্তর দিকে হিমালয় পর্ব্বত অঞ্চলে শিখিম নামে একটী ছোট-খাট রাজ্য আছে। এই রাজ্যে লেপ্‌চা জাতীয় লোকেরা বাস করে। শিখিমের দক্ষিণে দারজিলিং, অতি উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থান—কলিকাতা হইতে রেল পথে দার্‌জিলিং যাওয়া যায়।

লেপ্‌চাদিগের মুখাকৃতি কতকটা চীন দেশীয় লোকদিগের ন্যায়। ইহারা খর্ব্বাকৃতি, ইহাদের মুখ চেপটা, চক্ষু ঢালু, বর্ণ কটা, দাড়ি গোঁপ নাই। হাত পা মোটা ও শক্ত। ইহারা ভীরু ও নিরীহ।

কার্পাস-নির্ম্মিত বস্ত্রের চোগা লেপচার প্রধান পোষাক, তাহাতে লাল ও নীল বর্ণের কারুকার্য্য, কিন্তু আস্তিন নাই। শীতকালে ইহার উপরে ঢিলা আস্তিনের গরম জামা পরে। ইহারা বাঁশের চটার সঙ্গে গাছের পাতা বুনিয়া মাতলার মতন বড় বড় টুপি প্রস্তুত করে।

সিকিম দেশের মহারাণী।

ইহাদের অধিকাংশ অলঙ্কার তিব্বতে প্রস্তুত হয়।—কোন কোনটীতে দেবতার মূর্ত্তি, কোনটীতে যাদু, মন্ত্র, বা লামাদিগের অস্থি, কেশ, বা নখাংশ থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই দীর্ঘকেশ রাখে, এবং সুকেশ অতি গৌরবের ও আদরের সামগ্রী। চুলগুলি একত্র করতঃ একটীমাত্র বেণী করে; এই বেণীতেই কত কারু-কার্য্য! স্ত্রীলোকে পুরুষের বেণী রচনা করিয়া দেয়। স্ত্রীলোকের

দুই গাছি বেণী হয়। ঘাগরা ও কুর্ত্তা ব্যতীত ইহারা একটা পশমী আলখাল্লা পরে, তাহারও আস্তিন নাই। ইহাতে নানা রকমের কারু কার্য্য; রূপার কোমরবন্ধ দিয়া তাহা কোমরে বান্ধিয়া

লেপচা জল-বাহক।

রাখে। মাথায় বেগুনে রঙ্গের মুকুট। যখন তখন ইহারা তসরের কাপড় পরিয়া থাকে।

কাষ্ঠের এক প্রকার অতি সুন্দর বাটীতে উহারা জল খায়। ইহারা নানা শস্য দিয়া এক প্রকার বিয়ার মদ প্রস্তুত করিয়া পান করে।

যাজকেরা ইহাদের ডাক্তার, কাহাকে ভূতে ধরিলে যাজক ডাকাইয়া ভূত ছাড়াইতে হয়। ভোজ, পর্ব্ব ও পূজাদির বন্দোবস্ত যাজকেরাই করে। ইহারা ভূতের পূজা করিয়া থাকে, যে সকল দেবতা কোন অনিষ্ট করে না, তাহাদের পূজা দেয় না; বরং বলিয়া থাকে,—"তাহাদের পূজা দিবার প্রয়োজন কি? তাহারা ত আমাদের কোন অনিষ্ট করে না। পাহাড়ে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে যে সকল ভূত থাকে, তাহারাই সর্ব্বদা আমাদের অমঙ্গল করে, তাহাদের পূজা দেওয়া কর্ত্তব্য; কারণ তাহারাই আমাদের মন্দ করিতে পারে।"

পাখির নাড়ী ভুঁড়ি দেখিয়া শুভাশুভ লক্ষণ নির্দ্দেশ করা হয়। চিতা বাঘের দাঁত, পিত্তলের মালা, কোন বৃক্ষের কঠিন বীজ, এই সকল সূতায় গাঁথিয়া ছেলে মেয়েদের গলায় পরাইয়া দেয়, তাহাতে তাহারা নানা অমঙ্গল হইতে রক্ষা পায়।

সে কালের হিন্দু এবং বর্ত্তমান কালের নানা পাহাড়িয়া লোকের ন্যায় লেপ্‌চারাও দুই খণ্ড কাষ্ঠদণ্ডের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন করিতে বিলক্ষণ পটু।

১৮৭০ শালে খ্রীষ্টীয়ান মিশনরিরা লেপ্‌চাদিগের নিকট ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাদের ভাষায় কতকগুলি পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, অনেকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। মিশনরিরা স্কুল খুলিয়াছেন।

সুনার দেশের স্ত্রীলোক।

নেপাল।

নেপাল স্বাধীন রাজ্য; তিব্বৎদেশ ও ব্রিটিশ এলাকার মধ্যস্থলে স্থিত। এদেশ পর্ব্বতময়। চিরনিহার পর্ব্বত এই দেশে, ইহা সমুদ্র হইতে প্রায় ২০,০০০ হাত উচ্চ। পৃথিবীতে এমন উচ্চ পর্ব্বত আর নাই।

এদেশে নানা প্রকার লোকের বাস। এদেশের আদিমনিবাসীরা মূলতঃ তাতার বা চীনে আকৃতির, ধর্ম্ম বা আচার ব্যবহারে হিন্দুদের সহিত কোন সাদৃশ্য নাই। উপরে সুনার জাতীয় স্ত্রীলোকের ছবি দিলাম; পশ্চিমাঞ্চলের পাহাড়ে ইহারা বাস করে। ইহারা বিলক্ষণ বলবান।

গুরখারাই দেশের রাজার জাতীয়। নেপালের রাজা ও বড় মানুষেরা গুরখা। কথিত আছে যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে ইহারা ত্রিহুৎ হইতে নেপালে গিয়া বসতি করে। ইহাদের ভাষা অনেকাংশে হিন্দির ন্যায়; কিন্তু পাঁচ ভাগের এক ভাগ শব্দ তিব্বতীয়, সংস্কৃত শব্দও বিস্তর।

গুরখা।

গুরখারা অতি খর্ব্বকায়, দেখিতে পাঁচ-পাঁচি গোচের; কিন্তু ইহারা বড় সাহসী যোদ্ধা ও শিকারী। এক খানা বড় ও ভারী ছুরি সদাই তাহাদের সঙ্গে থাকে। ছুরিখানি বাঁকা, বড়শার

ন্যায় বিন্ধাইয়াও দেওয়া যায়, আবার ইহা দিয়া কোপাইয়া কিছু কাটাও যাইতে পারে। বাঘ দেখিলে গুরখা যেন ভয়ে ভীত হইয়া নীরবে বসিয়া পড়ে। বাঘ যেমন লক্ষ্য করিয়া লম্ফ দিয়া আসিয়া পড়ে, অমনি সে দুই হাত সরিয়া এক পাশে গিয়া, ছুরি দ্বারা এমন জোরে আঘাত করিতে থাকে যে, আর বাঘকে উঠিতে হয় না। এক আঘাতে যদি না মরে, বাঘ যেই উঠিতে চেষ্টা করে, গুরখা অমনি ভোঁজালি দিয়া গলায় কোপ মারে।

গুরখারা সচরাচর কালীর উপাসক। নেপালের আরও কতকগুলি লোকও কালীর উপাসনা করিয়া থাকে। হিমালয়ের কাঙ্গরা পাহাড়ের লোকেরা কালীর কাছে নরবলি দিত। ব্রিটিশ এলাকাভুক্ত হওয়াতে বন্ধ হইয়াছে। একটা প্রকাণ্ড কেলুগাছ ছিল, গ্রামের লোকে পালা করিয়া প্রতি বৎসর এই গাছের গোড়ায় একটী করিয়া মেয়ে বলি দিত। অল্প দিন হইল, গাছটা কাটিয়া ফেলা হইয়াছে। ১৮৮২ শালে গবর্ণর-জেনারেল সিরহিন্দ কাটা খাল উৎসর্গ করেন। খাল কাটা কার্য্যে যে সকল কয়েদি নিযুক্ত ছিল, তাহাদের ২০০ শত জনকে মুক্তি দেওয়া হয়। জনরব উঠিল যে, প্রত্যেক কয়েদি একটী করিয়া মেয়ে ছেলে নিয়া দিবে, খাল উৎসর্গের দিন সেই গুলি বলি দেওয়া হইবে, এই কড়ারে কয়েদিরা মুক্তি পাইয়াছে। আশে পাশের গ্রামের লোকেরা কিছু দিন অতি সাবধানে মেয়ে ছেলে গুলি লুকাইয়া রাখিত; সমস্ত রাত্রি আগুন জ্বালিয়া চৌকি দিত।

ভারতবর্ষীয় সৈন্যদলে কয়েক পল্টন গুরখা আছে।

তিব্বৎবাসী।

তিব্বৎ দেশ চীন-সম্রাটের অধীন; কিন্তু ভারতগবর্ণমেণ্টের এলাকায় অন্যূন ২০,০০০ হাজার তিব্বতীয় লোক আছে; এই জন্য এই জাতির বিবরণ লিখিত হইল।

তিব্বতীয় লামা।

তিব্বৎ দেশ ভারতবর্ষের উত্তরে। তিব্বতের দক্ষিণে হিমালয় পর্ব্বত ও উত্তরে কুয়েন্‌লুন পর্ব্বত-মালা। পৃথিবীতে এত

উচ্চ অধিত্যকা আর নাই। সমুদ্র হইতে ইহার গড় উচ্চতা প্রায় দেড় ক্রোশ। এ দেশে অনেক হ্রদ আছে। সিন্ধু, শতদ্রু, ও ব্রহ্মপুত্র নদের উৎপত্তি স্থান তিব্বতে। পৌষ মাঘ মাসে এদেশে ভয়ানক বরফ পড়ে। সমভূমিতে কোন কোন শস্য জন্মে, কিন্তু লোকেরা পশুপালন দ্বারাই প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। মেষ, ছাগল ও এক প্রকার মহিষ এ দেশের গ্রাম্য পশু ; এ দেশের মেষের লাঙ্গূল চওড়া (যেমন দুম্বা ভেড়া), ইহারা আবার ভারতবর্ষের বলদের ন্যায় বোঝা বহিয়া থাকে। ছাগের সর্ব্বাঙ্গে অতি কোমল লোম, তাহা ভারতবর্ষে আমদানি ও তাহা দিয়া শাল প্রস্তুত হইয়া থাকে।

তিব্বতীয়েরা মোঙ্গল জাতীয়, বিলক্ষণ বলবান ও বড় পরিশ্রমী। ইহাদের ভাষা স্বরানুযায়ী লিখিত হয়, এক প্রকার চিহ্নদ্বারা প্রত্যেক স্বর পৃথক করিয়া দেওয়া হয়।

ইহাদের ধর্ম্ম বড় আশ্চর্য্য। ইহারা বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচিত বটে, কিন্তু তৎসঙ্গে নানা ভূত প্রেতের আরাধনা ও তন্ত্র মন্ত্র মিশাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের প্রধান গুরুকে প্রধান লামা বলে, লোকে তাঁহাকে আগামী বুদ্ধের অবতার বলিয়া মানে। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক লামা বা গুরু আছে, তাহা-দিগকেও নানা বুদ্ধ মুনির অবতার বলিয়া লোকে মানে। আবার কতকগুলি নিম্ন শ্রেণীর ভিক্ষু আছে। ইহাদের ধর্ম্মপুস্তকের নাম তাঞ্জুর, ২২৫ খণ্ডে বিভক্ত।

লোকের বিশ্বাস এই যে, প্রধান লামা গুরু মরেন না, তাঁহার আত্মা এক দেহ ছাড়িয়া অপর দেহ অবলম্বন করে। লামার মৃত্যু হইলে, দেশের মধ্যে সেই সময়ে যত পুত্র সন্তান জন্মে, সকলের নাম রাজধানী লাসা নগরে পাঠাইয়া দিতে হয়। এই সকলের মধ্য হইতে তিনটী শিশুকে মনোনীত করা হয়। শেষে তাহাদের নাম লিখিয়া তিন খণ্ড কাগজ সোণার গাড়ুতে

পূরিয়া দেওয়া হয়। জল ঢালিতে গেলে যাহার নামের কাগজ আগে বাহির হইয়া পড়ে, সেই বালককে প্রধান লামা গুরুর পদে

দরজী।

অভিষিক্ত করা হয়। খুব জাঁক জমকের সহিত তাহাকে নগর দিয়া লইয়া গিয়া একটী স্বর্ণমণ্ডিত মন্দিরে রাখা হয়। সেখান হইতে সে আর কখনও বাহির হয় না। প্রধান লামা গুরু সচরাচর অল্প বয়সেই মরিয়া যায়। অনেকে মনে করে, কর্ত্তৃত্বপ্রিয় লোকে তাহাকে গোপনে বধ করিয়া ফেলে।

যাজকেরা পীত বা রক্তবর্ণ পোষাক পরিধান করে। এই পোষাক অজীন দিয়া প্রস্তুত করাই প্রশস্ত, কিন্তু যে শীত

পশমী কাপড় না পরিলে মানুষ বাঁচে না; কিন্তু যাজকদিগের পোষাকের এক কোণে দুই এক টুক্‌রা কানি আট্‌কাইয়া দিয়া ব্যবস্থার মান রাখা হয়।

যাজক মাত্রেরই হাতে ধাতুনির্ম্মিত একটী যন্ত্র থাকে, তাহাকে তিব্বতীয়েরা "দরজী" বলে, ইহার সংস্কৃত নাম বজ্র।

যাজকেরা এই যন্ত্র হাতে করিয়া দোলায়, তাহাতে ভূত প্রেত পলাইয়া যায়। ছবিতে বৌদ্ধ ঋষি হাতে করিয়া বজ্র দোলাইতেছেন।

যাজকের কাছে একটা ঘণ্টাও থাকে। উপাসনা কালে এই ঘণ্টা বাজাইয়া উপাস্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিতে হয়।

"ওঁ মণি পদ্মেহম্" এই বীজ মন্ত্রের বড় মান। তিব্বতীয় লোকদিগের বিশ্বাস এই যে, এই বীজ মন্ত্র আওড়াইলে সমস্ত অকল্যাণ দূর হয়, এবং ইহাই সকল প্রকার জ্ঞানের ও ধর্ম্মের সার। এই মন্ত্র যত জপ করিবে, তত শীঘ্র জপকর্ত্তার দেহান্তর ধারণ হইবে। তিব্বৎ দেশের স্ত্রীলোক পুরুষ, আবাল বৃদ্ধ সকলে এই মন্ত্রটী ত্রিসন্ধ্যা জপ করিয়া থাকে।

এই কথাগুলি লম্বা লম্বা কাগজে লিখিয়া, বা ঢাকের খোলের মতন একটা কাষ্ঠের খোলের গাত্রে মুদ্রিত করিয়া

ঘুরাইতে হয়। জপ করিলে যে ফল, ঘুরাইলেও সেই ফল। খোলের গাত্রে কথাগুলিকে লক্ষ বার লিখিয়া যদি এক বার ঘুরাও, তাহা হইলে এক লক্ষ বার জপ করার ফল হইল। আবার ছোট ছোট জপের খোল আছে, ধার্ম্মিক লোকে তাহা সঙ্গে সঙ্গে রাখে; হাতে করিয়া বা সুতা টানিয়া ঘুরাইতে হয়। বড় বড় পিপার মতন খোল আছে, সে গুলির গাত্রে লক্ষ লক্ষ বার উক্ত মন্ত্র লিখিত থাকে। এই প্রকার একটা পিপার ছবি দেওয়া গেল। যাজক ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে২ দড়ি ধরিয়া উক্ত পিপা ঘুরাইতে থাকে।
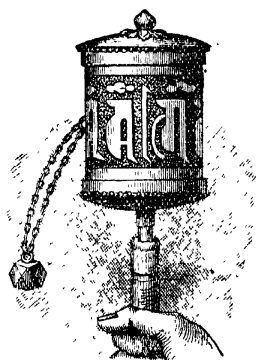
বিলাতে যেমন জল-স্রোতের বলে নানা কল চলে, তিব্বতীয়েরা তেমনি স্রোতের নিকটে মন্ত্র লিখিত পিপা এমন কৌশলে রাখে যে, স্রোতের বেগে আপনি ঘুরিতে থাকে। যাহার এরূপ জপের কল আছে, সে ত বড় ভাগ্যবান; অহোরাত্র কল ঘুরিয়া তাহার জন্য পুণ্যসঞ্চয় করিয়া থাকে। কোন কোন স্থলে গ্রামের সকল লোক মিলিয়া ঐরূপ একটা প্রকাণ্ড পিপা জলের ধারে রাখিয়া দেয়, তাহাতে সকলেরই পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে।

বড় বড় পতাকায় উক্ত মন্ত্র রেশম সূত্রের দ্বারা লিখিয়া উড়াইয়া দেওয়া হয়, বাতাসে যত বার পতাকা দোলাইবে, তত বার উক্ত মন্ত্রের জপ হইবে।

তিব্বৎ দেশে বিলাতী লোকের যাইবার অনুমতি নাই। কয়েক জন জর্ম্মণ দেশীয় মিশনরি তিব্বতে যাইবার আশায়, কাইলাং নামক সীমানাস্থ স্থানে কয়েক বৎসর অবস্থিতি করেন। এখানেও তিব্বৎ দেশীয় অনেক লোক বাস করে। বাইবেলের নানা খণ্ড তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদিত ও কতকগুলি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং অনেক তিব্বতীয় লোক পবিত্র খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

উড়িয়া।

বঙ্গদেশের দক্ষিণে উড়িষ্যা দেশ, এই দেশের লোকদিগকে উড়িয়া বলে। ইহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৫০ লক্ষ। উড়িষ্যা দেশ দীর্ঘ প্রস্থে অযোধ্যার সমান। এই দেশকে পূর্ব্বে উদ্র-দেশ বলিত, তাহার অপভ্রংশে উড়িষ্যা হইয়াছে। পুরাকালে ইহাকে উৎকল দেশও বলা যাইত। মহারাষ্ট্রীয়েরা এই দেশ অধিকার করে, পরে তাহাদের নিকট হইতে ইংরাজেরা লইয়াছেন (১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

সমুদ্রকূল বড় নিম্ন ও জলা, এই জন্য প্রায় প্রতিবৎসরই জলে ডুবিয়া যায়। সমুদ্রকূল হইতে অনেক অভ্যন্তর দিকে উচ্চ নীচ উর্ব্বরা ভূমি আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্থান পর্ব্বতময়, জঙ্গলে পরিপূর্ণ ও বন্য পশুর আশ্রয়স্থান।

উড়িয়া ভাষা অনেকটা বাঙ্গালার মতন। উত্তর ভারতবর্ষে যত ভাষা আছে, সে সকল ভাষার অক্ষরেরই মাত্রা সোজা, কেবল উড়িয়া অক্ষরের মাত্রা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। লোহার কলম দিয়া তাল-পত্রে লিখিতে হইলে ঐরূপ মাত্রার প্রয়োজন হয়। সোজা মাত্রা দিতে গেলে তালপত্র কাটিয়া যায়।

(উড়িয়া অক্ষর)।

ORIYA, or Uriya. *(Orissa.)*

ଯେହେତୁ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ବିଶ୍ୱାସକାରୀ ଯେମନ୍ତ
ନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ପରମାୟୁ ପାଇବ ଏଥିପାଇଁ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ
ଏତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦେଲେ

ডাং কস্ত বলেন যে, তিন শত বৎসর পূর্ব্বে উড়িয়া ভাষায় অনে ভাল পুস্তক ছিল। এক্ষণে তাহার অনেক মুদ্রিত হই-য়াছে। অধিকাংশই পদ্যময়।

১৮৭২ শালে সিবিলিয়ান বিভার্লি সাহেব উড়িয়াদিগের এই রূপ বর্ণনা করিয়াছিলেন।—

"উড়িয়ারা বাঙ্গালি অপেক্ষাও ভীরু। উন্নতির দিকে ইহাদের মন নাই, যত্নও নাই; পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছে, তাই করিয়াই সন্তুষ্ট। আধুনিক উন্নতিকর সকলই ঘৃণা করে, এই কারণেই ইহারা অত্যন্ত গোড়া, এবং ব্রাহ্মণদিগের পদদলিত।"

এ দেশের লোকদিগের উন্নতিসাধনার্থ বড় একটা চেষ্টা হয় নাই। অনেক পল্লীগ্রামের লোক আজিও গোরুর গাড়ি চক্ষে দেখে নাই। বঙ্গ দেশেও যে এরূপ পল্লীগ্রাম নাই, তাহা নহে। রেলপথ ত এত কাল ছিলই না, আবার তা ছাড়া রাস্তা ঘাটও অতি কদর্য্য, এই জন্য উড়িষ্যা দেশে আকাল হইলে লোকের কষ্টের আর সীমা থাকিত না। কিন্তু কাটা খাল হওয়াতে প্রজাদিগের বিশেষ উপকার হইয়াছে। কলিকাতা হইতে জাহাজে করিয়া, সমুদ্রপথে খানিক দূর গিয়া, শেষ খাল দিয়া কটক পর্য্যন্ত যাওয়া যায়। পূর্ব্ব উপকূল দিয়া যে রেলপথ হইতেছে, তাহাও উড়িষ্যা দেশের মধ্য দিয়া যাইবে। লেখা পড়ার চর্চ্চাও পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইতেছে। ব্রিটিশাধিকৃত উড়িষ্যা দেশে স্কুলে যাইবার উপযুক্ত তিন জন বালকের মধ্যে এক জন স্কুলে যায়। কটকে একটা কলেজ আছে। ১৮৮১ শালে এদেশে ৪,০০০ উড়িয়া খ্রীষ্টীয়ান ছিল।

পুরীস্থ জগন্নাথ দেবের মন্দির হেতুই উড়িষ্যা বিশেষ বিখ্যাত। শত শত বৎসর কাল এদেশের লোক বৌদ্ধ ধর্ম্ম মানিয়াছে। কথিত আছে যে, খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে বুদ্ধ দেবের

একটী দাঁত উড়িষ্যায় আনীত হইয়াছিল। পরে ৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এক নূতন রাজা পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত করেন।

পুরীস্থ জগন্নাথ দেবের উৎপত্তি বিষয়ে এই রূপ গল্প আছে। ব্যাধকর্ত্তৃক বনমধ্যে কৃষ্ণ হত হইলে, তদীয় অস্থিগুলি সেই নিম্ব বৃক্ষতলে পড়িয়াছিল। কিছু দিন পরে কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি দেখিতে পাইয়া, সেই অস্থিগুলি সংগ্রহ করতঃ গৃহে লইয়া যান। এই সময়ে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক রাজা ছিলেন। একটী দারুময়ী মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করতঃ, সেই মূর্ত্তির গর্ভে উক্ত অস্থিসমূহ স্থাপন করণার্থে উক্ত রাজা স্বপ্নযোগে আদিষ্ট হয়েন। এমন গুরুতর কার্য্য কি মনুষ্যের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে? এই জন্য রাজা বিশ্বকর্ম্মার আরাধনা করিতে লাগিলেন। তপে তুষ্ট হইয়া বিশ্বকর্ম্মা মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে সম্মত হইলেন। কিন্তু বলিলেন, আমি একাকী এক গৃহে বসিয়া মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিব, কেহ যেন সেখানে না যায়। রাজা তাহাতে সম্মত হইলেন। দিন পনের গেল, রাজা ভাবিলেন, দেখি, কত দূর হইল। এই ভাবিয়া দ্বার খুলিয়া দেখেন, নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হয় নাই। মূর্ত্তিটীর হাত পা হয় নাই। এই কারণে জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরাম মূর্ত্তির এই অসম্পূর্ণ অবস্থা।

পুরুষোত্তমস্থ মন্দিরকে লোকে স্বর্গদ্বার বলে। কথিত আছে যে, স্বয়ং মহাদেব এই জগন্নাথের মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম, মানুষে কেমন করিয়া করিবে? মন্দিরের গায়ে যত রাজ্যের অশ্লীল মূর্ত্তি আঁকা, এখানকার পূজার্চ্চনায় যার পর নাই কদর্য্য ভাব, আবার নৃত্যকী না হইলে জগন্নাথের সেবা হয় না।

উড়িয়া পাণ্ডাদিগের দালালেরা ভারতবর্ষের নানা অঞ্চলে যাইয়া, জগন্নাথের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতঃ স্ত্রীপুরুষ সকলকে জগন্নাথ দর্শনে লওয়ায়। তাহারা বলে যে, রথের উপর এই বামণমূর্ত্তি দর্শন করিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

জগন্নাথ মন্দিরের চতুর্দ্দিকস্থ পবিত্র ভূমি স্বর্ণময়, কিন্তু কলিযুগের পাপাধিক্যপ্রযুক্ত চর্ম্মচক্ষে সেই স্বর্ণরেণু সকল বালুকাবৎ দৃষ্ট হয়। এই প্রকার নানা আজগুবি কথা শুনিয়া লোকে জগন্নাথ যাত্রা করে। স্ত্রীলোক যাত্রিই বেশি। অনেক স্ত্রীলোক আত্মীয় জনের অনুমতি বিনাই পাণ্ডার সঙ্গে চলিয়া যায়। এখন জাহাজে যাওয়া যায়, তাই রক্ষা; তথাপি কটক হইতে পুরী যাইতে আসিতে অনেক লোক মরিয়া যায়। পূর্ব্বে মেদিনীপুর দিয়া হাঁটিয়া যাইতে হইত; রাস্তার দুই ধারে মানুষের মাথা পড়িয়া থাকিত। যাহারা পুরী হইতে ফিরিয়া আইসে, তাহারাও অস্থিচর্ম্ম-সার হইয়া আইসে। পথে বড় কষ্ট, এই জন্য প্রবাদ আছে, জগন্নাথ যেন মনে পড়ে, কিন্তু পথের কষ্ট যেন আর মনে না পড়ে।

বিখ্যাত পণ্ডিত হণ্টার সাহেব বলিযাছেন, "পীড়া হইয়া দলে দলে লোক মরিয়া যায়। পুরীতে যাত্রিদিগকে অতি কদর্য্য স্থানে থাকিতে, ও অতি কদর্য্য অন্ন আহার করিতে হয়।" পুরীতে অন্ন পাক করিয়া খাওয়া অতি বড় পাপ বলিয়া গণ্য। সকলকেই জগন্নাথের মহাপ্রসাদ কিনিয়া খাইতে হয়। নাম মহাপ্রসাদ বটে, কিন্তু ভাত ও তরকারি অর্দ্ধসিদ্ধ; আবার তাহা বাসি ও পচা;—বড় মহার্ঘ্য। পচা হউক, সরা হউক, সব খাইতে হইবে, ফেলিয়া দিলেই পাপ। এ অবস্থার মহাপ্রসাদ খাইলে সুস্থ ও বলবান্ লোকেরই ত উদরপীড়া হয়; সুতরাং পথশ্রান্ত যাত্রিরা যে তাহা খাইয়া মারা পড়ে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? কারণ অধিকাংশ যাত্রিই উদরের পীড়া লইয়া পুরীতে উপস্থিত হইয়া থাকে।

জুয়াং।

উড়িষ্যার পর্ব্বতময় প্রদেশে জুয়াং নামে এক জাতীয় লোক আছে। ইহাদিগের বিশ্বাস, বিধাতা সর্ব্ব প্রথমে ইহা-

দিগেরই সৃষ্টি করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, ইহাদের ন্যায় শোচনীয় দুরবস্থাপন্ন লোক ভারতে বুঝি আর নাই। এক সময়ে ভারতবর্ষের জঙ্গলে নানা জাতীয় লোকের বাস ছিল। তাহাদিগের প্রস্তরময় কুড়াল কাটারি ইত্যাদি এখনও দেশের নানা স্থানে মাটীর ভিতরে পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন, ইহারা সেই প্রকার কোন জাতীয় লোকের অবশিষ্টাংশ। ইহারাই কিন্তু ভারতবর্ষের প্রকৃত আদিমনিবাসী।

লৌহ যে কি বস্তু, তাহা ইহাদের জানা ছিল না। ইহারা সূতা কাটিতে বা কাপড় বুনিতেও জানিত না। মাটী দিয়া যে কিরূপে পাত্রাদি প্রস্তুত হয়, সে জ্ঞানও ইহাদিগের ছিল না। স্ত্রীলোকেরা কাপড় পড়িত না। কোমরে পলাকাটির তাগা বাঁধিয়া, তাহাতে সম্মুখে ও পিছনে গাছের পাতা গুঁজিয়া দিত। তাহাদিগের বিশ্বাস ছিল, কাপড় পরিলে বাঘে খাইয়া ফেলে।

১৮৭১ শালে এক জন ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী, মফস্বলে গিয়া, এই জাতীয় মাতব্বর লোকদিগকে ডাকাইয়া বিলাতী রং বিরঙ্গের খানিকটা করিয়া কাপড় দিয়া, বলিলেন, তোমাদিগের স্ত্রীলোক-দিগকে ইহা গিয়া পরিতে দেও। অনন্তর তাহারা দল বাঁধিয়া, সাহেবকে সেলাম করিয়া চলিয়া গেল। সেই দিন ১৯০০ লোক জমা হইয়াছিল। তাহারা নিজ নিজ গ্রামে গিয়া, পরিধেয় পাতা সকল জমা করিয়া পুড়িয়া ফেলিল। সাহেব যে কাপড় দিয়াছিলেন, তাহা পরিয়া বড় খুসি হইল; কিন্তু শুনিতে পাওয়া যায়, এই কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে, সাহেব আবার অমনি কাপড় দিবেন না, জানিয়া কতকগুলি স্ত্রীলোক পুনরায় গাছের পাতা পরিয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা কপালের নানা স্থানে উল্কি পরিয়া থাকে। এই উল্কি আবার নানা প্রকারের।

ইহাদিগের নৃত্য বড় চমৎকার। ভল্লুক নাচে, ইহারা ভল্লুকের অনুকরণ করে। শূকর ও কচ্ছপের নাচ, ময়ূরের নাচ, মোরগ

মুরগীর নাচ, এ সকলও বড় চমৎকার। শকুনীর নাচে এক জন মানুষ মরার মতন পড়িয়া থাকে। যুবতীরা আস্তে আস্তে পা ফেলিয়া, ঠিক শকুনীর মত তাহার কাছে যায়। শকুনীরা যেমন মরা লইয়া টানা টানি করে, তাহারাও তাই করে। লোকটা বেদনায় কোঁকাইতে থাকে। ইহাতে দর্শকদিগের বড় আমোদ।

ইহারা মন্ত্র তন্ত্র মানে না। ইহাদের ভাষায় "ঈশ্বর", "স্বর্গ" ও "নরক" শব্দ নাই। কিন্তু ইহারা পৃথিবীকে ও সূর্য্যকে বড় মানে, দুঃখ কষ্ট উপস্থিত হইলে পক্ষ্যাদি বলি দিয়া সূর্য্যের পূজা করে; বহুশস্য পাইবার আশায় বসুমতীর পূজা দেয়।

খন্দ জাতীয় লোক।

উড়িষ্যার দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে এবং মধ্য প্রদেশে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে ইহাদের বাস। ইহাদিগকে কন্দও বলা যায়। খন্দ শব্দে পাহাড়িয়া বুঝায়। ইহাদের সংখ্যা চারি লক্ষ ত্রিশ হাজার।

ইহারা দ্রাবিড়ীয় জাতিভুক্ত, এবং একই অঞ্চলে ১৫০০ শত বৎসর আছে। ইহাদিগের ভাষাকে খন্দ বা কূ বলে। এই ভাষা অনেকটা তামিল ও কর্ণাটী ভাষার সদৃশ, তেলুগু ভাষাবাদী লোক ইহাদের নিকটে বাস করে বটে, কিন্তু তেলুগু ভাষার সহিত খন্দ ভাষার বড় একটা সাদৃশ্য নাই। "সে" শব্দের খন্দ শব্দ "অবানু", তামিল শব্দ "অবন", কর্ণাটী শব্দ "অবনু", কিন্তু তেলুগু "বাড়ু"।

খন্দ পরিবারে, চীন পরিবারের ন্যায় পিতাই সর্ব্বের কর্ত্তা, তাঁহার অমতে পরিবারের কোন ব্যক্তির কোন কাজ করিবার অধিকার নাই। পিতার বর্ত্তমানে পুত্রদিগের কোন সম্পত্তিতে অধিকার বর্ত্তে না। স্ত্রীপুত্র লইয়া ছেলেরা পিতার বাটীতে

ও পিতার আজ্ঞাধীনে বাস করে। পিতামহীর হুকুম মতে যে যে খাদ্য সামগ্রী প্রস্তুত হয়, সকলেই ভাগ যোগ করিয়া খায়।

সে কালে প্রাণের পরিশোধে প্রাণ, এই ব্যবস্থা মানিয়া ইহারা চলিত। কেহ কাহাকে খুন করিলে, সেই হত ব্যক্তির আত্মীয় সজনেরা নিরূপিত সময়ের মধ্যে হত্যাকারীর প্রাণ লইতে বাধ্য ছিল। কিন্তু সে যদি যথাপরিমাণে শস্য ও গবাদি দিত, তাহা হইলে বধ করিবার প্রয়োজন হইত না। অজানিতরূপে যদি কেহ কাহাকে আঘাত করিত, আহত ব্যক্তি যত দিন সারিয়া না উঠিত, আঘাতকারীকে তাহার পরিবারের প্রতিপালন করিতে হইত। কেহ কাহারো দ্রব্য চুরি করিলে, তাহা ফিরাইয়া দিতে কিম্বা তাহার অনুরূপ অন্য কোন বস্তু দিতে হইত; কিন্তু কেহ চুরি করিয়া দুই বার দণ্ড পাইলে, তাহাকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেওয়া হইত। স্বজাতীয় লোকের সঙ্গে তাহার কোন সংস্রব থাকিত না। খন্দদিগের বিচারে ইহাই চূড়ান্ত দণ্ড। মল্লযুদ্ধ, তপ্ত তৈল বা লোহা পরীক্ষাদ্বারা কাঁথরার ঢিবিতে, বা বাঘের কিম্বা টিকটিকির উপরে বসিয়া শপথ দ্বারা বিবাদের নিষ্পত্তি হইত। সকলকে যুদ্ধার্থ বহির্গত করিতে হইলে তীর হাতে করিয়া লোকেরা পাড়ায় পাড়ায় দৌড়িয়া বেড়াইত। উৎসবার্থে যেমন, তেমনি করিয়া খন্দেরা যুদ্ধার্থ সাজ সজ্জা করিত। যত দিন এক পক্ষ নির্ম্মূল না হইত, তত দিন সূর্য্যোদয় হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করাই সর্ব্ববাদিসম্মত প্রথা ছিল।

এক বার কোন স্থানে তিন দিন ধরিয়া এই রূপ যুদ্ধ হইয়াছিল। কোন ব্যক্তি স্বচক্ষে দেখিয়া তদ্বিবরণ লিখিয়াছেন। স্ত্রীলোক ও প্রাচীন পুরুষেরা তীর ধনুকাদি লইয়া যুদ্ধে নিযুক্ত লোকদিগের অদূরে দাঁড়াইয়া আছে। কেহ অস্ত্র যোগাইতেছে, কেহ বা ভাত ও জল যোগাইতেছে, আর পরামর্শ দিতেছে। এক জন মানুষ প্রথমে পড়িয়া গেল, অমনি সকলে গিয়া তাহার

রক্তে আপনাদের কুড়াল লাল করিয়া লইল; এবং তাহার দেহ শত খণ্ড করিয়া ফেলিল। কেহ নিজে আহত না হইয়া শত্রুকে হত করিল, সে অমনি হত ব্যক্তির ডানি হাত কাটিয়া লইয়া পশ্চাতে যে সকল লোক বসিয়াছিল, তাহাদের কাছে গেল এবং সমর-দেবতাকে উৎসর্গ করণার্থ পুরোহিতের হাতে দিল। সন্ধ্যা হইবার পূর্ব্বেই দুই দলের পশ্চাদ্দিকে যাহারা বসিয়াছিল, তাহা-দের নিকট কতকগুলি করিয়া ডানি হাত জড় হইল; এক দলের ৬০ জন, অন্য দলের ৩০ জন হত হইয়াছিল; এতদ্ব্যতীত নিদান পক্ষে ততই লোক সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়াছিল। প্রথম দিনের লড়াইয়ের ফল এই।

যুদ্ধে জয় লাভ করিলে খন্দেরা আপনাদের বাহুবল গুণে জয় হইল বলে না, সমরদেবের বরে হইল, ইহাই বলে।

খন্দেরা বিস্তর দেবতা মানে; জাতীয় দেবতা, বংশীয় দেবতা, পারিবারিক দেবতা; ইহা ছাড়া নানা ভূত প্রেত ও দৈত্য দানব মানিয়া থাকে। কিন্তু বসুমতীই তাহাদের প্রধানা দেবতা; তাঁহারই অনুগ্রহে বহুশস্য জন্মে। প্রতি বৎসর শস্যের বুনন ও কর্ত্তন কালে, এবং যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে বা পরে এবং দেশে কোন দৈব দুর্ব্বিপাক ঘটিলে ইহারা বসুমতীকে নরবলি দিত।

ইহারা সমভূমিস্থ পল্লীগ্রাম হইতে ছেলে চুরি করিয়া লইয়া যাইত। সকলে তাহাকে আদর করিয়া খাওয়াইত। অব-শেষে নির্দ্ধারিত দিনে তাহাকে একটা খুঁটির সঙ্গে বাঁধিত। তখন পুরোহিত বলিত, "দাম দিয়া তোমাকে আনিয়াছি। আমাদের কোন পাপ নাই।" পাছে সে বলিদানের সময়ে বাধা জন্মায়, এই জন্য তাহার হাত পা প্রথমে ভাঙ্গিয়া ফেলিত। পরে পুরোহিত বালকটীর দেহ হইতে এক খণ্ড মাংস কাটিয়া লইয়া, বসুমতীকে উৎসর্গ করিত। শেষে আর সকলে এক এক

টুক্‌রা মাংস কাটিয়া লইয়া, আপন আপন ক্ষেত্রে গিয়া পুতিয়া দিত। ইহাতে ভূমিতে বহুশস্য ফলে, এই তাহাদের বিশ্বাস।

১৮৩৫ শালে খন্দেরা ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আনীত হইলে নরবলি-প্রথা বন্ধ করণার্থে বিশেষ কর্ম্মচারীর নিয়োগ হয়। এই কর্ম্মচারিরা অনেক যত্নে খন্দ পল্লী হইতে কতকগুলি ছেলে বাহির করিয়া আনেন। এই সকল ছেলেকে বলি দিবার জন্য লোকালয় হইতে চুরি করিয়া আনিয়া রাখিয়াছিল। যে ছেলে গুলির মা বাপের ঠিকানা হইয়াছিল, তাহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়, অপর ছেলে গুলিকে স্কুলে রাখিয়া দেওয়া
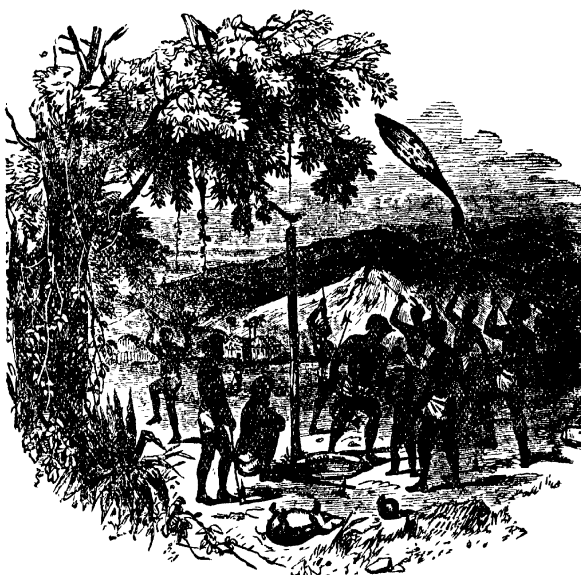
নরবলি।

হয়। নরবলি দেওয়াতে যেমন শস্য হইত, নরবলি না দেওয়াতে এখন তেমনি শস্য হইতেছে।

খন্দ পল্লীতে বসন্ত রোগের বড় প্রাদুর্ভাব, এই জন্য মাতাদেবীর অনেক মন্দির আছে। কাহারও বসন্ত হইলে লোকে মনে করে, মাতাদেবী তাহার দেহে আশ্রয় লইয়াছেন; তাহাকেও সকলে দেবাশ্রিত বলিয়া মানে। গুটি দেখা দিলেই দুধ দিয়া অতি ভক্তিভাবে রোগীর পা দুখানি ধোয়াইয়া দেওয়া হয়, নিকট-জ্ঞাতি এক জন মাথা বাড়াইয়া দিলে, পা দুখানি অতি সাবধানে তাহার চুল দিয়া মুছাইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর শীতলা (ইহাকেই ইহারা মাতা দেবী বলে) দেবীর কাছে সকলে এই স্তব করে, মা, দয়া করিয়া যখন চরণধূলা দিয়াছ, তখন এই পরিবারস্থ সকলকে বিশেষ রূপে রক্ষা করিও। পরে পরিষ্কার খড়ের বিছানা করিয়া রোগীকে তাহাতে শোয়ায়, তাহার চারি দিকে কাপড় টাঙ্গাইয়া পরদা করিয়া দেয়। আত্মীয় জনেরা মাতাদেবীর মন্দিরে গিয়া দেবীর দেহ চন্দনচর্চ্চিত করতঃ জল ঢালে, সেই জল আনিয়া বাড়ীর চারি দিকে ছড়াইয়া দেয়, এবং রোগীর কপালে তাই দিয়া ফোঁটা কাটে। এ সময়ে রোগীর পথ্য ফল মূল, ঠাণ্ডা জিনিস ও শরবৎ; কোন ঔষধই দিতে নাই। এ দেশে গোবীজে টীকা দেওয়া হয় না, তবে অনেকে মনুষ্যবীজে টীকা দিয়া থাকে। খন্দ অপেক্ষা অনেক সভ্য জাতীয় লোকেও বসন্তরোগীকে কোন ঔষধ দেয় না। যে ঘরে রোগী থাকে, সে ঘরের দাবায় কেহ জুতা পায়ে দিয়া যায় না। কোন কোন বাঙ্গালির বাটীতে এই রূপ দেখিয়াছি।

কোই নামে এক জাতীয় খন্দ দক্ষিণ ভারতবর্ষে আছে, তাহাদিগের বিবরণ পরে লিখিব।

গণ্ডজাতি।

ভারতবর্ষীয় কোন পুবাতন মানচিত্রে একটী বৃহৎ অঞ্চল "গণ্ডোয়ানা" বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এক্ষণে এই অঞ্চল মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত। বিন্ধ্যপর্ব্বত ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের নানা প্রদেশে এবং খন্দদের দেশ হইতে খান্দেশ ও মালোয়া পর্য্যন্ত নানা স্থানে বিস্তর গণ্ড জাতীয় লোকের বসতি। ১৮৯১ শালে গণ্ডভাষাবাদী লোক দশ লক্ষের অধিক ছিল।

এক সময়ে অনেকে মনে করিত, খন্দ এবং গণ্ড জাতীয় লোকেরা একই; কিন্তু এই দুই জাতীয় লোকের ভাষা নিতান্তই ভিন্ন ভিন্ন। গণ্ডীভাষা অতি সুনিয়মবদ্ধ; তামিল ভাষায় ক্রিয়ার তিনটী বই কাল নাই, গণ্ডীভাষায় ক্রিয়ার ছয়টী কাল।

গণ্ড জাতির ইতিহাস সম্পূর্ণ জানা যায় না। ভারতবর্ষীয় অধিকাংশ জাতিরই ইতিহাস অন্ধকারাবৃত। হিন্দুদিগের ত ইতিহাস নাই বলিলেই হয়। গণ্ডেরা বলে, উহাদিগের কয়েকটী রাজবংশ বহুকাল রাজত্ব করিয়াছে। অনেক শিলালিপি আছে, তাহা দেখাইয়া ইহারা সাহঙ্কারে বলে যে, আমাদেব কোন কোন রাজা স্ব ২ দানশীলতা দ্বারা পৃথিবীকে স্বর্গাপেক্ষা সুখের স্থান করিয়াছিলেন; তাঁহারা হস্তী আরোহণে যখন যুদ্ধযাত্রা করিতেন, তখন পদভরে ধরণী কাঁপিতে থাকিত; তাঁহারা যুদ্ধে এত রাজার শিরশ্ছেদ করিতেন যে, সেই রাজগণের রাণীদিগের চক্ষের জলে সমুদ্র ভাষিয়া যাইত।" এক্ষণে তাহাদিগের অবস্থা বড় ভাল নহে—অর্দ্ধসভ্য।

ইহারা নাতিদীর্ঘ, নাতিখর্ব্ব। ইহাদিগের বর্ণ কাল, নাক খাঁদা, ওষ্ঠ পুরু; সুতরাং ইহারা কোন মতে আর্য্যবংশীয় হইতে পারে না। প্রায় সকলেরই একই ধরণের কাপড় পরা। কোমরে যে কাপড় খানা জড়াইয়া পরা হয়, সেই খানিই স্ত্রী

পুরুষ উভয় জাতির পক্ষে প্রধান পরিধেয় বস্ত্র। পুঁতির মালা, পিতল বা লোহার মাকড়ি, পিতলের বালা, এবং পাকান দড়ির কোমর-বন্ধ ইহাদের প্রধান অভরণ। বাঙ্গালি বাবুদের ন্যায় ইহাদের মাথা খোলা; তবে ক্বচিৎ কেহ যদি মাথায় ফুল বা পাতা গুঁজিয়া দেয়। সভ্য জাতীয়া সুন্দরীগণের ন্যায় গণ্ড-রমণীরা পরচুলা পরে। ছয় মাস স্নান না করাতে দেবতারা গণ্ডদিগকে ভৎর্সনা করিয়াছিল, এই বিষয়ে একটী সুন্দর গান আছে। ইহারা বড় অপরিষ্কার অবস্থায় থাকে। মুখে, বাহুতে ও ঊরুতে নানা প্রকারের উল্কি। গায়ের গন্ধে হয় ত বাঙ্গালির অন্ন-প্রাসনের অন্ন উঠিয়া পড়ে। ইহারা অপেক্ষাকৃত সত্যপ্রিয় এবং হিন্দু অপেক্ষা সত্যবাদী, কিন্তু অনেকেই ছিঁচ্‌কে চোর। ইহারা নৃত্যগীতাদি বড়ই ভাল বাসে। অনেকে হাত-ধরা-ধরি করতঃ চক্রাকারে দাঁড়াইয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া অতি সুন্দর নৃত্য করে; নাচিয়া নাচিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িলে বসিয়া গান ধরে। প্রথমে এক জন পুরুষে এক পদ গায়, পরে এক জন স্ত্রীলোক যোগ দিয়া যেন কিছু সুর করিয়া আবৃত্তি করিতে থাকে। স্ত্রী-পুরুষ, বালক বালিকা, সকলেই বড় মদ খায়।

ইহাদের মধ্যে, হিন্দুদের ন্যায়, নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায় আছে। এক এক সম্প্রদায় এক এক দেবতার উপাসক। কোন প্রদেশের লোকে ঠাকুরদেবের পূজা করে। ঠাকুরদেবতা তাহাদের গৃহ-দেবতা, বাস্তুবাটী ও খামারের রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকেন; ইনি সর্ব্বব্যাপী, এই জন্য লোকে ইহাঁর প্রতিমা নির্ম্মাণ অনাবশ্যক মনে করে।

ওলাউঠার দেবতা মারী, বসন্তকালের দেবতা মাতাদেবী; ইহাঁদের সন্তোষের নিমিত্ত লোকে পশু বলিদান করে; অনন্তর গ্রামস্থ বাটী ঝাঁটী দিয়া, সেই সমস্ত আবর্জ্জনা দূরবর্ত্তী রাস্তায় ফেলিয়া দেয়। তাহাদের বিশ্বাস এই, পথিকদিগের পায়ে পায়ে

ধূলার সহিত উক্ত রোগ গ্রামান্তর নীত হইবে। বঙ্গদেশেও এ প্রকার টোট্‌কা-টাট্‌কি অনেক হয়। এ সকল দেবতা ছাড়া বনে আবার অসংখ্য ভূত প্রেত বাস করে; লোকেরা সর্ব্বদাই এই সকল ভূতের ভয়ে অস্থির। যেমন দেবতা, তাহার পূজার ব্যবস্থাও তেমনি। বাঁশের ডগায় একটু কানি বাঁধিয়া বাঁশটা বাড়ীর এক কোণে পুতিয়া দিলেই ভূত সেইখানে বসিয়া থাকে। সে পরিবারস্থ এক জন হইয়া পড়ে। বাড়ীতে কোন উৎসব হইলেই সেই বাঁশের কাছে কোন খাদ্য সামগ্রী রাখিয়া আসিতে হয়। কি বিশ্বাস!!

পরিবারস্থ কাহাকেও বাঘে খাইলে, পুরোহিত আনাইয়া আত্মার সদ্গতি ও তাহা হইতে বাঘ যে শক্তিটুকু লইয়া গিয়াছে, মন্ত্রবলে বাঘ হইতে সেইটুকু বাহির হয়। পুরোহিত খানিক ক্ষণ বাঘের মত লাফালাফি করতঃ যেখানে লোকটাকে বাঘে মারিয়াছে, লাফাইয়া পড়িয়া সেই খান হইতে কামড় দিয়া একটু মাটী তুলিয়া আনে।

অন্যান্য আদিম জাতীয় লোকের ন্যায় গণ্ডেরাও মন্ত্র তন্ত্র, তুক তাক বড় মানে। মনে কর, কাহারও স্ত্রী বা পুত্রের পীড়া হইল; মন্দ বাতাস, মন্দ আহার, এ সকল পীড়ার কারণ নহে; কোন ডায়িনী কিছু করিয়াছে, নহিলে পীড়া হইবে কেন? অনন্তর ডায়িনীকে খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করে। ডায়িনী বলিয়া কোন কদাকার বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে ধরিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলিত।

কোন কোন প্রদেশে কালীর মন্দির আছে। এই সকল মন্দিরে এককালে নরবলি হইত। বলিদেয় মানুষটাকে সন্ধ্যার পরে লইয়া গিয়া মন্দিরের মধ্যে বন্ধ করিয়া রাখিত। পূর্ব্বেই মন্দির মধ্যে কেহ লুকাইয়া থাকিত। সে গলা টিপিয়া দুর্ভাগ্য লোকটাকে মারিয়া ফেলিয়া চলিয়া যাইত। সকাল বেলা মরা মানুষ দেখাইয়া পুরোহিতেরা বলিত, মা কালী রাত্রে রক্ত চুষিয়া খাও-

য়াতে লোকটা মরিয়া গিয়াছে। বাস্তার নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের এলাকায় একটী বিখ্যাত কালীবাড়ী বা মন্দির আছে। কথিত আছে যে, ৬০ বৎসর পূর্ব্বে বাস্তারের কোন রাজা ২৫ জন পূর্ণবয়স্ক লোককে এক রাত্রে বলিদান করিয়াছিলেন।

কয়েক জন খ্রীষ্টীয়ান মিশনরি গণ্ড জাতির নিকটে সুসমাচার প্রচার করিতেছেন। বাইবেলের কোন কোন খণ্ড তাহাদিগের ভাষায় অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। খাসিয়া পর্ব্বতের খাসিয়া জাতীয় লোকেরাও এক সময়ে গণ্ডদের মতন অসভ্য ছিল। মিশনরিদিগের যত্নে এক্ষণে তাহারা অনেক বিষয়ে বাঙ্গালি অপেক্ষাও সভ্য হইয়া উঠিয়াছে।

সাঁওতাল।

গঙ্গা হইতে বৈতরণী নদী পর্য্যন্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি একটী প্রদেশে সাঁওতালদিগের বাস। এই প্রদেশ ১৭৫ ক্রোশ দীর্ঘ। এই প্রদেশের পশ্চিম দিকের জঙ্গলে কেবল সাঁওতালের বাস; কিন্তু সমভূমিতে হিন্দুদিগের সঙ্গে একই গ্রামে সাঁওতালেরা বাস করিয়া থাকে। ইহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক ১১ লক্ষ। ইহাদের দেশকে সন্তালিয়া বলে।

অনেকে মনে করেন, কলারীয় নামে এক জাতীয় লোক উত্তর-পূর্ব্ব দিক্ দিয়া, এক সময়ে ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। ইহারা সেই জাতীয় লোক। সাঁওতাল হিন্দু অপেক্ষা খর্ব্বাকার, কিন্তু বিলক্ষণ বলবান্। ইহাদের কপাল হিন্দুর কপালের মত উচ্চ নহে, গোল; কিন্তু বিলক্ষন প্রশস্ত। আর্য্যদিগের ওষ্ঠ অপেক্ষা ইহাদের ওষ্ঠ একটু মোটা; ইহাদের চুল খাড়া, মোটা ও ঘন কৃষ্ণবর্ণ; সমগ্র অবয়ব অনেকটা কাফ্রিদিগের মত।

ভারতবর্ষের উত্তরে ও দক্ষিণে যত প্রকার ভাষার প্রচলন দেখি, তাহার কোন ভাষার সহিত সাঁওতালি ভাষার জ্ঞাতিত্ব নাই।

ইহাদের ভাষায় ক্রিয়ার ২৩টী কাল, ৩টী বচন ও ৪টী কারক আছে। ইহা লিখিত ভাষা নহে। এক্ষণে রোমক, বাঙ্গালা, ও দেবনাগর অক্ষরে লিখিত হইতেছে। মিশনরিরা এই ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করিয়াছেন।

নঙ্কা বাড়ে আপে হোঁ
হোড়কো সমাঁগ্রে মরসাল গেঁল
ওচোই তাপে জেমোন উঙ্কো
হোঁ আপেয়া ; বুগি কামি গেঁ-
লকাটে আপেরেন সেরমারেন
জাঃ নামি কো সর হোএ। মথি ৫ ; ১৬।

হিন্দুদিগের ন্যায় সাঁওতালেরা পুরুষ পুরুষানুক্রমে পৈতৃক ভদ্রাসনে থাকে না, আসামের পাহাড়ের নাগা কুকিদিগের ন্যায় নানা স্থানে সরিয়া যায়। কুকিদিগের ন্যায় ইহাদের কুটীরে বাঁশের বেড়া দেওয়া নহে, মাটীর দেওয়াল। দেওয়ালে আবার নানা প্রকার ও নানা বর্ণের ছবি আঁকা। ঘরগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু বড় নীচু।

আশে পাশের পাহাড়িয়া লোকদিগের অপেক্ষা সাঁওতাল-দিগের পোষাক ভাল। স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালি সুন্দরীদিগের মত অতি পাত্‌লা সাড়ে নয় হাতী শাড়ী পরে না, উড়িয়া নারী-দিগের ন্যায় ১২ হাতী মোটা শাড়ী পরে; তাহাতে পাইড়ও থাকে। অধিকাংশ পাইড় লাল। বাহুতে, হাতে, গলায়, কাণে পিতল বা কাঁসার ভারী ভারী গহনা, এক এক জন স্ত্রীলোক গড়ে প্রায় ছয় সের পিতল কাঁসার গহনা বহিয়া বেড়ায়। কোন কোন সুন্দরীর গহনা ওজনে ১৭ সের। ইহারা বড় মানুষের মেয়ে।

সাঁওতাল ও পার্শ্ববর্ত্তী হিন্দুদিগের মধ্যে বহুকাল হইতে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাব চলিয়া আসিতেছে। খাদ্যাখাদ্যের বিষয়ে
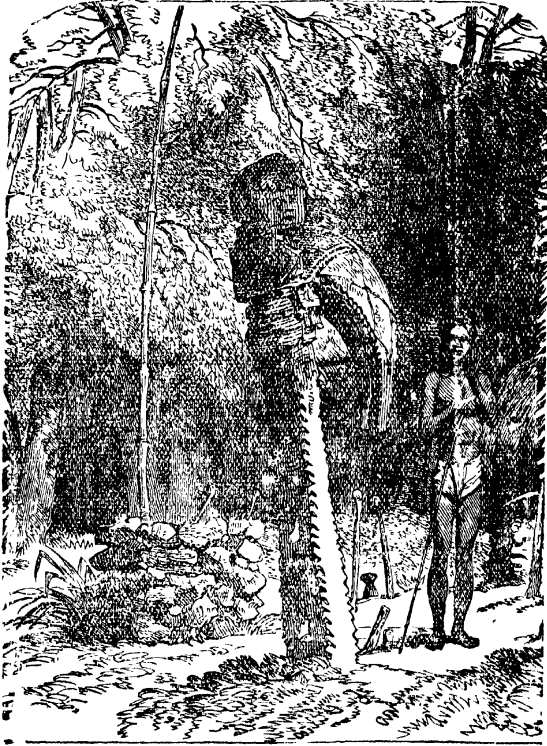
সাঁওতাল দেবতা

সাঁওতালদিগের বড় একটা বিচার নাই। কিন্তু কোন মতে তাহারা কখনও হিন্দুর হাতে খায় না। ব্রাহ্মণে রান্ধিলে তাহাও স্পর্শ করে না। ১৮৬৬ সালে উড়িষ্যা ও সাঁওতাল দেশে বড়

আকাল হয়। তখন যে সকল রাজকর্ম্মচারী দরিদ্র প্রজাদিগকে অন্নবিতরণ করিতে যান, তাঁহারা ইহা জানিতেন না। তাঁহারা রান্ধিবার জন্য ব্রাহ্মণ পাচক নিযুক্ত করেন। ব্রাহ্মণে রান্ধে, কিন্তু সাঁওতালে সে ভাত খায় না। অনেকে অনাহারে মরিয়া গেল, তবু ঘৃণিত হিন্দুর হাতে ভাত খাইল না। এ প্রকার হিংসাভাবের পুরুষ-পরম্পরাগত কোন কথা প্রচলিত নাই। ইহারা হিন্দুর বাড়ীতে চাকুরি করে, কিন্তু আপনারা রান্ধিয়া খায়।

বাঁশী ইহাদের জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। ইহারা অতি সরু বাঁশ দিয়া বাঁশী বানায়। এক একটা বাঁশী দেড় হাতের বেশি লম্বা। ইহারা অতি মধুর স্বরে বাঁশী বাজায়, সে স্বর হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবিষ্ট হয়। সন্তালদিগের বিশ্বাস এই যে, আদি পিতা-মাতার নিকট হইতে তাহারা বাঁশী বাজাইবার, গান গাহিবার ও নৃত্য করিবার শক্তি পাইয়াছে। হাঁড়িয়া নামে এক প্রকার মদ ইহারা বড় ভাল বাসে। পচা ভাতের সঙ্গে লতা পাতার রস দিয়া ইহারা এই মদ তৈয়ার করিয়া লয়। ইহারা বলে, ইহাও আদি পিতামাতা শিখাইয়াছিলেন, সুতরাং মধ্যে মধ্যে মদ খাইয়া আমোদ করা ইহাদের মতে অন্যায় কার্য্য নহে।

প্রতি গ্রামের মধ্যে খানিকটা মাঠ আছে, সেই খানে নৃত্য-গীত হয়। বৈকালে আহার করিয়া যুবকেরা এই মাঠে যায়। গিয়াই মধুর স্বরে বাঁশী বাজাইতে থাকে। বাঁশীর স্বর শুনিয়া যুবতীরা আর গৃহে থাকিতে পারে না। অমনি কেশবিন্যাস করিয়া, খোপায় বনফুল গুঁজিয়া গজেন্দ্রগমনে রঙ্গভূমির দিকে ধায়। ইহারা ইউরোপীয় লোকদিগের মত স্ত্রীপুরুষে হাত-ধরা-ধরি করিয়া অতি সুন্দর নৃত্য করে।

বৎসরে একদিন ইহারা বড় উৎসবের সহিত শিকার করিতে বাহির হয়। এটী তাহাদের পক্ষে পর্ব্ববিশেষ। গ্রীষ্ম কালে

এই পর্ব্ব হইয়া থাকে। এই সময়ে রৌদ্রে বনের ঘাস পুড়িয়া যাওয়াতে বন্য পশুদের লুকাইবার স্থান বড় একটা থাকে না। অনেক লোক ধনুর্ব্বাণ ও কুড়াল হাতে করিয়া, এবং কুকুর সঙ্গে লইয়া, খুব লম্বা সারি বাঁধিয়া বন্য পশু তাড়াইয়া লইয়া যাইতে আরম্ভ করে। এক এক দলে, কম হইলেও, এক এক হাজার শিকারী থাকে। এই প্রকারে বন্য জন্তু সকল এক দিকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়া তার দিয়া পাখি, শূকর, হরিণ ইত্যাদি মারে, কিন্তু বাঘ ভাল্লুক দেখিলে কিছু বলে না, পলাইয়া যাইতে দেয়।

হিন্দুদিগের ন্যায়, ইহারা মানুষ মরিয়া গেলে দাহ করে। কেহ মরিলে আত্মীয় লোকেরা খাটিয়ায় করিয়া দেহটা দাহ-স্থানে লইয়া যায়। চৌরাস্তায় পঁহুছিলে চাউল আর কাপাসের বীচি ছড়াইয়া দেয়, তাহাতে ভূতেরা আসিয়া সৎকার্য্যের বাধা জন্মাইতে পারে না। দাহ হইয়া গেলেও যদি দুই এক খানি অস্থি থাকে, তাহা দামোদর নদের জলে ফেলিয়া দেয়।

পরিবার মধ্যে কোন বিপদ ঘটিলে, বা কেহ পীড়িত হইলে, গ্রাম্য ভূতের পূজা দিতে হয়। পূর্ব্বাঞ্চলের সাঁওতালেরা বাঘের পূজা করে, কিন্তু রামগড় অঞ্চলে, কেবল বাঘে যাহাদের কোন ক্ষতি করিয়াছে, তাহারাই বাঘের পূজা দেয়। পরিবারের কাহা-কেও বাঘে খাইলে, বাড়ীর সকলে বাঘভূতের পূজা দিয়া থাকে।

হিন্দুরা সে কালে তামা তুলসি ও গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া দিব্য করিতেন, কারণ এ সকল স্পর্শ করিয়া কেহ মিথ্যা কথা কহিলে বড় পাপ হয়। সাঁওতালেরা তেমনি বাঘের চামড়া স্পর্শ করিয়া দিব্য করিয়া থাকে।

হিন্দুদিগের প্রতিবাসী কি না—তাই সাঁওতালদিগেরও অনেক উপাস্য দেবতা আছে। কিন্তু তাহার একটী ছাড়া আর সকলেই লোকের অমঙ্গল করিতে ভাল বাসে। প্রধান দেবতা সূর্য্য। বাটীর কর্ত্তা দুই তিন বৎসর অন্তর সূর্য্যদেবের উদ্দেশ্যে পাঁঠা
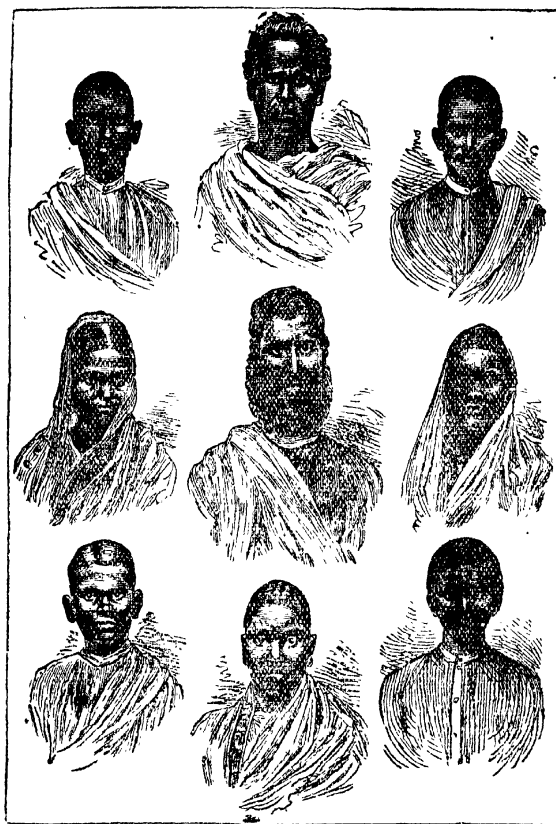
সাঁওতাল খ্রীষ্টীয়ান।

বলি দেয়। ইহা করিলে সূর্য্যদেব তাহাদিগকে বিপদ, আপদ ও পীড়া এবং পাপ হইতে রক্ষা করেন।

হাজার হাজার সাঁওতাল খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহাদের ভাষায় অনেক পুস্তক হইয়াছে, ইহারা এক্ষণে রীতিমত লেখা পড়া ও নানা শিল্প কার্য্য শিখিতেছে। অনেকে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করিতেছে।

ওঁরাউ।

ছোট-নাগপুরের সমতল, বা অধিত্যকা ভূমি বড়ই সুন্দর প্রদেশ। এই স্থান সমুদ্র হইতে প্রায় ১৫০০ হাত উচ্চ, ইহার ক্ষেত্রপরিমাণ ৭০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ। চারি দিক দিয়াই নদী-নালা গিয়াছে। বড় সুন্দর! এই প্রদেশে নানা জাতীয় লোকের বাস, তাহার প্রধান জাতীয় লোকের বিষয় বলিতেছি।

ওঁরাওদিগকে বাঙ্গালিরা ধাঙ্গড় বলে। ধাঙ্গড় অর্থে পাহাড়িয়া লোক; কিন্তু ইহারা আপনারাও যুবক যুবতীদিগকে ধাঙ্গড় বলিয়া থাকে। ছোট-নাগপুরের উত্তর ও পশ্চিমাংশেই বিস্তর ধাঙ্গড়ের বাস, কিন্তু অন্যান্য দিকেও অনেকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কর্ণেল দল্টন্ অনুমান করেন, ইহাদিগের সংখ্যা প্রায় ছয় লক্ষ।

ইহারা বড় পরিশ্রমী। কলিকাতা নগরে ও নগরের আশে পাশে অনেক ধাঙ্গড় আসিয়া রহিয়াছে। ইহারা মিউনিসিপালি-টীর চাকর, নর্দ্দামা পরিষ্কার করা ইহাদের কাজ। গাছ কাটা ও মাটী কাটা কাজে ইহারা বিলক্ষণ পটু।

ইহাদিগের ভাষা দ্রাবিড়ীয় ভাষাশ্রেণীভুক্ত; কিন্তু আর্য্য-জাতীয় লোকের সঙ্গে ধাঙ্গড়দিগকে মিশিতে হয় বলিয়া, ইহাদের ভাষায় অনেক আর্য্য শব্দ প্রবিষ্ট হইয়াছে। পুরুষপরম্পরাগত কথা এই যে, ইহারা ভারতবর্ষের পশ্চিম হইতে এই প্রদেশে আসিয়াছে।

ইহাদের কুটীর সাঁওতালদিগের কুটীরের ন্যায় পরিপাটী নহে, অতি কদর্য্য। ইহারা চালে চালে ঘর বাঁধিয়া বাস করে।

চারি ভিটায় চারিখানা কুড়ে তুলিয়া মাঝখানে ছোট উঠান রাখে, তাহাতে না সরে জল, না পড়ে ঝাঁটা। গোরু ছাগল লইয়া ধাঙ্গড়েরা একই ঘরের মধ্যে বাস করে। কেবল শূকরের জন্য স্বতন্ত্র ঘর থাকে। ঘরের দেওয়াল মাটীর, কিন্তু সে পাথুরে মাটীর দেওয়াল, ইটের দেওয়ালের মত মজবুত। এই পাথুরে মাটী পৃথিবীর অনেক নীচে পাওয়া যায়। লোকে বড় বড় গর্ত্ত করিয়া তাহা তুলিয়া লয়, কিন্তু সে গর্ত্ত আর ভরাট করে না। যত রাজ্যের আবর্জ্জনা তাহাতে গিয়া পড়ে। তাহা পচিয়া দুর্গন্ধ বাহির হয়। তাহাতে জ্বর ইত্যাদির প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে।

এখন ক্বচিৎ কোন গ্রামে কেবল ধাঙ্গড়ের বাস। মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার লোক আসিয়া গ্রামে দোতালা বাড়ী বাঁধিয়া বাস করিতেছে। ইহারা প্রায়ই মহাজনী করে, অর্থাৎ টাকা ধার দেয়।

প্রতি গ্রামে এক এক জন মোড়ল আছে, সকলেই তাহাকে মানিয়া চলে। যদি কোন মোড়ল ভাল করিয়া কাজ চালাইতে না পারে, তবে তাহার পদে অন্য লোক নিযুক্ত করা হয়। গ্রামের অনেক বিবাদ বিসম্বাদ এই মোড়ল নিষ্পত্তি করিয়া দেয়।

পুরোহিতও আছে; পুরোহিত নহিলে ইহাদের চলে না; কিন্তু পুরোহিতের পুত্রকেই যে পুরোহিত হইতে হইবে, তাহার কোন মানে নাই। পুরোহিতের পুত্র যদি মূর্খ, অজ্ঞ, বা খ্রীষ্টীয়ান হয়, কেমন করিয়া সে পিতার পদ পাইবে? এই পদ খালি হইলে দৈব-সাহায্যে নূতন লোক নিযুক্ত হইয়া থাকে। গ্রামের লোকেরা এক প্রকারে পুরোহিতেরই হস্তগত। পুরোহিতই লোকদিগের হর্ত্তা-কর্ত্তা-বিধাতা। ইহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানে কতকগুলি কুৎসিত আমোদ আহ্লাদ আছে। পুরোহিত সে সকল বিষয়ে পণ্ডিত। ইহাদের বিশ্বাস এই, মানুষ আমোদ আহ্লাদ করিলে দেবতারা যেমন খুশি থাকেন, এমন আর কিছুতে নহে। এই জন্য পূজা পার্ব্বণ হইলেই তৎসঙ্গে ভোজন, সুরাপান, নৃত্যগীত ও প্রণয়প্রকরণ চাই।

বহুকালের গ্রামে অবিবাহিত যুবকদিগের জন্য একটী স্বতন্ত্র বাটী আছে। রাত্রিকালে সকলকে এই খানে থাকিতে হয়, না থাকিলে দণ্ড হইয়া থাকে। তবে কাহাকেও যদি কার্য্যানুরোধে গ্রামান্তর গিয়া রাত্রি বাস করিতে হয়, তাহাতে দণ্ড নাই।

এই আটচালার সম্মুখে একটী প্রাঙ্গণ আছে। প্রাঙ্গণটী দীর্ঘে প্রস্থে ৩০ হাত হইবে। এটী গ্রামের রঙ্গভূমি। প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে একটা পাথর পোতা আছে, চারি দিকে বসিবার স্থান, এক পাশে তেঁতুল গাছ। যাহারা নাচিয়া নাচিয়া ক্লান্ত হয়, তাহারা এই গাছ-তলায় বসিয়া বিশ্রাম করে। দর্শকেরাও গাছ-তলায় বসিয়া থাকে। উৎসবের কয় মাস সন্ধ্যার পরেই নৃত্য আরম্ভ হয়। যদি মদে কুলায় ত সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত নৃত্য গীত চলে। কোন কোন পর্ব্ব উপলক্ষ্যে রঙ্গভূমিতে লাল ধূলা ছড়াইয়া দেওয়া হয়। নর্ত্তকগণের চরণের আঘাতে সেই ধূলা আকাশে উঠিতে থাকে। শেষে তাহাদের কাপড় ও দেহ লালবর্ণ হইয়া যায়।

স্ত্রীলোকেরা উল্কি পরে। ছোট থাকিতেই কপালে তিন চারিটী দাগ করিয়া দেওয়া হয়। যুবকেরা ডাহিন বাহুতে দাগ করিয়া লয়। ইহাতে না কি বালকেরা পরিশ্রমী ও বলবান্ হয়। বালিকারা বড় হইলে, আপন আপন রুচি অনুসারে, হাতে পায়ে মুখে আরো উল্কি পরে।

ধাঙ্গড়েরা পরমেশ্বরকে মানে, কিন্তু বলে, তিনি সূর্য্যেতেই সপ্রকাশ। ঈশ্বর বড় উপকারী, কিন্তু মানুষকে ভূতে ধরিলে কিছু বলেন না, সুতরাং তাঁহার আরাধনা করে না; ভূত প্রেত মানে।

ধাঙ্গড়দের বিশ্বাস এই যে, কোন মানুষকে বাঘে খাইলে সে বাঘ হইয়া জন্মে। কিন্তু যাহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়, তাহাদের পঞ্চে পঞ্চ মিশাইয়া যায়, আর জন্ম হয় না; তাহারা প্রেতলোকে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। পাহাড়ে, রাজপথে, নদী-তীরে, গোরস্থানে ভূত থাকে, প্রসবকালে যে সকল স্ত্রীলোকের

মৃত্যু হয়, তাহারা প্রেতিনী হইয়া যায়; ইহারা শাদা কাপড় পড়িয়া, শ্মশানে মশানে বেড়াইয়া বেড়ায়; তাহাদের মুখ অতি সুন্দর, কিন্তু পৃষ্ঠদেশ কয়লার মত কালো। চলিবার সময়ে তাহাদের পায়ের গোড়ালী সম্মুখ দিকে থাকে। ইহারা পথিকদিগকে ধরিয়া টানাটানি করে। নির্ব্বিঘ্নে যে জন ভূতের হাত এড়াইয়া আসিতে পারে, সে ত বড় ভাগ্যবান্।

কোল।

অনেক সময়ে সমগ্র কোলারীয় জাতিকে কোল বলা যায়; কিন্তু ইউরোপীয়েরা প্রধানতঃ মুণ্ডা-কোল, লারকা কোল অথবা হো এবং ভূমিজি কোলকে এই নামে আখ্যাত করিয়া থাকেন; কিন্তু কোলেরা আপনাদিগকে কোল বলে না, যেমন আমরা আপনাদিগকে বাঙ্গালি বলিয়া থাকি। যেমন নেড়ে বলিলে মুসলমানদিগের অপমান হয়, তদ্রূপ কোল বলিলে উহাদেরও অপমান হয়।

বেহার অঞ্চলে অর্থাৎ প্রাচীন মগধ রাজ্যে কোলেরা এক সময়ে বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ছিল। ইহাদের সমাজে এই পরম্পরা-গত বাক্য প্রচলিত আছে। মগধ রাজ্যে অনেক পুরাতন দুর্গ ও বাড়ীভাঙ্গা-ইট-পাথর আছে, তাহার অনেক গুলি কোলদিগের নির্ম্মিত বলিয়া বিদিত। এক্ষণে ইহারা ছোট-নাগপুরের পাহাড়ে ও অধিত্যকা ভূমিতে বাস করে। ইহাদের নানা গোষ্ঠী; এক এক গোষ্ঠী এক এক জন্তু, লতা বা বৃক্ষের নামানুসারে আপনাদের গোষ্ঠীর নাম রাখিয়াছে। হিন্দুরা যেমন সগোত্রে বিবাহ করিতে পারে না, তেমনি ইহারাও সগোষ্ঠীতে বিবাহ করিতে পারে না। গোষ্ঠীর নাম সাপ, কচ্ছপ, আমগাছ। কচ্ছপগোষ্ঠীর পুরুষ কচ্ছপগোষ্ঠীয় কন্যার পাণিগ্রহণ করিতে পারে না।

এক এক মুণ্ডারী গ্রামে এক এক জন মোড়ল আছে, তাহাকে মুণ্ড বলে, ফলে সে সেই গ্রামের মস্তকস্বরূপ। এক এক গ্রামে প্রায়ই একই গোষ্ঠীর লোক বাস করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকেরা কাঁসার খাড়ু, বালা, কঙ্কণ ইত্যাদি পরিয়া থাকে, এ সকল নিতান্ত ভারী। বঙ্গদেশে নবশাখ ও বর্ণসঙ্কর জাতীয় ধনী লোকের স্ত্রীরা যেমন মোটা মোটা ও ভারী ভারী গহনা পরে, কোলদের মধ্যে যাহাদের দু টাকার সংস্থান আছে, তাহাদের নারীরাই বেশি ভারি গহনা পরে। স্ত্রীলোকে হাটে গিয়া যখন কাঁদিতে কাঁদিতে খাড়ু পরে, আর হাত বহিয়া রক্ত পড়িতে থাকে, তখন দেখিলে হাসিও পায়, দুঃখও হয়। পায়ে যে কাঁসার বাঁক পরে, সে গুলিও ভারি কসা। পাছে পরাইতে পরাইতে চামড়া উঠিয়া যায়, এই জন্যে আগে পায়ে তেল মাখা চামড়া মুড়িয়া লয়। যে মেয়েটী বাঁক বা খাড়ু পরে, দুই তিন জনে তাহাকে ধরিয়া থাকে; আর সে চীৎকার শব্দে হাট মাথায় করিয়া তুলে। আধ ঘণ্টার কমে খাড়ু পরান হয় না। পরা হইয়া গেলে, মেয়েটী হাত পা নিরীক্ষণ করতঃ আপনার সৌন্দর্য্যে আপনি মোহিত হইয়া, আবার হাসিতে থাকে।

হো-কোল স্ত্রীলোকেরা তীর বড় ভাল বাসে। ইহাই তাহাদের জাতীয় চিহ্ন বিশেষ। হো-জাতীয় যে ব্যক্তি লিখিতে জানে না, সে দলিলে একটী তীর আঁকিয়া দেয়, ইহাই তাহার ঢেঁড়া সহি।

কোলেরা রাজ হাঁস ও পাতি হাঁস পুষিয়া থাকে। ছাগ ও মেষও পোষে, কিন্তু সে কেবল দেবতার কাছে উৎসর্গ করিবার নিমিত্ত। যে সকল ছাগ ও মেষ দেবতার কাছে বলি দেওয় হয়, সে সকলের মাংস রান্ধিয়া খায়। হিন্দুরা যেমন অনেক সময়ে মাংস খাইবার অনুরোধে কালী বাড়ীতে পাঁঠা পাঠাইয়া দেন কোলেরাও সময়ে সময়ে তাহাই করিয়া থাকে। ইহারাও গে

মহিষ পুষিয়া থাকে। নাগা কুকিদিগের মত কোলেরা গো মহিষাদির দুধ খায় না। হিন্দুদের পক্ষে গোরু দেবতাবিশেষ, কিন্তু বৎসটীকে বঞ্চিত করিয়া গাভীর দুধ আপনারা খান। গাভী যখন দেবতা, তখন তাহার বৎসও ত দেবতা, তবে দেবতাকে বঞ্চিত করিয়া নিজের পেট ভরান কি পাপ নহে?

কোলেরা সচরাচর গোমাংস, ছাগ, মেষ ও মৃগমাংস, হংস ও কুক্কুট-মাংস এবং মৎস্য খাইয়া থাকে; কিন্তু ধাঙ্গড়দিগের মত ভাল্লুকের, বানরের, সাপের ও ইন্দুর ইত্যাদির মাংস খায় না। ইহারা অন্য জাতীয় লোকের হাতে মিষ্টান্ন খায়, কিন্তু ভাত খায় না। ভাতের বিষয়ে ইহাদের বড় বিচার। আহারে বসিলে যদি অপর জাতীয় কাহারও ছায়া আসিয়া পড়ে, অমনি ভাত ফেলিয়া দেয়।

পিতার সম্পত্তিতে পুত্রদের সমান অধিকার, কিন্তু পিতার পরলোক হইলে, যত দিন সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, তত দিন সকল ভ্রাতায় একত্র বাস করে; ছোট ভাই বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পৈতৃক বিষয় ভাগ করিয়া সকলে পৃথক হয়। ভগিনী-দিগকে ইহারা গোমেষাদির ন্যায় সম্পত্তিবিশেষ জ্ঞান করে, সুতরাং ভাগ করিয়া লয়। কন্যার পণ সচরাচর ছয়টা গোরু। ভগিনীর বিবাহ হইলে ভ্রাতারা পনের গোরু ভাগ করিয়া লয়। এক্ষণে লোকে কন্যাপণ নিতান্ত বাড়াইয়াছে, এই জন্য প্রতি গ্রামে অনেক অবিবাহিতা যুবতী দেখিতে পাওয়া যায়। যুবতীরা দুঃখ করিয়া বলে, "আজ কাল যুবকেরা ভরসা করিয়া বিবাহের কথা পাড়ে না।"

সন্তান জন্মিলে সন্তানের পিতামাতা উভয়কেই অষ্টাহকাল অশুচি গণ্য হইতে হয়। এ সময়ে বাড়ীর আর সকলে স্থানান্তর চলিয়া যায়, অর্থাৎ প্রতিবাসিদিগের বাড়ীতে গিয়া থাকে। স্বামীকে ঐ কয় দিন স্ত্রীর আহারাদি প্রস্তুত করিয়া দিতে হয়।

প্রসববেদনা অধিক ক্ষণ স্থায়ী হইলে, সকলেরই বিশ্বাস এই যে, কোন ভূত ইহা করিয়াছে। পুরোহিত ডাকাইয়া সেই ভূতের নাম ধাম জ্ঞাত হইয়া, বাড়ীর কর্ত্তা তাহার যথারীতি পূজা দেয়। অষ্টাহ গত হইলে সকলে ফিরিয়া গৃহে আইসে, আত্মীয় স্বজন-গণকে ডাকা হয়, ভোজনান্তে সকলের সাক্ষাতে শিশুর নাম-করণ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র সচরাচর পিতামহের নাম পাইয়া থাকে। কিন্তু সেই নাম দিলে বালকের মঙ্গল হইবে কি না, নানা উপায়ে তাহা আগে জানিয়া লইতে হয়। যে নাম রাখা হইবে, সেই নামটীর উল্লেখ হইলেই এক বাটী জলে একটা ধান ফেলিয়া দেওয়া হয়, যদি ধানটী ভাসে, তবে সেই নাম রাখা হয়, যদি ডুবিয়া যায়, তবে সে নাম রাখিতে নাই।

নাগা, কুকি, ধাঙ্গড় ও সাঁওতালদিগের ন্যায় কোলেরাও নৃত্য-গীত বড় ভাল বাসে। কলিকাতার মুসলমান ও কোন কোন ফিরিঙ্গির ন্যায় ইহারা মোরগের লড়াই বড় ভাল বাসে। মোরগ পুষিবার ইহাই প্রধান কারণ। হাট-বারে জাঁক জমক করিয়া নানা গ্রামের লোকে মোরগ লইয়া হাটে যায়। হাটের মাঠে বা গাছ-তলায় মোরগের লড়াই হইয়া থাকে। শত শত লোক দাঁড়াইয়া তামাসা দেখে। হাট ছাড়া অন্যান্য স্থানেও দিন ধার্য্য করিয়া মোরগের লড়াই হইয়া থাকে। ইহাতে লোকের বড় আমোদ। আবার মোরগের পায়ে তীক্ষ্ণ ছুরি বাঁধা থাকে, সুতরাং যেটা হারে, সেটা মরিয়া যায়। জয়ী মোরগের কর্ত্তা মরা মোরগটা পায়।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া কোলেরা সূর্য্যের আরা-ধনা করে। পাশ্চাত্য জাতিদিগের ন্যায় ইহারা সূর্য্যকে পুরুষ এবং চন্দ্রকে নারী বলিয়া গণ্য করে। ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে, সূর্য্য এক সময়ে চন্দ্রকে বিবাহ করেন; কিন্তু চন্দ্র পরপুরুষগতা হওয়াতে রাগ করিয়া তাহাকে দুই
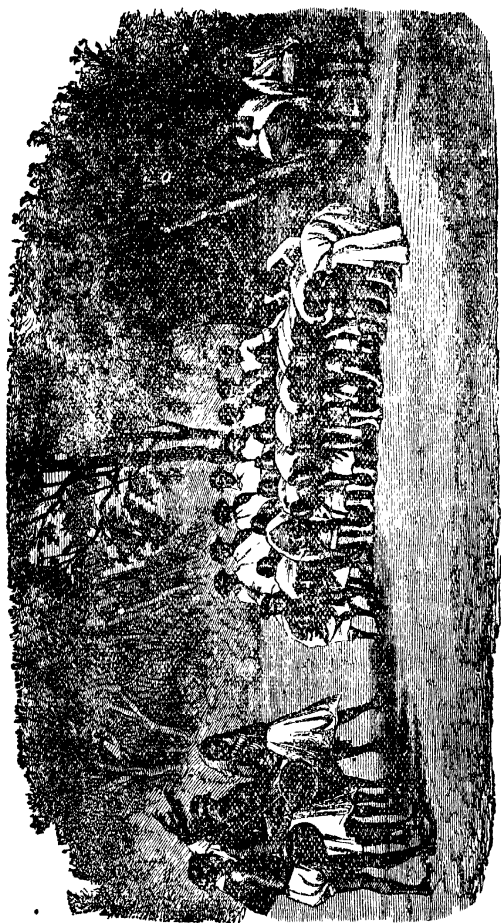
কোলেদের নৃত্য।

খণ্ড করিয়া ফেলেন। রাগ থামিয়া গেলে যখন অনুতাপ হইল, তখন দেখিলেন, কাজটা ভাল হয় নাই; এই জন্য সূর্য্যের বরে চন্দ্র এক এক বার পূর্ণাবয়বে দেখা দিয়া থাকেন। ইহারা বলে, তারাগণ চন্দ্রের কন্যা। সূর্য্যের পরেই পর্ব্বত প্রধান দেবতা। লোকের বিশ্বাস যে, পর্ব্বত দেবতাই বৃষ্টি বর্ষাইয়া থাকেন। এই জন্য লোকে ইহাঁকে বড় মানে। প্রতিবৎসর গ্রামের লোকেরা পর্ব্বত দেবের পূজায় মোরগ ও ছাগ বলি দিয়া থাকে, কিন্তু দুই তিন বৎসর অন্তর মহিষও বলি দেয়। তখন বড় ধূম-ধামে পূজা হয়। কাহারও পীড়া হইলে এই দেবতার পূজা দিতে হয়। প্রতি গ্রামের নিকট একটা করিয়া বাগান আছে, গ্রাম্য দেবতারা সেই বাগানে বাস করেন। ইহাঁদের গুণেই সুশস্য জন্মে, তাই অগ্রাহয়ণ পৌষ মাসে বড় ধূম-ধামে ইহাঁদের পূজা হইয়া থাকে। তাহার পরেই নদীতে ও পুষ্করিণীতে যে সকল ভূত থাকে, তাহারা; আরও যে সকল ভূত প্রেত আছে, তাহারা পূর্ব্বপুরুষদিগের আত্মা, সর্ব্বদা এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়, কখনও ভাল করে, কখন মন্দও করে। আহারাদি প্রস্তুত হইলে ইহাদের ভোগ দেওয়া হয়। ইহারা প্রতিদিন খাইতে পায়।

মানুষের, বা গোমেষাদির যে পীড়া হয়, তাহার কারণ দুটী মাত্র, কোন দেবতার ক্রোধ, বা কোন ডায়িনী, বা কোন দুষ্ট লোকের মন্ত্র। দেবতার ক্রোধে পীড়া হইলে, পূজা দিয়া সে ক্রোধের নিবারণ করিতে হয়, আর ডায়িনী বা কুলোকের মন্ত্রগুণে হইলে তাহাকে বধ করিতে পারিলেই ভাল হয়, নিতান্ত পক্ষে তাহাকে গ্রাম হইতে তাড়াইয়া দিতেই হইবে। ডায়িনী আবার সকলে চিনে না। অনেক ফিকিরে মন্ত্রজ্ঞ লোকেরা ডায়িনী বাহির করিয়া দিয়া থাকে। সে কালে কেবল ডায়িনীকে

নয়, ডায়িনীর বাড়ীর সকলকে মারিয়া ফেলা হইত; কেননা ডায়িনীর পেটে ডায়িনী জন্মে।

মানুষ মরিলে ইহারা রীতিমত গোর দেয়। কোন হো-জাতীয় কোল মরিলে তাহাকে নূতন কবরে গোর দিতে হয়। সে একা এক কবরে থাকে। কবরের উপরে আট দশ হাত লম্বা এক খান পাথর পুঁতিয়া দেয়।

১৮৮১ শালে কোল ও ছোট-নাগপুরের অন্যান্য খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ৪৪,০০০ ছিল। মুণ্ডারি ভাষায় নূতন নিয়মের প্রায় সমস্তটা এবং পুরাতন নিয়মের নানা খণ্ড মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।

সাঁওতালদিগের ভাষার ন্যায় মুণ্ডারিয়া কোলারীয় ভাষা-পরিবার ভুক্ত। ইহাদের ভাষা লিখিত ভাষা নহে। এক্ষণে নাগরী অক্ষরে ইহাদের ভাষায় পুস্তক ছাপা হইতেছে।

বেদে।

ইউরোপে এক জাতীয় লোক আছে, তাহারা কোন স্থানে বাড়ী ঘর করিয়া স্থায়ী ভাবে থাকে না। কিন্তু দেশময় ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে ইংরাজিতে "জিপ্সি" বলে। জিপ্সি কথার অর্থ মিস্রীয়, অর্থাৎ মিসর দেশীয়। কেননা লোকে মনে করে, ইহারা প্রথমে মিসর দেশ হইতে ইউরোপে যায়। কিন্তু ইহাদের ভাষাতে অনেক হিন্দি শব্দ আছে, ইহাতে স্পষ্টই জানা যায়, ইহারা আদিতে ভারতবর্ষেই ছিল।

বঙ্গদেশে অনেক বেদে আছে। ইহারা দেশের নানা অঞ্চলের ভাষা যদিও কহিতে পারে, তথাপি ইহাদের নিজেদের ভাষা অনেকটা স্বতন্ত্র। ইহারা যখন আপনারা পরস্পর কথা কহে, তখন অন্যে বুঝিতে পারে না। ইহারা আপনাদিগকে "কাথাই" বা "ভাতু" বলে; কিন্তু কোথায় বাড়ী, কোথায় থাকে, কি জাতি,

এই সকল কূটপ্রশ্নের হাত এড়াইবার জন্য উক্ত নামের পরে আহীর, কাঞ্জর, কাশ্মিরী ইত্যাদি কথার যোগ করিয়া থাকে; অর্থাৎ "কাথাই আহীর," "ভাতু কাঞ্জর" ইত্যাদি বলে। ইহাদের সমাজে এক পুরুষপরম্পরাগত কথা প্রচলিত আছে, তাহা দ্বারা জানা যায়, রাজপুতানার সান্‌সিয়া নামক ভ্রমণকারী যে জাতি আছে, ইহারা সেই জাতীয়। (এই সান্‌সিয়া জাতির বিষয়ে পরে কিছু বলিবার আছে।) ধর্ম্মের বিষয়ে ইহারা হিন্দুঠগ, বঙ্গ দেশে ইহাদিগকে গামছামোড়া বলিত। ঠগদিগের মত ইহারা দস্যুর দেবতা কালীর পূজা দেয়। কোথাও ডাকাইতী করিতে যাইবার পূর্ব্বে কালীর কাছে পাঁঠা ও মহিষ বলি দেয়। ছেলে মরিলে ইহারা গোর দেয়, বয়স্ক মানুষ মরিলে দাহ করে, প্রধান ব্যক্তি মরিলে তাহার অস্থি হরিদ্বারে লইয়া গিয়া গঙ্গাজলে ফেলিয়া দেয়। ছেলে জন্মিলে হিন্দুদিগের ন্যায় ছয় দিনে ষষ্ঠী দেবীর পূজা দেয়। স্ত্রীলোকের নাসিকাবেধ ও পুরুষের কর্ণ-বেধ হয়। কর্ণবেধ কালে পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করে না বটে, কিন্তু গুরুকে খুব খাওয়ায়, এবং আপনারাও খায়। গুরুদিগকে "ধুল্লা" ও "মথন" বলে। কথিত আছে যে, কোন সময়ে (কোন্ সময়ে, তাহা জানা যায় না) যোধপুর ও বিকানির রাজ্যে ইহাদের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। অন্যান্য দেশের অশিক্ষিত লোকদিগের ন্যায় ইহারাও ধর্ম্মের সঙ্গে অতি কদর্য্য কুসংস্কার মিশাইয়া থাকে। ইহাদের বিবেচনায় শনিবার ও বৃহস্পতিবার বিষয় কর্ম্মের পক্ষে অতি অশুভ দিন।

কোথাও গমন কালে যদি বাম দিকে সাপ দেখিতে পায়, পশ্চাদ্দিকে কেহ যদি হাঁচে, অথবা সম্মুখে খঞ্জ মানুষ দেখিতে পায়, তাহা হইলে, যে কার্য্য করিতে মনস্থ করিয়াছিল, তাহাতে হাত দেয় না। ইহাদিগের বিবাহপদ্ধতি দেখিয়া সে কেলে প্রথায় বিলক্ষণ ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায়। বিবাহযোগ্যা

কন্যাকে পিতা বিবাহার্থীর নিকট পণ লইয়া বিক্রয় করে, সেই পণ কোন মতে দুই শত টাকার কম হয় না। বহুবিবাহ নাই, বিধবাবিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে। অনেক স্থলে জোর করিয়া বিধবার বিবাহ দেওয়া হয়। যুবতীরা অতি চমৎকার সুন্দরী, চক্ষু ঘন কৃষ্ণবর্ণ, ও "পটল চেরা।" লোকে বিশ্বাস করিবে না বটে, কিন্তু এই ভ্রমণকারী জাতীয় স্ত্রীলোকেরা বড় সতী। এক এক দলের এক এক জন দলপতি আছে; এক জন দলপতি মরিলে, দলের মধ্যে দশজনে যাহাকে মানে, সেই দলপতি হয়। ইহাদের ১৭টী জাতি আছে, অনেক জাতিতেই অসবর্ণ বিবাহ হয় না। দলপতি উচ্চ জাতীয় হউক, আর নীচ জাতীয় হউক, দলস্থ সকলে তাহাকে সকল বিষয়ে মানিয়া চলে। দলের মধ্যে কোন বিষয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে, কিম্বা প্রচলিত নিয়ম কেহ লঙ্ঘন করিলে, পঞ্চায়েত তাহার বিচার করে। অনেক সময়ে অর্থদণ্ড হয়, তাহাকে কোন কোন স্থলে "চৌথ্" বলে। ভিক্ষা-বৃত্তি ইহাদিগের লোক-দেখান মাত্র; কিন্তু সকল দেশেই ইহারা মনুষ্যসমাজের শত্রু। স্বভাবতঃ, এবং শিক্ষা দ্বারা সকলেই চোর। বাঁশের কাঠামে চামড়া জড়াইয়া ইহারা তাম্বু বানায়। গ্রামের অনতিদূরে মাঠে সেই তাম্বু খাটাইয়া থাকে, বয়স্ক লোকেরা গ্রামে গিয়া ভিক্ষা করে, জলপড়া তেলপড়া দেয়, ঔষধ পত্রও দিয়া থাকে, আবার পিত্তলের বা কাচের অলঙ্কার বিক্রয় করে। এই উপলক্ষ্যে ইহারা গ্রামে গ্রামে বাড়ী বাড়ী গিয়া, কোথায় কি আছে, বিশেষতঃ গোরু ছাগল কোথায় কি ভাবে থাকে, তাহার সন্ধান লইয়া আইসে। এই প্রকারে বিশেষ সন্ধান লওয়া হইলে পর, অকস্মাৎ এক রাত্রে গিয়া নিরীহ প্রজা-দের অনেকের সর্ব্বনাশ করে। পর দিন প্রাতঃকালে দেখে, গোয়ালে গোরু নাই; কেহ দেখে, ঘরের বেড়া কাটিয়া চোর ঢুকিয়া থালা ঘটি বাটী, গহনাপত্র যথাসর্ব্বস্ব লইয়া গিয়াছে।

অনন্তর কতক বেদে চোরাই মাল লইয়া রাতারাতি স্থানান্তর (কম হইলেও ২৫ ক্রোশ দূরে) চলিয়া যায়। সকলে এক সঙ্গে যায় না, ছড়াইয়া পড়ে, সুতরাং ধরা বড় কঠিন হয়। চোরাই মাল বিক্রয় করা কঠিন নহে। দোকানদার এবং ব্যাপারীদের সঙ্গে বন্দোবস্ত থাকে, তাহারাই অকাতরে থালা ঘটি ইত্যাদি, বা গহনাপত্র, কিম্বা গোমেষাদি গোপনে কিনিয়া লয়। এই প্রকার ব্যাপারে যাহা লাভ হয়, সকল বয়ঃপ্রাপ্ত লোকে তাহা ভাগ করিয়া লয়। বিলাতী বেদেদিগের মত এদেশী বেদেদেরও কতকগুলি সাংকেতিক কথা আছে। তাহা বলিলে পরস্পরের পরিচয় হয়, ও বিপদকালে তাহা বলিয়া এক জন অপরকে সাবধান করিয়া দেয়। ইহাদের ভাষায় "খিসি যাত" বলিলে "চলিয়া যাও," "সালাই সগুন" বলিলে "অশুভ লক্ষণ," "কুচ্ছি হুই" বলিলে "বহুত আচ্ছা;" এবং "খাবান চিয়ার্ক" বলিলে "ভয় নাই" বুঝায়। শীতের কয় মাস বেদেরা নানা স্থানে বেড়াইয়া বেড়ায়; কিন্তু বর্ষাকালে দিনাজপুর, পূর্ণিয়া, মালদহ, মুরশীদাবাদ, এবং মুঙ্গের জিলার কোন কোন গ্রামে গিয়া বাস করে। এ অঞ্চলে তাড়া খাইলে নেপাল রাজ্যের এলাকায় চলিয়া যায়। সেখানেও নিস্তার নাই, কারণ গুরখারা ইংরাজদিগের মত ঢিমে-তেতালা নহে, যেই ধরে, অমনি দোষীকে দণ্ড দেয়।

ভারতবর্ষীয় বেদেরা আপনাদিগকে বিকানিয়রের সান্‌সি জাতীয় বলে, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সান্‌সিরা কখনও এক স্থানে বেশি দিন থাকে না। নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহারা বলে, আমরা তিন শত বৎসর পূর্ব্বে "জাঠ" জাতি হইতে পৃথক হইয়া আসিয়াছি। সৎসীমল আমাদিগের আদিপুরুষ। তাঁহার আদেশ পালনার্থ আমরা ঘর বাঁধিয়া এক স্থানে স্থায়ী ভাবে বাস করি না; দেশে দেশে ভিক্ষা করিয়া বেড়াই।

বিকানিয়রের সান্‌সিরা হিন্দু মুসলমান উভয়ের উচ্ছিষ্ট খায়। এই কারণে জাত্যভিমানী রাজপুতেরা ইহাদিগকে বড় হেয় ও নীচ জ্ঞান করে। ইহারা কিন্তু হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয়, এবং রামদেব নামক দেবতাকে বড় মানে। বিকানির রাজ্যের সর্ব্বত্র বহুকালের মন্দির আছে, সকলেই স্বীকার করে যে, সে সকল সান্‌সিরা নির্ম্মাণ করিয়াছে। ইহার কোন কোন মন্দির এত পুরাতন যে, কবে নির্ম্মিত হইয়াছে, ঠিক করা যায় না। নিতান্ত হীন অবস্থাপন্ন হইলেও, সান্‌সির ছায়া স্পর্শ করিলে যদিও হিন্দুরা স্নান করিয়া থাকে, তথাপি, জাঠেরা উহাদিগকে স্বজাতীয় বলিয়া স্বীকার ও উহাদের উপকারার্থ আপনাদিগের সমাজে চাঁদাদ্বারা টাকা তুলিয়া থাকে। সান্‌সিরা গাধার পীঠে করিয়া আপনাদের তাম্বু বা চালার সরঞ্জাম এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যায়। শীতকালে রাজপুতানার নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়, ভয়ানক গ্রীষ্মকালে পাহাড়ের নিভৃত স্থানে গিয়া থাকে। সান্‌সিরা আজন্ম ভিক্ষুক ও ছিঁচকা চোর। ইহারাও বেদিয়াদিগের মত কন্যাপণ লইয়া থাকে। কন্যাপণ বড় বেশি নহে, ৬০ কি ৭০ টাকা। সান্‌সিরা বঙ্গদেশের বেদেদিগকে আপনাদিগের স্বজাতীয় বলিয়া স্বীকার করে না; কিন্তু উভয় জাতির ভাষাতে, আকৃতিতে ও চরিত্রে যে সাদৃশ্য দেখিতে পাই, তাহা কি এক জাতীয় না হইলে হয়? নানা দেশীয় বেদিয়াদের অনেক বিষয়ে অতি চমৎকার সৌসাদৃশ্য রহিয়াছে।

নিম্ন বঙ্গে, অথবা পূর্ব্ববঙ্গে স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ অধিক, সুতরাং বেদেরা তাম্বুতে না থাকিয়া নৌকায় থাকে। এক এক পরিবারের এক এক নৌকা। অনেক নৌকা এক এক বহরে থাকে। নৌকা করিয়া ইহারা দেশের নানা পল্লীগ্রামে ও হাটে বাজারে পানের মশলা, সূতা, তাগা, ছুরি, কাঁচি, কাচের চুড়ি ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। সুযোগ পাইলে চুরি চামারিও

করে, কিন্তু ডাকাতি করে না। নৌকাতেই ইহাদের ঘরকন্নার সমস্ত জিনিস থাকে। কুকুর, বিড়াল, হাঁস, মুরগী ইত্যাদিও রাখে। স্ত্রীপুরুষ উভয়ে নৌকা বাহিতে জানে।

হিন্দুস্থানী।

"হিন্দুস্থান" পারস্য ভাষার কথা। ইহার অর্থ "হিন্দুদিগের দেশ।" বিদেশীরা এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষের লোককেই হিন্দুস্থানী বলিয়া থাকে ; কিন্তু ইহা ঠিক নহে।

বিন্ধ্যগিরি ও হিমালয় পর্ব্বতমালার মধ্যবর্ত্তী যে ভূমিখণ্ডের পশ্চিমে পাঞ্জাব, ও পূর্ব্ব দিকে আসাম, তাহাকেই প্রকৃত পক্ষে হিন্দুস্থান বলা উচিত। যাহারা হিন্দী ও হিন্দুস্থানী ভাষা বলে, এ পুস্তকে তাহাদিগকেই হিন্দুস্থানী বলা হইল। বেহার, বঙ্গদেশের সর্ব্ব পশ্চিমাংশ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা ও মধ্য-ভারতবর্ষে ইহাদিগের নিবাস। গঙ্গার অধিকাংশ উপত্যকাভূমি এই দেশের মধ্যে।

বঙ্গদেশের ন্যায় এ দেশ ভিজা নহে। গ্রীষ্মকালে এ দেশ বঙ্গদেশ অপেক্ষা গরম, শীতকালে বঙ্গদেশ অপেক্ষা শীতল। বৃষ্টিপাত এত কম যে, ধান ভাল জন্মে না ; কিন্তু গম, যব, বুট, সর্ষপ ইত্যাদি রবিশস্য যথেষ্ট জন্মে।

নিবাসী।—জলবায়ুর এবং পুষ্টিকর খাদ্যের গুণে হিন্দুস্থানীরা বাঙ্গালি অপেক্ষা দীর্ঘাকার, এবং বলবান্। আবার, বোধ হয়, ইহাদের শীরা দিয়া যে আর্য্যশোণিত প্রবাহিত হয়, তাহা বাঙ্গালির শিরাস্থ আর্য্যশোণিত অপেক্ষা বেশি খাঁটি। পৃথিবীতে সকল দেশীয় ও সকল জাতীয় সভ্য অসভ্য সকল প্রকার লোকের মস্তকাভরণ আছে, কেবল বাঙ্গালির মাথায় কিছু নাই। কিন্তু হিন্দুস্থানীরা মাথায় পাগড়ি বা টুপি পরে। আবার কলিকাতার

হিন্দুস্থানী সহিস।

বাঙ্গালি বাবুদের ন্যায় তাহারা লজ্জার মাথা খাইয়া পাতলা কাপড় পরে না, বা খালি গায়ে, পাকান চাদর গলায় ঝুলাইয়া, গঙ্গার তীরে হাওয়া খাইয়া বেড়ায় না। তাহাদের ধুতি বা পাজামা ও গায়ের আঙ্গারখা মোটা কাপড়ের। শীতকালে শাল বা বালাপোষ গায়ে দেয়। শীত কালে লেপ গায়ে জড়াইয়া শোয়।

ভাষা।—১২৫০০০ বর্গ ক্রোশ পরিমিত প্রদেশের লোকে হিন্দি ভাষা বলে। এই ভাষাবাদী লোকের সংখ্যা অন্যূন সাত

কোটি। তবে সকল প্রদেশ ও সকল জিলার ভাষা একরূপ নহে; অনেক প্রভেদ আছে। প্রধান প্রধান প্রকার এই, বেহারী, পশ্চিমে হিন্দি, ও পূর্ব্বাঞ্চলের হিন্দি। বারাণসী প্রদেশের লোকেরা যে হিন্দি বলে, তাহাতে সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য। আবার আগ্রার লোকদিগের হিন্দিতে বিস্তর আরবি ও পারসি ভাষার শব্দ আছে; কিন্তু দুই প্রদেশের সীমানা স্থলের হিন্দি মিশ্রভাষা বিশেষ। বিম্ সাহেব বলেন, "মহানদী নদীর তীরবর্ত্তী লোকে বাঙ্গালা ও হিন্দুস্থানী, উভয় ভাষাই বলে, কিন্তু উভয়ই নিতান্ত বিকৃত।"

হিন্দি।

হিন্দি ভাষার পুস্তক প্রায়ই নাগরি অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে। কায়েথি নামে আর এক প্রকার অক্ষর আছে, টানা লেখা বলিয়া বিষয় কর্ম্মের লেখাপড়ায় তাহার অধিক ব্যবহার হয়। ইহা অপেক্ষাও আর এক প্রকার টানা অক্ষর আছে, তাহাকে সারাফি বা মহাজনী কহে।

হিন্দুস্থানী বা উর্দ্দু মিশ্র ভাষা। বহুকাল ধরিয়া ভারতবর্ষের মুসলমান শাসনকর্ত্তারা, পারস্য আর দেশীয় লোকেরা হিন্দি ভাষায় কথা কহিত; হিন্দু মুসলমান সিপাহি ও ব্যবসাদারেরা পরস্পর এক মিশ্র ভাষা কহিত। তাহাতে হিন্দি, আরবী ও পারসি শব্দ আছে, এই ভাষাকে উর্দ্দু বলা হয়। এত কাল পারসি অক্ষরে এই ভাষা লেখা হইয়া আসিয়াছে, এক্ষণে মিশনরিরা রোমান অর্থাৎ ইংরাজি অক্ষরে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

উর্দ্দু ভাষা ও অক্ষর।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের হিন্দুস্থানী উত্তর ভারতের হিন্দুস্থানী-হইতে অনেক বিষয়ে ভিন্ন। তাহাকে দেখানি বা দক্ষিণে বলে।

ন্যূনাধিক আড়াই কোটি লোকে উর্দ্দু ভাষা কহে।

উত্তরাঞ্চলীয় ভাষা-পরিবারের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার পরস্পর সাদৃশ্য দেখ।—

বাঙ্গালা	হিন্দি	উর্দ্দু	মহারাষ্ট্রি	গুজরাটী
মানুষ	মানস্*	মরদ্	মান্সণ†	মানুষ*
চক্ষু	আঁখ	আঁখ্	দোলেঃ	আঁখ্
কান	কান	কান	কন্	কান
নাক	নাক	নাক	নখ্	নাঃ
মুখ	মুখ	মুঃ	মুখ	মহুদম্
দাঁত	দাঁত	দাঁত	দন্ত্	দান্ত্
হাত	হাথ্	হাঁথ	হাত	হাথ্

বিষয় কর্ম্ম।—ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের লোকের ন্যায় এ প্রদেশীয় লোকেরও কৃষিকর্ম্মই প্রধান জীবিকা। পূর্ব্ব কালে অনাবৃষ্টি, অল্পবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি নিবন্ধন শস্য না হইলে আকাল হইত, এবং অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক মরিয়া যাইত। এক্ষণে আর তাহা হইতে পারে না। বৃষ্টির অভাব হইলে কাটা খাল হইতে জল লইয়া চাষারা কৃষিকার্য্য করে; অতিবৃষ্টি হইলে অতিরিক্ত জল খাল দিয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে; এ সত্ত্বেও যদি আকাল হয়, রেলপথে অন্যান্য প্রদেশ হইতে খাদ্য সামগ্রী চালান দেওয়া যায়। এ প্রদেশের গোমেষ এবং মানুষ বঙ্গদেশের গোমেষাদি ও মানুষ অপেক্ষা আকারে বড় বড়। বিশেষতঃ যমুনার তীরবর্ত্তি অঞ্চলের গোরু ও ছাগল অতি চমৎকার। বঙ্গদেশে পদ্মার তীরবর্ত্তী অঞ্চলের গোরু বড়

---

* এস্থলে স সংস্কৃত অনুসারে ইংরাজি s এর ন্যায় উচ্চারিত হইবে।

† বাঙ্গলা অনুসারে স অর্থাৎ sh উচ্চারিত হইবে।
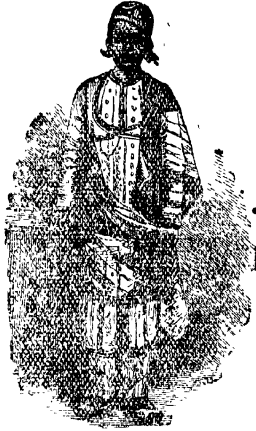
বাবাণসির ভদ্রলোক।

বটে, কিন্তু এত বড় নহে। হিন্দুস্থানের মহিষ বড় ছোট, বঙ্গদেশের মহিষের ন্যায় বড় নহে। শীতকালে এত শীত
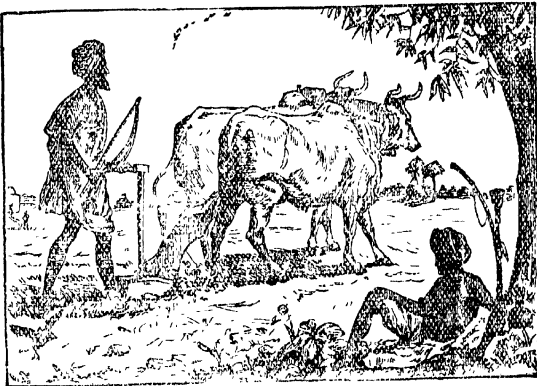
পড়ে যে গোরুর গায়ে কম্বল দিতে হয়। বেহার বিভাগের সর্ষপ, বুট, মটর ইত্যাদি বঙ্গদেশের সর্ষপ, বুট, মটর অপেক্ষা বড় বড়।

বঙ্গদেশের নৌকা, পাল্কি ও ডুলির স্থলে হিন্দুস্থানে একা ও গোরুর গাড়ি প্রচলিত। "কোমর কর দড়, তবে একায় চড়," এই প্রবাদ বঙ্গদেশে প্রচলিত, ফলে কাঁচা রাস্তায় একা চড়িয়া বেশী দূর গেলে ঝাঁকি লাগিয়া সমস্ত শরীরে বেদনা হয়; ইহা অপেক্ষা বড় বড় গোরুর গাড়ি ভাল। ভদ্রমহিলারা যে গাড়িতে যান, সে গাড়ি উত্তমরূপে কাপড়ে ঢাকা; দেখিতেও সুন্দর। সে কাপড় পাতলা ও রক্তবর্ণ, রাস্তার লোকে গাড়ির ভিতরকার স্ত্রীলোকদিগকে দেখিতে পায় না, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা সকলই দেখেন। এক প্রকার বড় পাল্কিরও ব্যবহার আছে।

একা।
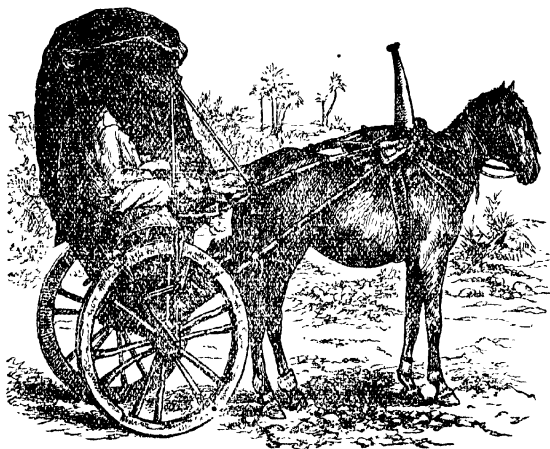
এ প্রদেশে বঙ্গদেশের ন্যায় নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে। কনৌজ ব্রাহ্মণ বৈদিক ব্রাহ্মণের হাতে খায় না। হণ্টার সাহেব স্বচক্ষে দেখিয়া বলিয়াছেন, কোন জেলখানাতে এক জন নূতন কয়েদী আসিল, সে ব্রাহ্মণ, যে হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ জেলের কয়েদী-দিগের জন্য ভাত রান্ধিয়াছিল, তাহার জন্মস্থান নিজের জন্মস্থানের তুল্য পবিত্র কি না, এই সন্দেহ হওয়াতে নূতন কয়েদী ভাত খাইল না, অনাহারে রহিল, ও বেত্রাঘাত সহিল।

ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই বাই খ্যামটা নাচ হইয়া থাকে। দিল্লী, আগ্রা ও লক্ষ্ণৌ অঞ্চলেই এই কুপ্রথার অধিক প্রাদুর্ভাব। কলিকাতা, বোম্বাই ইত্যাদি আধুনিক সহরেও বাই খ্যামটার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব। এই কুপ্রথা উঠাইয়া দিতে প্রাণপণ চেষ্টা করা সমাজ-হিতৈষী লোক মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ইহারা বেশ্যা, তবে শিক্ষা দেওয়াতে নৃত্যগীতে পারদর্শিতা লাভ করিয়া থাকে, নহিলে

ইহারাও বেশ্যামাত্র। ইহারা পাপকর্ম্ম দ্বারা উপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, এবং অশ্লীল গীত ও ভাবভঙ্গি দ্বারা লোকের মন কলুষিত করিয়া ফেলে। অথচ পূজা পার্ব্বণে ও বিবাহে এই পাপিয়সীদিগের নৃত্যগীত না হইলেই নয়। এক্ষণে সুশিক্ষিত লোকেরা এ বিষয়ে বড় একটা উৎসাহ দেন না, ইহা সৌভাগ্যের বিষয় বলিতে হইবে।

এই নর্ত্তকীদের অনেক গান কুরুচি সঙ্গত। বেশ্যারা যে অকাতরে অশ্লীল গান করে, ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, কিন্তু শ্রোতারা যে পিতা পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, জামাই শ্বশুরে বসিয়া শুনে, শুনিয়া আমোদ অনুভব করে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। মান্দ্রাজের একটী গানের অর্থে এই, "প্রিয়ে, কাহার্ বেশি আদর করিব, তোমার, না তোমার সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের? –না, না; তুমি অধিক আদরণীয়া! সর্ব্বশক্তিমান তোমাকে এমন রূপবতী করিয়া এখন দুঃখ করিতেছেন। হে ঈর্ষ্যাকাতর ঈশ্বর।"

কি লজ্জার কথা! এ প্রকার গান যাহারা শুনে, তাহাদেরও পাপ হয়।

বাইখ্যামটা নাচে অনেক ধনবান্ লোকে বিস্তর টাকা খরচ করে।

যাঁহারা সমাজ-সংশোধনের চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহারা এই কুপ্রথার উন্মূলনার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করেন, এই আমাদিগের অনুরোধ। যে স্থলে নাচ হয়, সে স্থলে না গিয়া আপনাদের ঘৃণা প্রকাশ করা তাঁহাদের উচিত।

ধর্ম্ম।— হিন্দুস্থানেই হিন্দুধর্ম্ম বিশেষ প্রবল। আবার বৌদ্ধ-ধর্ম্মেরও জন্ম হিন্দুস্থানে। ভারতবর্ষে বারাণসীর ন্যায় পুণ্য তীর্থস্থান আর নাই। শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান বলিয়া মথুরাকে লোকে মানে। এই খানে যশোদাদুলাল বাল্যকালে নবনীত চুরি
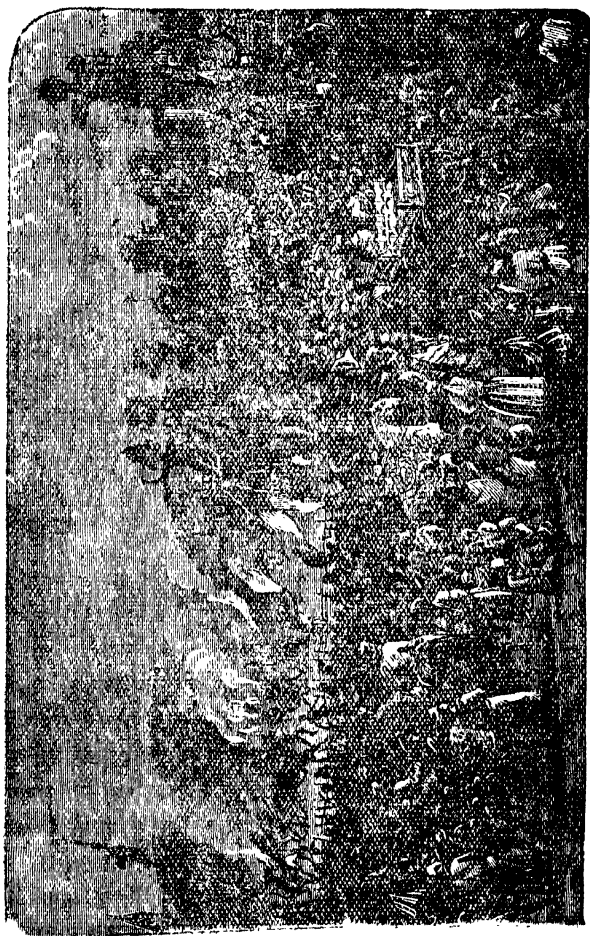
করিয়া খাইতেন, এবং বড় হইলে যমুনাজলনিমগ্না সুন্দরীগণের বস্ত্রহরণ ও ১৬,০০০ গোপাঙ্গনার মনোরঞ্জন করিতেন। প্রেমসাগর নামক হিন্দি পুস্তকে শ্রীকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। কোন জ্ঞানবান ব্যক্তি বলিয়াছেন, "কৃষ্ণচরিত্র পাঠে হিন্দু যুবকগণের চিন্তাশক্তি, জ্ঞান ও চরিত্র যেমন নষ্ট হয়, এমন আর কিছুতে হয় না।" এ কথা যথার্থ। প্রেম-সাগরে বর্ণিত কাহিনী লোকে অকাতরে বিশ্বাস করে। চুরি, ব্যভিচার ও নরহত্যা, এ সকলই দেবতাদের লীলা-খেলা, ইহাই বলিয়া লোকে মনকে প্রবোধ দেয়। দেবতারা অতুল ক্ষমতাশালী, যখন যাহা ইচ্ছা, করেন। সে কালে প্রজার স্ত্রীপুত্রের ও তাহাদের প্রাণের উপরে যেমন রাজার অধিকার ছিল, তেমনি দেবতাদেরও যাহা ইচ্ছা, তাহাই করিবার ক্ষমতা আছে, লোকে ইহাই বুঝে। ফলে মানুষে দোষ করিলে যত না দূষ্য হয়, ঈশ্বর দোষ করিলে তাহা অপেক্ষা দূষ্য হইয়া থাকে। আসল কথা এই, কৃষ্ণ বলিয়া কেহ কখনও ছিল না। প্রেম-সাগরের গল্প মানুষের কল্পনার ফল মাত্র।

হিন্দুস্থানে রাম ও তৎসঙ্গে তদীয় প্রিয় ভক্ত হনুমানজির পূজা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ইহাঁদের পূজা হয় না। "রাম রাম!" এই বলিয়া লোকে পরস্পর অভিবাদন করে। পাল্‌কি তুলিবার ও নামাইবার সময় বাহকেরা রাম রাম বলে। তুলনা করিলে কৃষ্ণচরিত্র অপেক্ষা রামচরিত্র অসংখ্যগুণে উৎকৃষ্ট। কিন্তু রামচরিত্রেও মানুষের মনগড়া কথা এত যে প্রকৃত চরিত্র বাছিয়া বাহির করা দুষ্কর। লোকে রামকে নারায়ণের অবতার বলিয়া মানে। ভাল, রামের অসাক্ষাতে দশানন সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়। তৎকালে সীতা রাম লক্ষ্মণ দুই ভাইকে ডাকিয়া কত চীৎকার করিয়া কাঁদিয়াছিলেন। কিন্তু রাম তাহা শুনিতে পান নাই। তবে যাঁহারা এখন তাঁহাকে নারায়ণের

অবতার বলিয়া আরাধনা করেন, তাঁহাদের স্তব তিনি কি করিয়া শুনিবেন ? লিখিত আছে, ভক্তি পূর্ব্বক রামায়ণ পাঠ করিলে মানুষ সদ্য পাপবিমুক্ত এবং বংশানুক্রমে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্ত হয়।" যাহার কণামাত্র বুদ্ধি আছে, এ কথায় কি তাহার বিশ্বাস হইতে পারে ?

বঙ্গদেশের দুর্গোৎসবের ন্যায় হিন্দুস্থানে রামলীলার বড় ধূম। কাঠ দিয়া মাচার মত করিয়া একটা দুর্গ তৈয়ার করা হয়, তাহার মধ্যে রাবণের ও তদীয় সহচরগণের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মূর্ত্তি স্থাপিত থাকে। ডান দিকে এই সকল থাকে, সম্মুখে রাজমুকুট পরিয়া রামচন্দ্র ধনুকে বাণের যোজনা করিয়া রাক্ষসদিগকে বধ করিতে উদ্যত। ঘেরা জায়গার ভিতরে লোকে বানর সাজিয়া মশাল হাতে করিয়া দোলাইতে থাকে। কাল্পনিক যুদ্ধের পর আগুন ধরাইয়া দিয়া রাম ও তদীয় সহচরগণের মূর্ত্তি পোড়াইয়া ফেলা হয়। মূর্খ লোকে মনে করে, এখনও লঙ্কায় রাক্ষসেরা বাস করে। লঙ্কার মানুষ আমাদেরই মত।

সাহিত্য।—খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দী হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অন্যূন ৯৫০ জন হিন্দু গ্রন্থকারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। রাজপুতানার রাজাদিগের চরিত্র কবিরা লিখিয়া গিয়াছেন, বোধ হয়, তাহাই হিন্দুস্থানের অতি পুরাতন সাহিত্য. চাঁদ কবিই প্রথম কবি বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন। ইনি দিল্লীর চৌহান পৃথ্বীরাজের চরিত্র কার্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ১৪০০ শালে রামানন্দ প্রাদুর্ভূত হইয়া রামগুণ কীর্ত্তন করতঃ রামের প্রতি লোকের ভক্তি জন্মাইয়া দেন; তদীয় শিষ্য কবির গুরু অপেক্ষাও বড় কবি ছিলেন। হিন্দু-স্থানের প্রায় সকল গ্রন্থকারই ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে প্রাদু-র্ভূত হয়েন। ইংলণ্ডে সেক্ষপিয়রও এই সময়ে মধুর গাঁথায় ইংরাজ জাতির প্রাণ তৃপ্ত করেন। ১৬২৪ শালে হিন্দুস্থানি জয়দেব

তুলসি দাসের মৃত্যু হয়। ইহার রামায়ণ অতি মধুর, হিন্দিতে এমন মধুর রামচরিত আর নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বেহারীলাল চৌবে "সাত শই" অর্থাৎ ৭০০ শত পদের রচনা করেন। রাজা জয়সিংহ ইহার পাঠ শুনিয়া এমন মোহিত হয়েন যে, ৭০০ শত পদের জন্য কবিকে ৭০০ মোহর পুরস্কার দান করেন। ইনিও সুকবি ছিলেন।

উর্দ্দু ভাষার আলোচনা মুসলমানেরাই করিয়া থাকেন, হিন্দি অপেক্ষা এই ভাষায় অনেক অধিক পুস্তক রচিত হইয়াছে।

১৮৮৮ শালে হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় নিম্ন লিখিত পুস্তক সকল বাহির হয়।—

	হিন্দি	উর্দ্দু
উঃ-পঃ-অঞ্চল ও অযোধ্যা	২৯৫	৫৫৮
পাঞ্জাব	১৬৯	৯৬১
বঙ্গদেশ	১৩১	৩২
বোম্বাই	৬২	৩১
মান্দ্রাজ	০	২৯

কাশী, আলাহাবাদ ও লক্ষৌ প্রভৃতি নগরে হিন্দি ও উর্দ্দু ভাষায় সংবাদ পত্র ও মাসিক পত্রিকা প্রকাশ হইতেছে।

রাজপুত।

যদিও রাজপুতদিগের ভাষা হিন্দি, তথাপি ইহাদিগের বিষয় স্বতন্ত্র আলোচনা করা বিহিত। কারণ ইহারা অতি প্রসিদ্ধ লোক। ইহাদের দেশকে রাজপুতানা বলে। এই দেশের ক্ষেত্র-পরিমাণ ৬৫,০০০ হাজার বর্গ ক্রোশ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সি অপেক্ষা অধিক। নিবাসী সংখ্যা ন্যূনাধিক এক কোটি। রাজ-পুতানার মধ্যস্থলে একটী ক্ষুদ্র প্রদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের দ্বারা
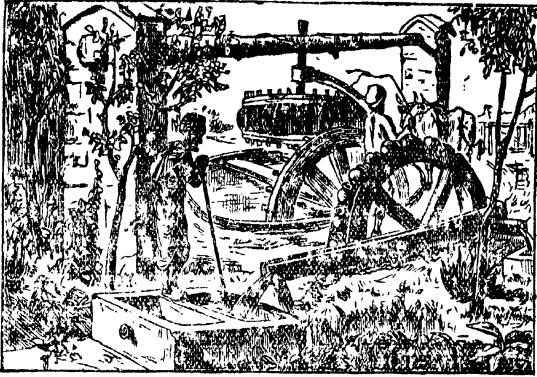
জলের চাকা।

শাসিত হয়, বাকি ১৮টী প্রদেশ ১৮ জন রাজার অধীন। এ সকলই পূর্ব্বকালে উদয়পুরের রাজার, মধ্যকালে দিল্লীর বাদশাদিগের অধীন করদ রাজ্য ছিল, এক্ষণে ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের করদ রাজ্য।

আর্ব্বলি পর্ব্বত দ্বারা রাজপুতানা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পশ্চিম দিকের অনেকটা বালুকাময় মরুভূমি। বাতাসে বালুকা উড়াইয়া এক স্থানে জমা করাতে উচ্চ পর্ব্বতাকার হইয়া রহিয়াছে। সে গুলিকে বালির পাহাড় বলে।

মধ্যে মধ্যে ইন্দারা আছে, তাহার কোন কোনটী দেড় শত কিম্বা দুই শত হাত গভীর। গরু দিয়া চাকা ঘুরাইয়া লোকে অনবরত ইন্দারা হইতে জল তুলে। এ জল কিন্তু বড় চমৎকার। রাজপুতানার কোন কোন অংশ কতকটা উর্ব্বরা।

পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, রাজপুতেরা মধ্য-এশিয়ার শিথীয় জাতীয় লোক। রাজপুতানার আদিম নিবাসিরা আপনাদিগকে
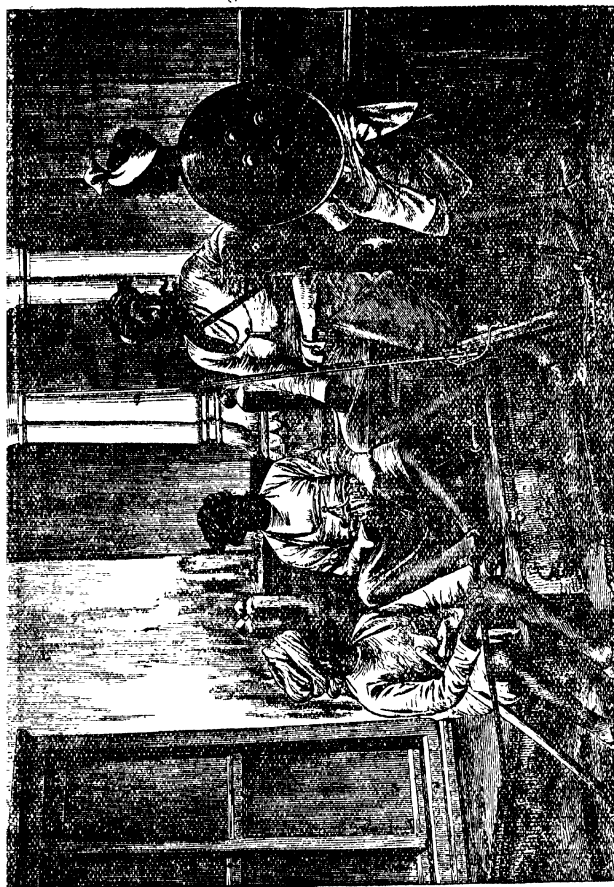
রাজপুত।

"পৃথিবীর সন্তান," অথবা "বনের সন্তান" বলে. কিন্তু রাজপুতেরা আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয়. অর্থাৎ সূর্য্যের সন্তান বলিয়া থাকে। পাঞ্জাবের জাঠ আর রাজপুতানার রাজপুতেরা, বোধ হয়, একই মূল জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কারণ উভয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য বিস্তর।

কোন্ সময়ে রাজপুতেরা রাজপুতানায় গিয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না। যে সময়ে মুসলমানেরা ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তৎকালে পাঞ্জাব হইতে অযোধ্যা পর্য্যন্ত অঞ্চলটী ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এবং রাজপুত রাজারাই ঐ সকল ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসন করিতেন। এই রাজারা যদি সকলে মিলিয়া দেশরক্ষার চেষ্টা করিতেন, মুসলমানেরা ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেই পাইত না। দুঃখের বিষয় এই, ইঁহারা পরস্পর ঘরাও বিবাদে. ব্যস্ত ছিলেন, তাই মুসলমানদিগের দ্বারা একে একে সকলেই পরাজিত হয়েন। রাজপুত রাজারা পরস্পর ঘরাও যুদ্ধে নিয়ত ব্যস্ত থাকাতে, এবং অবশেষে বিদেশী শত্রুকর্ত্তৃক পরাজিত হওয়াতে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গিয়া নূতন দেশ দখল করেন। কোন কোন রাজা মুসলমান বাদশাদিগের অধীনে বড় বড় রাজ-কর্ম্মে নিযুক্ত হয়েন, আবার কোন কোন রাজপুত রাজা মুসলমান বাদশার সহিত রাজকুমারীগণের বিবাহ দেন। সর্ব্বপ্রথমে আক-বর যদুবাইকে বিবাহ করেন। উদয়পুরের রাজবংশই রাজ-পুতানার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ইঁহারা রামের সন্তান, সুতরাং সূর্য্য-বংশীয় প্রধান শাখা। উদয়পুরের কোন রাজা মুসলমান বাদ-শাকে কন্যাদান করেন নাই, এই বলিয়া ইঁহারা তখনও গৌরব করিতেন, এখনও করেন,; যে রাজারা মুসলমানকে কন্যাদান করিতেন, উদয়পুরের প্রতাপ সিংহ তাঁহাদের সহিত আহার ব্যব-হার করিতেন না। আকবরের রাজত্ব কাল পর্য্যন্ত রাজপুত রাজারা ন্যূনাধিক পরিমাণে স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন;

কিন্তু কিছু কাল পরে, স্বাধীন অবস্থা গেলে, তাঁহারা দিল্লীশ্বরের করদ রাজা হইয়া পড়েন। তার পরে মহারাষ্ট্রীয়দের উৎপাত। উঁহারা রাজপুতদিগকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে হস্তগত করতঃ রাজপুতদিগের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক কর আদায় করিত, নগর আক্রমণ করিত, ও টাকা পাইলে ছাড়িয়া দিত, এবং অনেক প্রদেশ কাড়িয়া লইয়াছিল। এই ভাবে কিছু কাল ভয়ানক যুদ্ধ চলিলে পর ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট রাজপুত রাজাদিগকে রক্ষা করিবার ভার লয়েন, অল্প দিন মধ্যেই ইংরাজসাহায্যে তাঁহারা আপন ২ রাজ্য পুনরায় প্রাপ্ত হয়েন। এখন আর বিদেশী শত্রু তাঁহাদিগের কোন অনিষ্ট করিতে পারে না।

রাজপুত জাতি নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত। এক এক গোষ্ঠীর এক এক জন কর্ত্তা আছেন। এই কর্ত্তারাও ছোট ছোট রাজা, ইহাঁরা এক জন প্রধান রাজার অধীন ও আত্মীয়। প্রধান রাজা এই ছোট ছোট রাজার কর্ত্তা। ছোট রাজারা বড় রাজাকে কর দেন, এবং মানিয়া চলেন। তাঁহাদের রাজ্যে ইহাঁর কোন অধিকার নাই। বড় রাজার নিজ শাসনাধীনেও কতকটা প্রদেশ আছে। স্থল বিশেষে কোন কোন ছোট রাজার স্বত্ব বড় রাজার স্বত্বের ন্যায় বহুকালীয়। ছোট রাজারা এক প্রকার বড় বড় জমিদার। ইহাঁরা প্রজাদিগের নিকট হইতে কর আদায় করেন।

রাজপুতানাতে রাজপুতেরাই প্রধান, কিন্তু ইহাদের সংখ্যা তেমন বেশি নহে, কেবল ৫০০০০০ লক্ষ মাত্র। ব্রাহ্মণ জাতির সংখ্যা ইহাদের দ্বিগুণ।

রাজস্থানের ইতিহাস-লেখক কর্ণেল টড বলেন, "নিতান্ত দরিদ্র রাজপুতের চরিত্রেও পূর্ব্বপুরুষদিগের অহঙ্কার চূড়ান্ত রহিয়াছে; হয় ত সেই অহঙ্কারই তাহার একমাত্র পৈতৃক সম্পত্তি। লাঙ্গলে হাত দেওয়া, ঘোড়ায় না চড়িয়া তলোয়ারের ব্যবহার করা, তাহার পক্ষে অতি ঘৃণার বিষয়। এই প্রকার

গোঁড়ামী দেখিয়া তাহা অপেক্ষা উচ্চ পদস্থ লোকে তাহাকে আদর করে, এবং নীচস্থ লোকে মান্য করে। উদয়পুরের রাণার অমাত্যগণের সম্মান ও অধিকার, এবং নানা শ্রেণীর পদমর্য্যাদা দেখিলে জানা যায়, তাহাদের সমাজের অবস্থা যার পর নাই কৃত্রিম ও মার্জ্জিত ছিল।

কোথাও যাইতে হইলে উচ্চ শ্রেণাস্থ লোকের অগ্রে অগ্রে লোকে নিশান ধরিয়া, আশা শোটা লইয়া কাড়া বাজাইতে বাজাইতে যায়। পূর্ব্বপুরুষেরা যে সকল বীরত্বের কাজ করিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্য অনেকেই নানা প্রকার সম্মানচিহ্ন ধারণ করেন।"

শেরিং বলেন, "এক্ষণে মধ্য প্রদেশে নানা জাতীয় যে সকল আদিমনিবাসী আছে, তাহারা রাজপুতদিগের আচার ব্যবহারের বড় অনুকরণ করিয়া থাকে। তাহাদের অনেকে 'সিংহ' উপাধি ধারণ করিয়াছে, কালক্রমে ইহারাও রাজপুত বলিয়া গণ্য হইয়া যাইবে। এইরূপে অনেক আদিমনিবাসী রাজপুত হইয়া গিয়াছে।"

ম্যাকে নামক এক জন সাহেব, কয়েক বৎসর হইল, রাজপুত রাজাদিগের বড় শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা করিয়াছেন।—

"চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয়েরা, জাতীয় পুরুষপরম্পরাগত কথা ভুলিয়া গিয়া, জঘন্য, অজ্ঞানতা ও পাশবতারূপ অতল জলে যেন ডুবিয়া রহিয়াছেন; আহা, ইহাঁদের পূর্ব্বপুরুষগণের বিচারসঙ্গত ও কার্য্যগত দেশহিতৈষিতা, সুরুচিসঙ্গত শিক্ষা ও উদার গুণাবলি কোথায়?.........এক্ষণকার ছোট ছোট রাজপুত রাজারা ক্বচিৎ নিজ ভাষায় লেখা পড়া করিতে পারে; স্বজাতি, স্বরাজ্য, স্বপদ সম্বন্ধে কিছুই জানে না; কতকগুলি পশুচরিত ভৃত্যের সঙ্গে অতি জঘন্য ভাবে দিন কাটায়। সদাই মদ ও অহিফেণে মত্ত, সদাই নিস্তেজ, বিমর্ষ এবং অসুখী, বিষয় কর্ম্মের কিছুই ধার ধারে না; কিছুই জানে না; দামোদর মন্ত্রী ও সর্ব্বগ্রাসী নায়েবের হাতে সমস্ত ভার ন্যস্ত। ঋণ এত যে, তাহার পরিশোধের আর

সম্ভাবনা নাই। মান মর্য্যাদার জন্যই ইহারা লালায়িত, আর কিছু চাহে না। এক রাজার প্রতিবেশী সম্মান পাইলে, হিংসায় আর সকলের বুক ফাটিয়া যায়। রাজারা এবং রাজপুতেরা যে যে সম্মানের অধিকারী, সে সমস্ত এক জনে একচেটে করিয়া লইতে চায়; কেবল তাহারই সম্মানার্থই তোপধ্বনি হউক, গালিচায় পা দিতে না দিতে গিয়া তাহাকেই কেবল অভ্যর্থনাসঙ্গ গ্রহণ করা হউক; কেবল তাহারই সঙ্গে অশ্বারোহী পতাকা-ধারী সৈন্য থাকুক; কেবল তাহারই কন্যাদের অল্পবয়সে আপনা অপেক্ষা উচ্চ বংশে বিবাহ হউক; কেবল তাহারই ঠাকুরেরা (অধীন জমিদারেরা) দশহরা পর্ব্ব কালে আসিয়া যথারীতি বশ্যতা স্বীকার করুক; ইহারই জন্য লালায়িত, আর কিছু চায় না।"

এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া, কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা ১৮৭৫ শালে আজমিরে মেয়ো কলেজ নামে এক কলেজ স্থাপিত করিয়াছেন। সমগ্র রাজপুতানার রাজা, জমিদার ও বড় লোকদিগের ছেলেরা এই কলেজে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়। ইউরোপীয়দিগের সংসর্গে থাকিয়া ইহারা এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে নীতিশিক্ষা পাইতেছে, এক এক বড় রাজার রাজ্যের ছাত্রদিগের জন্য এক এক প্রকোষ্ঠ নির্দ্ধারিত আছে।

অহঙ্কার ভারতবাসির সর্ব্বনাশের মূল। কিন্তু রাজপুতানায় অহঙ্কারের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, ভারতের আর কোন স্থানে তেমন নহে। ঘটক ও কবিদের কথায় লোকের মন বড় ভুলিয়া যায়। অতি অহঙ্কারী রাজপুতও পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তি শুনিয়া বিপদে সান্ত্বনা এবং সম্পদে আনন্দ লাভ করিয়া থাকে। এই ঘটক বা কবিরা ভিক্ষাজীবী; তবে সামান্য ভিখারী নহে। বংশমর্য্যাদা হারাইবার ভয়ে ইহাদিগকে অর্থ দিয়া সন্তুষ্ট রাখিতে হয়, অসন্তুষ্ট হইলে সূর্য্যবংশীয়কে সূত্রধরের, এবং চন্দ্রবংশীয়কে রাক্ষসের

বংশ বলিয়া ইহারা বর্ণন করিতে পারে। কেবল তাহাই করে না, বিবাহ ইত্যাদি উৎসবসভায়, কোন রাজাকে অপদস্থ করিতে চাহিলে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের কাহারও এমন কুৎসা গাহিতে আরম্ভ করে যে, কানে হাত দিতে হয়। বিবাহ কালে ইহাদিগকে সময়ে সময়ে বিস্তর টাকা দিতে হয়। কয়েক বৎসর হইল, এক বিবাহ বাড়ীতে কেবল ঘটকদিগের পেট ভরাইতে বরকর্ত্তার দেড় লক্ষ টাকা খরচ হয়। অনেক বার অনেকে কন্যার বিবাহ দিয়া কড়ার ভিখারী হইয়া পড়িয়াছেন। বিবাহ কালে, অন্যের উপর টেক্কা দিবার অভিপ্রায়ে অজস্র টাকা খরচ করিয়া, অনেকে এমন ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়ে যে, পুত্র পৌত্রাদিরা পর্য্যন্ত সেই ঋণভার বহিয়া মরে। এই কারণেই পূর্ব্বে জন্মমাত্রে কন্যা সন্তান মারিয়া ফেলা হইত। কেন? যেন কন্যাবিবাহে বহুব্যয় করিয়া, এক জন অন্যের উপর টেক্কা দিতে না পারে। এ জগতে আর কোথাও কি অহঙ্কারের এতাদৃশ প্রাদুর্ভাব কেহ দেখিয়াছে?

দুই শত বৎসর হইল, জয়পুরের মহারাজা জয়সিংহ রাজপুত-বিবাহ সংক্রান্ত ব্যয় কমাইবার কথা উত্থাপিত করেন। তাহাতে কোন ফল হয় নাই। সেই সময়ে সালুম্ব্রার সামান্য চন্দাবত নিজ কন্যার বিবাহে এত টাকা খরচ করেন যে, তিনি যে রাজার অধীন, সে রাজাও তত টাকার জোগাড় করিতে পারিতেন না। এই বিষয়ে কর্ণেল টড্ বলিয়াছেন, "কবি ও ঘটকদিগের প্রশংসা লাভার্থে চন্দাবত এমন বিজ্ঞ রাজার এমন মহৎ চেষ্টা একেবারে নিষ্ফল করিলেন।"

মহারাজা জয়সিংহের পরেও রাজপুতানার ভিন্ন ভিন্ন রাজা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিবাহসম্বন্ধীয় ব্যয় কমাইবার চেষ্টা পাইয়াছেন, কিন্তু কোন বিশেষ ফল দর্শে নাই। ফল না দর্শিবারই ত কথা। এক জনের চেষ্টায় এ প্রকার পুরাতন কুপ্রথার মূল

উৎপাটিত হইতে পারে না; অনেকে মিলিয়া চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই সুফল ফলিবে। ১৮৮৭ শালে কর্ণেল ওয়াল্টর রাজপুতানার ব্রিটিশ এজেণ্ট ছিলেন। তিনি আজমীর নগরে এক বিরাট সভার অধিবেশন প্রস্তাব করিয়া রাজগণকে লিখিয়া পাঠান। সেই সভায় বিবাহসম্বন্ধীয় ব্যয় কি প্রকারে কম করা যাইতে পারে, সেই বিষয়ের আলোচনা হইবার কথা হয়। প্রত্যেক রাজার এলাকা হইতে একজন রাজকর্ম্মচারী, একজন জায়গিরদার, এবং এক জন কবি, এই তিন জন করিয়া সভ্য আসিয়াছিলেন। এই সভায় কেবল বিবাহব্যয় কমাইবার কথা হয় না, সকলে মিলিয়া স্থির করেন যে, সমগ্র রাজপুতানার মধ্যে বালক বালিকারা ১৮ ও ১২ বৎসরের না হইলে তাহাদের বিবাহ হইবেক না। এই সভাকর্ত্তৃক কতকগুলি নিয়ম অবধারিত হয়, নিয়মগুলি এ পর্য্যন্ত বেশ পালিত হইয়া আসিতেছে। এক্ষণে রাজপুতেরা উন্নতির পথে পা দিয়াছেন। ভারতবর্ষের আর সকল জাতীয় লোকে ইহাঁদিগের দৃষ্টান্তের অনুকরণ করেন, ইহাই আমাদিগের একান্ত ইচ্ছা।

সে কালে রাজপুতানার নগর ও প্রায় সকল গ্রামই প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল। রাজপুতমাত্রেই ঢাল তরোয়াল বাঁধিয়া চলিত। এক্ষণে দেওয়াল ভাঙ্গিয়া পড়িলে আর গাঁথা হয় না, লোকেও বড় একটা ঢাল তরোয়াল বাঁধিয়া চলে না।

খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম প্রচারকেরা রাজপুতানার প্রধান প্রধান নগরে স্কুল করিয়া ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। যে ধর্ম্ম গুণে ইউরূপীয়েরা এত উন্নত, কালে রাজপুতেরাও সেই ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া উন্নত হইবেন, ইহাই আমাদের আশা।

মাড়বারী।

মাড়বার নামক রাজ্যে বাস বলিয়া ইহাদিগকে মাড়বারী কহে। মাড়বারের রাজধানীর নাম যোধপুর। মাড়বারের বণিক জাতীয় লোকেরা আপনাদিগকে বৈশ্য বলে। ভারতবর্ষের নানা নগরে মাড়বারী নামে যে সকল মহাজন আছে, তাহারা বণিক জাতীয়, মাড়বারে তাহাদিগকে বণিক বলে। ইহাদের ভাষারও নাম মাড়বারী, ইহা হিন্দির রূপান্তর মাত্র। মাড়বারী বণিকদিগের অনেকেই জৈনধর্ম্মাবলম্বী; ইহারা কোন প্রকার প্রাণির হিংসা করে না। বঙ্গদেশে ইহাদিগকে কেঁয়ে বলে। কেঁয়ে কথাটী অবজ্ঞাসূচক।

বাঙ্গালিদিগের ন্যায় ইহাদের মাথা খোলা নহে; কাপড় পাকাইয়া ইহারা অতি সুন্দর পাগড়ি তৈয়ার করাইয়া মাথায় দেয়, পায়ে নাগরা জুতা; রাস্তায় হাজার কাদা হইলেও ইহারা বাঙ্গালিদিগের মত জুতা হাতে করে না। ব্যবসায় বাণিজ্যের অনুরোধে মাড়বারী বণিকেরা, দেশ ছাড়িয়া বিদেশে—অনেক দূর দেশে—গিয়া বহুকাল অনেকে আমরণ বাস করে, কেবল পরিবারের মধ্যে বিবাহ ইত্যাদি উপস্থিত হইলে দেশে যায়। বিদেশে থাকিলেও ইহারা জাতীয়তা, জাতীয় ভাষা ও পরিচ্ছদ ছাড়ে না; আপনাদিগের রাজার প্রতি ইহাদের বিলক্ষণ রাজ-ভক্তি। মহারাজা তখ্‌তসিংহের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে কলিকাতা ও বোম্বের মাড়বারিরা মাথা কামাইয়াছিল।

টাকা ধার দেওয়া মাড়বারির প্রধান ব্যবসায়। ভারতবর্ষে ইহাদের মত সুধখোর আর নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ঋণ-গ্রস্ত হওয়া ভারতবাসির স্বভাব; তাহাতে মাড়বারিদের কিরূপ লাভ হয়, মিঃ মালাবারি তাহার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন।—

“মনে কর, কোন মাড়বারী কাহাকেও ধারে জিনিষ দিতে লাগিল। ক্রমে এক টাকার মাল ধারে দিল। এখন টাকায়

মাসে দুই আনা করিয়া সুদ চলিল। পরে খাতায় নাম উঠিল। এখন কিছু জামিন চাই ত; নিরূপায় খাতক একটা পুরাতন আংটী আনিয়া দিল, দিয়া আরও জিনিষ নিল। কতকগুলি পুরাতন কাপড়, আর কয়েকটা ঘটী বাটী আনিয়া দিল। যখন মাড়বারী দেখিল যে, সমস্ত বন্দকী দ্রব্যের যে মূল্য হইবে, তাহার অর্দ্ধেক মূল্যের জিনিষ খাতককে ধারে দেওয়া হইয়াছে, তখন আর কিছু জিনিষ বন্দক না রাখিলে, আর সেই পচা চাউল, ভাজাঁল ঘি, ও তৈল, এবং ভিজা কাষ্ঠ যোগাইবে না। এ দিকে ত টাকায় দুই আনা সুধ নেয়, আবার বন্দকী মাল ভাড়া দিয়া কিছু ২ লাভ করে। ইহাতে যদি আপত্তি থাকে, টাকা ফেলিয়া দিয়া জিনিষ লইয়া চলিয়া যাও।

"আদায়ের সম্ভাবনা থাকিলে মাড়বারী টাকা ধার বা জিনিষ ধারে দিতে কাতর নহে। ধার দিতে তাহার সাহস যেমন, আদায় করিবার ক্ষমতাও তেমনি। যখন মাড়বারী দেখে যে, টাকা আদায় আর হইতেছে না, তখন খাতকের যাহা পায়, তাহাই টানিয়া লয়, যখন নিতান্তই আদায় হয় না, তখন ছোট-আদালতে নালিশ করে। আইন আদালত মহাজনের নিতান্ত অনুকূল। অনুকূল আইনের বলে মাড়বারী খাতকের যথাসর্ব্বস্ব নিলাম করাইয়া আবার আপনি কিনিয়া লয়।"

"গরিব হিন্দুরাই মাড়বারির প্রধান ভক্ষ্য। সময়ে সময়ে অনেক কেরাণী ও অন্যান্য লোকেও মাড়বারির করাল গ্রাসে পতিত হয়। সে মাকড়সার জাল বিস্তার করিয়া মাছি ধরে। যত দিন খাতক একবারে তাহার হস্তগত না হয়, তত দিন সে ধার দিতে থাকে। কাজেই খাতক চিরজীবন তাহার গোলাম হইয়া থাকে।"

ধার করা রোগটা দূর হইলে হিন্দুরা এক্ষণকার অপেক্ষা সুখী ও ধনবান্ হইতে পারেন।

ভিল।

ভিলদিগকে কেহ কেহ বলেন আদিমনিবাসী, কেহ বলেন কোলারীয়। ইহাদিগের বর্ণ ঘন কৃষ্ণ, আকার খর্ব্ব, চক্ষের নীচের হাড় বিলক্ষণ উচ্চ। নাকের ছিদ্র বড় বড়। শিকার করিতে ইহারা বিলক্ষণ পটু। ইহারা নিজ ভাষা ভুলিয়া গিয়াছে, এক্ষণে এক প্রকার হিন্দি ভাষায় কথা কহে। সে কালের মুসলমান ইতিহাস-লেখকেরা ইহাদিগকে রাজপুতানার দক্ষিণাঞ্চলস্থ পর্ব্বতনিবাসী অতি ক্ষমতাশালী লোক বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শেষে উক্ত পর্ব্বত নিবাস হইতে তাড়িত হইয়া, বোম্বাই রাজধানীর উত্তরাঞ্চলস্থ খান্দেশে গিয়া অনেকে বসতি করে। হিন্দুপ্রধান দেশে বাস করিয়াও ভিলেরা গোমাংস ভোজন করিয়া থাকে। কেবল গোমাংস কেন—ভিলেরা বানর ভিন্ন সমস্ত পশুর মাংস খায়। বানরের মাংস খায় না, কেননা হনূমান এ প্রদেশের দেবতা। ভিলেরা বাঘের বড় আদর করিয়া থাকে। যদি গ্রামে আসিয়া বাঘে মানুষ না মারে, তাহা হইলে উহারা কোন মতে বাঘ মারে না। কোন বন্য পশু গ্রামে আসিয়া উৎপাত আরম্ভ করিলে, নানা ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের পর পাঁচ জনে মিলিয়া তাহার বিচার করে। বিচারে যদি সেই পশু দোষী প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে, সকলে মিলিয়া, তাড়া করিয়া তাহাকে বধ করে, এবং সদর রাস্তার ধারে একটা গাছে টাঙ্গাইয়া দেয়; মনে করে, অন্য পশুরা দেখিলে, ভয়ে আর গ্রামে আসিয়া উৎপাত করিবে না। এক অতি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজপুতানার যে সকল রাজ্যে ভিলদিগের বাস, তত্রত্য রাজাদিগের অভিষেক কালে কোন বিশেষ ভিল পরিবারের প্রধান ব্যক্তি গিয়া নবরাজের কপালে রাজটীকা দেয়। এই অধিকার বিশেষ বিশেষ ভিল পরিবারের আছে। এইরূপে রাজটীকা দেওয়া না

হইলে ভিলেরা কোন রাজাকে রাজা বলিয়া মানে না। কথিত আছে যে, প্রাণ রক্ষার অনুরোধেও ভিলেরা মিথ্যা বলে না। কুকুর ইহাদিগের শিকারের প্রধান ও বিশ্বস্ত সঙ্গী। এই জন্য ইহারা কুকুরকে বড় ভাল বাসে। এবং কুকুর স্পর্শ করিয়া শপথ করিলে সে বড় ভারী শপথ হয়। ইহারা সুযোগ পাইলেই পাঁচ জনে মিলিয়া সুরাপান ও ভোজন করে। মাওয়া (বোধ হয়, মাহুয়া) ফুলের দ্বারা ইহারা এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করে। ইহাতে বড় নেশা হইয়া থাকে। মানুষ মরিলে ইহারা দাহ করে, কেবল অবিবাহিত ছেলে, মেয়ে, আর যাহারা বসন্ত রোগে মরে, তাহাদের দেহ মাটীতে পুতিয়া ফেলে। ওলাউঠা রোগে মানুষ মরিলেও দাহ করে না, পুতিয়া রাখে; মনে করে, চিতার ধূমার সঙ্গে সঙ্গে রোগ ছড়াইয়া পড়িবে। শ্রাদ্ধ করে না, কিন্তু মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যাদি উৎসর্গ করে। ভূত প্রেত, সুলক্ষণ কুলক্ষন বিলক্ষণ মানে; নানা প্রকারে যাদু করে। মাদুলিও ধারণ করিয়া থাকে। মধ্য ভারতের সমস্ত অসভ্য জাতির মধ্যেই জলপরীক্ষার পদ্ধতি প্রচলিত দেখিতে পাই। এক জন ভিল ডায়িনী ধরিতে পারে বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। এক বার সে কোন স্ত্রীলোকের জলপরীক্ষা করিতে গিয়া বড় বিপাকে পড়িয়াছিল। নিম্নে জলপরীক্ষার যে বর্ণনা দেওয়া গেল, তাহা তাহারই নিকট শুনিয়াছিলাম।—

কোন স্থানে জলের মধ্যস্থলে একটী বাঁশ পোতা হয়। যে স্ত্রীলোকটীর নামে দোষারোপ হয়, সে গিয়া সেই বাঁশ ধরিয়া তলায় নামে। ইতিমধ্যে এক জন লোক একটা তীর ছাড়ে, আর এক জন লোক দৌড়িয়া গিয়া সেই তীর আনিয়া, যে স্থান হইতে ছাড়া হইয়াছিল, সেই স্থানে রাখে। তীর কুড়াইয়া যথাস্থানে ফিরাইয়া আনা পর্য্যন্ত যদি স্ত্রীলোকটী জলের ভিতরে থাকিতে

পারে, তবে সে নির্দ্দোষ, আর যদি উঠিয়া পড়ে, তবে দোষী; সুতরাং তাহাকে বাঁধিয়া গাছে ঝুলাইয়া দেয়।

যে স্ত্রীলোকটীর বিচার জন্য এই প্রকারে জল পরীক্ষা হইয়াছিল, সে জলের ভিতর থাকিতে পারে নাই,—তীরন্দাজের হাতে তীর ফিরাইয়া দিবার পূর্ব্বেই উঠিয়া পড়ে। অনন্তর লঙ্কা বাঁটিয়া তাহার দুই চক্ষের উপরে দিয়া, কানি দিয়া বাঁধা হইল। শেষে একটা গাছে বাঁধিয়া দোল দেওয়া হইল। সে কালের অন্যান্য পরীক্ষার ন্যায়, পরীক্ষাকারকদিগের সঙ্গে পূর্ব্বে বন্দোবস্ত থাকিলে, অনায়াসে এই পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হওয়া যায়। আর এক প্রকার জলপরীক্ষা এই;—যে স্ত্রীলোক ডায়িনী হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহাকে এক খানা ছালার ভিতরে পূরিয়া ছালার মুখ শিলাই করিয়া, দুই হাত গভীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হয়। যদি স্ত্রীলোকটী জলের উপরে মাথা রাখিতে পারে, তবে সে নিশ্চয় ডায়িনী। এক বার জনৈক ইংরাজ রাজকর্ম্মচারী শুনিতে পাইলেন যে, অমুক স্ত্রীলোককে লোকে ডায়িনী বলে, তাই তাহার জলপরীক্ষা হইবে। তিনি জিদ করিয়া বলিলেন যে, তা যদি হয়, তবে ডায়িনী ও ওঝা উভয়কে ছালায় পূরিয়া জলে ফেলিয়া দিতে হইবে। কথাটা সকলেরই বড় মনে ধরিল; সুতরাং আর জলপরীক্ষা হইল না, স্ত্রীলোকটী বাঁচিয়া গেল।

কলিকাতা নগরের চৌরঙ্গি নামক রাস্তায় যে স্থান হইতে পার্কষ্ট্রীট নামক পথের আরম্ভ হইয়াছে, সেই খানে স্যর জেমস্ ওয়াটরাম সাহেবের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সাহেব ভিলদিগকে লইয়া অনেক বার শিকার করিতেন, ইনি এই সত্যপ্রিয় অথচ অসভ্য জাতিকে সভ্য করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিয়াছিলেন।

মিশনরিরা ভিলদিগের নিকট সুসমাচার প্রচার করিতেছেন, ইতিমধ্যে কয়েক জন লোক বাপ্তাইজিত হইয়াছে।

শিখ।

শিখদিগের নিবাস পাঞ্জাবে। মহাভারতে এই দেশকে পাঞ্চাল, ও এই দেশের রাজার মেয়ে বলিয়া, দ্রৌপদীকে পাঞ্চালী বলা হইয়াছে। শিখেরা অতি বলবান্, ইহাদের ভাষা পাঞ্জাবী ইহাদের সংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ, অধিকাংশই জাঠ বংশীয়। গ্রামা ঝাড়ুববদারেরা মাজাবি শিখদিগের আদি পুরুষ। শিখ যুদ্ধে মাজাবিরা বিলক্ষণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল।

শিষ্য শব্দের মূর্দ্ধণ্য ষ কে খ করিয়া শিখ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে, এই নামধারণ করাতে ইহাদের গুরুভক্তি প্রকাশ পায়।

নানক এই সম্প্রদায়ের আদিকর্ত্তা। ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরের নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। কবির নামে জনৈক হিন্দুধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। নানক কবিরের শিক্ষার অবলম্বনেই শিক্ষা দান করিয়া গিয়াছেন। একেশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন দ্বারা নানক হিন্দু মুসলমান উভয়কে এক ধর্ম্মাক্রান্ত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু নানকের মূলশিক্ষা একেশ্বরবাদ নহে, অদ্বৈতবাদ, অর্থাৎ সকলই ঈশ্বর, ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছু নাই। তাঁহার মতে হরিনামের জপ দ্বারাই পাপের মোচন ও মোক্ষলাভ হয়।

নানক বিস্তর দেশভ্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, তিনি আকাশ পথে উড়িয়া যেখানে ইচ্ছা, যাইতে পারিতেন। লোকে আরও বলে যে, কোন স্থানে যাইবার ইচ্ছা না থাকিলে, তিনি সেই স্থানকে আপনার নিকট আনাইয়া লইতেন। নানক এক বার মক্কায় গিয়াছিলেন। এক দিন কাবা-সরিপের দিকে পা করিয়া নানক শুইয়া আছেন, ইহা দেখিয়া মুসলমানেরা তাঁহাকে ভর্ৎসনা করাতে তিনি বলেন, ঈশ্বর ত সর্ব্বত্রই আছেন, যে দিকে পা করিয়া শুই না কেন, সেই দিকেই ঈশ্বর

শিখ জাতি।

৭০ বৎসর বয়সে, ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নানকের মৃত্যু হয়। দশম গুরু গোবিন্দের চেষ্টায় শিখেরা যোদ্ধা হইয়া উঠে। গোবিন্দ জাতিভেদ উঠাইয়া দিয়া শিখদিগকে সিংহ উপাধি দান করেন; দীর্ঘকেশ রাখিতে, হাঁটু পর্য্যন্ত পা-জামা পরিতে ও সর্ব্বদা তরোয়াল হাতে রাখিতে উপদেশ দেন। গোবিন্দের জীবনটা লড়াই করিয়া যায়, অবশেষে তিনি হত হয়েন। তাঁহার নামে পাটনায় একটী মন্দির আছে। গোবিন্দ নিজ পদে আর গুরু নিযুক্ত করেন নাই; তিনি বলেন, আমার পরে "গ্রন্থসাহেব" নামক পুস্তককে তোমরা গুরু বলিয়া মানিবে, যাহা কিছু চাও, এই গ্রন্থেই পাইবে।

"আদিগ্রন্থ" অধ্যাপক ট্রম্প কয়েক বৎসর হইল, ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। যদি পাঞ্জাববাসী কোন বাঙ্গালি বাঙ্গালাতে "গ্রন্থের" অনুবাদ করেন, তবে বড় ভাল হয়। অধ্যাপক ট্রম্পের মতে শিখদিগের গ্রন্থ অতি অসংলগ্ন ও নীরস, এক কথা এক শত বার বলা হইয়াছে। অনুমান ৩৫ জন লোকের পদ্যময় উপদেশ ইহাতে সঙ্কলিত হইয়াছে, ইহাদের ১৫ জন কেবল গুরুদিগের প্রশংসা-কীর্ত্তনে নিযুক্ত ছিলেন। মধ্যে মধ্যে বড় চমৎকার ভাব আছে।

প্রতিমাপূজা করে না বলিয়া শিখেরা বড় বড়াই করে; কিন্তু আপনাদের গ্রন্থকেই তাহারা প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছে। হিন্দুরা যেমন শালগ্রামের পূজা করে, শিখেরাও তেমনি গ্রন্থের পূজা করে। স্থধু গ্রন্থ বলিতে নাই, "গ্রন্থ সাহেব" বলিতে হয়। ইহাকে কাপড় পরায়, গহনা পরায়, পাখা দিয়া বাতাস করে, খাটে বসায়, রাত্রিকালে শোয়াইয়া রাখে; ঠিক হিন্দুর শালগ্রাম।

এক্ষণে শিখেরা জাতি মানে; অনেক বিষয়ে হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার পালন করে। কতকগুলি কুসংস্কার বিষয়ে ইহারা সাধারণ হিন্দু অপেক্ষাও অধম। ইহারাও গোরুকে দেবতা বলিয়া মানে। এক সময়ে পাঞ্জাবে কন্যাহত্যা অপেক্ষা গোহত্যা গুরুতর পাপ বলিয়া গণ্য হইত। গোহত্যা করিলে প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মুসলমানদিগের সহিত বিরোধ হেতুই এই কুসংস্কারের স্থষ্টি। মুসলমানেরা যখনই কোন হিন্দু নগর অধিকার করিত, তখনই হিন্দুদিগকে জব্দ করণার্থ গোহত্যা করিত। আবার শিখেরা জয়ী হইলে মস্‌জিদে শূকর হত্যা করিত। নানক হিন্দু মুসলমানকে এক করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু আজিও শিখে আর মুসলমানে বিদ্বেষ ভাব রহিয়াছে।

মদ খাইলে শিখদিগের ধর্ম্ম নষ্ট হয় না, ফলে শিখেরা মদ খাইয়া থাকে; কিন্তু তামাক খাওয়া বড় পাপ, তাই নিষিদ্ধ। তামাকে এক টান দিলে জন্মার্জ্জিত সমস্ত পুণ্যকর্ম্ম নিস্ফল।

আকালি নামে এক দল ধর্ম্মোন্মাদ আছে। তাহারা অনন্ত ঈশ্বরের উপাসক। ইহাদের পাগড়ীতে চূড়া আছে, পাগড়ীর চারি দিকে ইস্পাতের চক্র, সে গুলিতে অস্ত্রের কাজ দেয়; আবার হাতে লোহার অনন্ত পরে। শিখ বিরোধীকে বধ করিলে পুণ্য লাভ হয়, ইহাই ইহাদের বিশ্বাস। কেবল "ঝাট্‌কা" প্রণালীতে যে সকল পশু পক্ষী বধ করা হয়, ইহারা কেবল সেই সকলের মাংস খায়, অন্যপ্রকারে বধ করিলে তাহার মাংস খায় না।

৩০ বৎসর হইল, রামসিংহ নামক জনৈক সূত্রধর গুরু বলিয়া পরিচয় দিয়া শিখ ধর্ম্মের সংস্কার করিতে চাহেন। তাঁহার শিষ্য-দিগের দশটি বিশ্বাস-পদার্থ ছিল, তন্মধ্যে পাঁচটী মুখ্য এবং পাঁচটী গৌণ।

মুখ্য বিষয় পাঁচটীকে পঞ্চ ক বলে, যথা কড়া, কাচ্ছ, কৃপাণ, কাঙ্গী, ও কেশ। কড়া মানে লোহার কডা, কাচ্ছ মানে হাঁটু পর্য্যন্ত পা-জামা, কৃপাণ এক প্রকার তীক্ষ্ণ অস্ত্র, কাঙ্গী মানে চিরুণী আর কেশ অর্থে দীর্ঘ চুল। দাড়ি গোঁপ কামাইয়া স্ত্রী-লোকের আকার ধারণ করিতে নাই, সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিবে। গৌণ পাঁচটী এই ;—নারিমার, কুঁরীমার, শির-কাট্টা, সুন্নৎ কাট্টা, ধীর মালিয়া। নাড়িমার মানে তামাক খাইতে নাই, কুঁরীমার মানে কন্যাহত্যা নিষেধ, শির-কাট্টা মানে যার মাথা কামান, তাহাকে বিশ্বাস করিতে বা তাহার সঙ্গে আলাপ রাখিতে নাই। সুন্নৎ কাট্টা মানে মুসলমান, মুসলমান ও কর্ত্তারপুরের গুরুর শিষ্যের সঙ্গে মিশিতে নাই।

কুকা নামে এক সম্প্রদায় আছে। তাহারা হিন্দু শাস্ত্র আদৌ মানে না; সুরাপান করে না; মাংস খায় না; স্বজাতীয় ছাড়া অপর জাতীয় লোকের হাতে খায় না; এতদ্ব্যতীত ব্যবস্থাকে বড় মানে। ১৮৭২ শালে কুকারা ক্ষেপিয়া উঠে। দোষী প্রমা-

ণিত হওয়াতে তাহাদের ৭০ জনের প্রাণদণ্ড হয়। দলপতি রাম সিংহ রেঙ্গুণের জেলখানায় কয়েদ থাকেন।

পাঞ্জাবী ভাষাকে অনেকে সে কেলে হিন্দির রূপান্তর মনে করেন। আবার অনেকে ইহাকে স্বতন্ত্র ভাষা বলিয়া থাকেন। অক্ষর গুলির নাম গুরুমুখী, দেখিতে অনেকটা হিন্দির মত। সর্ব্ব প্রথমে গুরুর উপদেশ কথা এই অক্ষরে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া অক্ষর গুলির নাম গুরুমুখী হইয়াছে। অনেক পাঞ্জাবী ভাষার পুস্তক পারসী অক্ষরে লিখিত হইয়াছে। প্রায় এক কোটী চল্লিশ লক্ষ লোকে পাঞ্জাবী ভাষায় কথা কহে। ১৮৮৮ সালে পাঞ্জাবী ভাষায় ৬৪৫ খানা বহি বাহির হয়। এই সকলের অধিকাংশই গ্রন্থের পদাবলিতে পরিপূর্ণ। গুরু নানকের অতি উত্তম জীবনচরিত বাহির হইয়াছে। ইহার নাম "জনম সাক্ষী।"

ইহাদের আবার গুরুমন্ত্র আছে, তাহাকে "জপজি" বলে। ইহাতে নানক প্রণীত ৪০টী শ্লোক আছে। ধার্ম্মিক শিখেরা এই গুরুমন্ত্র জপ করিয়া থাকে।

স্যর মনিরর উইলিয়েম নামক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে এক জন শিখের স্তব সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। তাহা তিনি এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন।—

"সে দিবস পাঞ্জাব হইতে আগত জনৈক শিখের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহাকে শিখ ধর্ম্মের বিষয় কিছু জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর করিলেন, 'আমি পৌত্তলিক নহি; এক মাত্র ঈশ্বর মানি, সকালে বিকালে গুরুমন্ত্র জপ করি। কিন্তু দশ মিনিটের মধ্যে জপ শেষ করিতে পারি,' তিনি এই প্রকার দ্রুত জপ করাকে বড় পুণ্যকর্ম্ম জ্ঞান করিয়া থাকেন।"

"আমি জিজ্ঞাসিলাম, 'আর কি করিতে হয়,' তিনি বলিলেন, আমি এক বার অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী কোন পুণ্য বাপি দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সেই বাপিতে নামিয়া স্নান করিয়া এক

ধাপ উঠিয়া 'জপজি' আওড়াইলাম, আবার জলে নামিয়া, স্নান করিয়া, দুই ধাপ উঠিয়া আবার জপজি আওড়াইলাম, তৃতীয় বার জলে নামিয়া, স্নান করিলাম, এবং তিন ধাপ উঠিয়া আবার জপজি আওড়াইলাম; এইরূপে ৮৫ বার স্নান, ও ৮৫ বার গুরুমন্ত্র জপ করিলাম, ইহাতে১৪ ঘণ্টা লাগিয়াছিল, ফলে বৈকালে বেলা পাঁচটা হইতে পরদিন প্রাতঃকালে সাতটা পর্য্যন্ত উপবাসও করিয়াছিলাম। এই মন্ত্র গ্রন্থের ছয় পৃষ্ঠা অধিকার করিয়া আছে।"

"জিজ্ঞাসিলাম, 'এই কষ্ট করিয়া কি উপকারের আকাঙ্ক্ষা কর।' তিনি বলিলেন, 'ইহাতে ঢের পুণ্য সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা অনেক দিন থাকিবে।'"

পণ্ডিতবর মনিয়র উইলিয়েম অমৃতসরে গিয়া শিখদিগের বিখ্যাত মন্দির দর্শন করেন। মন্দির হইতে বাহির হইতে হইতে জনৈক বিচক্ষণ শিখের সঙ্গে তাঁহার খানিক ক্ষণ কথা হয়। ঐ ব্যক্তি ইংরাজি জানিত। পুষ্করিণীর পোস্তার উপরে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি স্থাপিত ছিল। সেইটী দেখাইয়া পণ্ডিতবর শিখ যুবককে জিজ্ঞাসা করিলেন, শিখেরা কি আবার বৈষ্ণব বিগ্রহের উপাসনা আরম্ভ করিয়াছেন? যুবক বলিলেন, 'হাঁ, আমরা পুনরায় পুরাতন আচরণের অনুসরণ করিতেছি। আমাদের প্রথম গুরু জাতিভেদ তুলিয়া দেন, এবং প্রতিমা পূজা নিষেধ করেন। আমাদিগের দশম গুরু মনে মনে পাকা হিন্দু ছিলেন, নিজে দৃষ্টান্ত দেখাইয়া আমাদিগকে হিন্দু উপাসনাপদ্ধতি পুনরায় অবলম্বন করিতে উৎসাহ দেন। এক্ষণে পাঞ্জাবের অধিকাংশ শিখ জাতিভেদ মানে, যজ্ঞোপবীত ধারণ করে, হিন্দু ধর্ম্ম পালন করে, শ্রাদ্ধাদি হিন্দু ক্রিয়াকলাপ মানে, এমন কি, হিন্দু দেবমন্দিরে গিয়া দেবতার পূজা পর্য্যন্ত দেয়।'

শিখজাতীয় অনেকে খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। পাঞ্জাবের নানা স্থানে মিশনরিরা স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। কর্পূরতলার

এক রাজকুমার খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছেন। দলীপ সিংহের পুত্র কন্যারা খ্রীষ্টীয়ান।

বেহারি লাল সিংহ নামক জনৈক শিখ কলিকাতায় ডফ্ সাহেবের বিদ্যালয়ে পড়িয়া খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইনি শেষে পাদ্রি হইয়া রামপুর-বোয়ালিয়ায় গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জীবন কাটান।

ভারতবর্ষে অনেক জাতীয় লোকের সঙ্গে ইংরাজদিগকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহারা শিখদিগের ন্যায় যোদ্ধা খুব কম দেখিয়াছেন। শিখেরা এক সময়ে ইংরাজদিগের যেমন শত্রু ছিল, এক্ষণে তেমনি মিত্র হইয়াছে। ১৮৫৭-৫৮ শালের সিপাহি বিদ্রোহ কালে শিখেরা ইংরাজদিগের প্রকৃত বন্ধুর কাজ করিয়াছিল।

কাশ্মীরী।

কাশ্মীর নামক উপত্যকা হিমালয় পর্ব্বতের উত্তর পশ্চিম দিকে। এ দেশের জলবায়ু ও মনোহারিণী স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য প্রসিদ্ধ। এই দেশটীকে অববাহিকা বলিলেও হয়, দেশের চারিদিকেই অতি উচ্চ পর্ব্বতমালা। দেশের মধ্যস্থলে অতি উর্ব্বরা একটী প্রদেশ আছে; তাহার মধ্য দিয়া ঝিলম নদী প্রবাহিত। এখন যেমন ভারতের গবর্ণর জেনারেল গ্রীষ্মকালে সিমলা পাহাড়ে গিয়া বাস করেন, তদ্রূপ দিল্লীর মুসলমান বাদশারা গ্রীষ্মকালে গিয়া কাশ্মীরে বাস করিতেন। মধ্যে ভূমিকম্পের দ্বারা কাশ্মীরের অনেক ক্ষতি হইয়াছে। এক জাতীয় ছাগের লোম দ্বারা এ দেশে যে শাল প্রস্তুত হয়, তাহা অতি চমৎকার এবং জগদ্বিখ্যাত।

এই দেশের শাসন বিষয়ে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এক কালে এই রাজ্য হিন্দুরাজ্য ছিল। পুরাণে কাশ্মীরের নামোল্লেখ

কাশ্মীরী স্ত্রীলোক।

আছে। এই দেশে হিন্দু রাজত্ব কালে রাজতরঙ্গিণী নামে এক খানি পুস্তক লিখিত বা সঙ্কলিত হয়। ভারতবর্ষের ইহাই একমাত্র ইতিহাস গ্রন্থ। খ্রীষ্টাব্দের চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে এ দেশে মুসলমান ধর্ম্ম নীত হয়। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে আমেদশাহ কাশ্মীর জয় করেন, ১৮১৯ শাল পর্য্যন্ত দেশটী আফ্‌গানদিগের অধীনে ছিল; পরে শিখেরা দখল করে। ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট হইতে গোলাপ সিংহ এই দেশ প্রাপ্ত হন। এই জন্য তাঁহাকে ৮০ লক্ষ টাকা দিতে হইয়াছিল। গোলাপ সিংহ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের করদ রাজা ছিলেন। কাশ্মীর দেশ যেমন সুন্দর, দেশের মানুষও তেমনি সুন্দর। ইহাদের পোশাক সঙ্কোচিত। স্ত্রীলোকেরা বিনুনী করিয়া চুলগুলি পৃষ্ঠে দোলাইয়া দেয়। কাশ্মীরী ভাষা তিন প্রকার। ব্রাহ্মণেরা যে ভাষার ব্যবহার করেন, তাহাতে অনেক সংস্কৃত কথা আছে। আবার মুসলমানদিগের অনেক কথা পারসিক ও আরবি এবং স্ত্রীলোকে, ও অশিক্ষিত লোকে সাবেক ভাষায় কথা বলে।

দেশের দশ আনা লোক মুসলমান। হিন্দু রাজারা ইহাদিগের উপর বড় অত্যাচার করিতেন। অল্প দিন হইল, কোন রাজা মনে করেন যে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা মরিয়া মৎস্য জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্য মৎস্য বধ ও ভক্ষণ নিষেধ করেন।

শিখদিগের অধিকার কালে মুসলমানদিগকে যে অত্যাচার সহিতে হইত, তাহা শুনিলে বুক ফাটিয়া যায়।

অনেক কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষে আসিয়া ভারতের নিবাসী হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহাদিগকে কাশ্মীরী পণ্ডিত বলে। দেশত্যাগ কালে আত্মীয়েরা তাঁহাদিগকে মৃত জ্ঞান করতঃ তাঁহাদের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎকালে যাতায়াতের বড় কষ্ট ছিল, পথও অতি দীর্ঘ; যাহারা এক বার দেশ ছাড়িয়া যাইত, তাহাদিগের সহিত পুনরায় আর দেখা সাক্ষাতের, বা তাহাদের কোন সংবাদ

পাইবার আশা ছিল না। কাশ্মীরী ব্রাহ্মণেরা এ দেশে আসিয়া এদেশীয় রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিয়াছেন। আহার ও পান বিষয়ে তাঁহারা ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণদিগের রীতি নীতি পালন করেন। আবার তাঁহারা কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদিগকে গোঁড়া ও অজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

গোঁড়া হইলেও তাঁহারা মাংস ভক্ষণ করেন, (বঙ্গদেশের ব্রাহ্মণেরা মাংস খাইয়া থাকেন) মুসলমানের হাতে জল খান। গায়ে কাপড় দিয়া আহার করেন; (বাঙ্গালি ব্রাহ্মণেরাও তাই করেন)। এবং নৌকায় রাঁধিয়া খাইতেও তাঁহাদের আপত্তি নাই।

কলিকাতা হাইকোর্টের দ্বিতীয় দেশী জজ শম্ভুনাথ পণ্ডিত কাশ্মীরী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার সন্তানেরা কলিকাতায় বাস করিতেছেন।

আফ্‌গান বা পাঠান।

আফগানিস্থানে নানা বংশীয় আফ্‌গান বাস করে। প্রায় দশ লক্ষ আফগান ভারতবর্ষের এলাকায় আছে। সাধারণতঃ তাহাদিগকে কাবুলী বলে।

ইহাদের ভাষাকে পশ্‌তু বা পক্তু বলে; এ ভাষা আর্য্য-ভাষা-পরিবারভুক্ত, এই ভাষার ব্যাকরণের নিয়ম সকল হিন্দি ভাষার ন্যায়। ইহাতে পারসি, আরবি ও হিন্দুস্থানী বিস্তর শব্দ আছে। দুর্গম জঙ্গলময় পর্ব্বতে ও উপত্যকায় নানা জাতীয় পাঠান বাস করে। ইহারা পরস্পর নিয়ত মারামারি কাটা-কাটি করে। ইহাদের সকলেরই মূল ভাষা পশ্‌তু হইলেও, ইহারা যে যে ভাষা বলে, তাহাতে অনেক ভিন্নতা আছে। পশ্‌তু ভাষায় অনেক উত্তম কাব্য গ্রন্থ আছে।

আফ্‌গানেরা বলবান, হৃষ্টপুষ্ট, প্রায় সকলেই গৌরবর্ণ, দাড়ি লম্বা, স্বভাবতঃ ইহাদিগের দাড়ি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু অনেকে কলপ

আফ্‌গান।

দিয়া লাল বা কটা রং করিয়া থাকে। ইহাদের নাক গরুড় পক্ষীর ঠোঁটের মত বাঁকা, ইহারা মাথার চাঁদি কামাইয়া ফেলে, ফলে মাথার মধ্যস্থল কপাল হইতে কামায়, এবং বাকি চুল বাবরির মত ঝুলাইয়া দেয়। ইহারা যখন পথ চলে, তখন বোধ হয় যেন গণিয়া গণিয়া পা ফেলে, ভাব ভঙ্গীতে বিলক্ষণ অহঙ্কার প্রকাশ পায়; কথায় কথায় রাগিয়া উঠে। ইহারা নানাদেশে ফিরি করিয়া জিনিষ বেচিতে এবং শিকার করিতে বড় ভাল বাসে। স্ত্রীলোকদিগের যিহূদী ধরণের অতি সুন্দর গঠন, পুরুষদিগের গঠনেও অনেকটা যিহূদী ভাবভঙ্গী আছে। স্ত্রীলোকেরা

গৌরবর্ণ, কিন্তু রক্তাক্ত গৌরবর্ণ। দুটী বিনুনী করিয়া চুলগুলি পীঠে ছাড়িয়া দেয়, শেষ কালে ডগার দিকে বিনুনী দুটী একত্র করিয়া রেশমী ফিতা দিয়া বাঁধে। ইহারা অন্দর মহলে বন্ধ থাকে, কিন্তু ইহারাই নানা রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মূল।

আফ্‌গানী কন্যা।

আফগানেরা বাল্যকাল হইতেই রক্তপাত হইতে দেখে ও রক্তপাত করিয়া থাকে, সুতরাং মরিতে ভয় করে না; বিলক্ষণ সাহস-সহকারে শত্রুকে আক্রমণ করে, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইলে বড় সহজেই নিরুৎসাহিত হইয়া পড়ে। ইহারা বড় দুরন্ত, কাহারও বশীভূত হইবার নহে; আইন ও শাসনের অধীন হইতে চাহে

না। কোন অভিসন্ধি সাধনের ইচ্ছা থাকিলে, লোকের সঙ্গে বিলক্ষণ মিশিয়া চলে, কিন্তু সে অভিসন্ধি সাধনের আশা নিস্ফল হইলে অতি ভয়ানক নিষ্ঠুরাচরণ করিতে পারে। মিথ্যাসাক্ষ্য দিতে ইহারা বিলক্ষণ পটু। বিশ্বাস-ঘাতক ইহাদের মতন আর নাই বলিলেই হয়। এ দিকে আবার অহঙ্কার টুকু ষোল আনা। প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা ইহাদের অদম্য, অতি নিষ্ঠুর-রূপে নিজের প্রাণ দিয়াও ইহারা বৈরনির্য্যাতন করিয়া থাকে। ইহারা সামান্য কথায় মানুষের প্রাণবধ করে।

কোন কোন আফ্‌গান জাতি পশু-পালক, পশু লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়; আর সকলে কৃষিকার্য্য করে, এবং গ্রামে অনেকে একত্র ঘর বাঁধিয়া বাস করিয়া থাকে।

এক এক গ্রামে নানা পাড়া আছে। পাড়ায় পাড়ায় পঞ্চায়েত। কোন পাড়ার পঞ্চায়েতে কোন বিষয় স্থির হইলে, তাহারা সমগ্র গ্রামের পঞ্চায়েতের নিকট আপনাদিগের প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেয়। এই পঞ্চায়েতে সেই বিষয়ে কিছু স্থির হইলে "খেল," অর্থাৎ গোষ্ঠীপতির নিকট প্রতিনিধি পাঠায়, এই সকল গোষ্ঠীপতিদিগের সভাকে "জির্গা" বলে। জির্গায় সকল বিষয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়। এই সকল সভায় বিবাদ বিসম্বাদ যে না হয়, তাহা নহে; কিন্তু জির্গা নামক সভায় কোন গোষ্ঠীর বিষয়ে কিছু স্থির হইয়া গেলে, সে গোষ্ঠীকে তাহা মানিতেই হয়; না মানিলে গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে; মালিক নামক গোষ্ঠীপতিরা সেই দণ্ড দান করেন, বা জরিমানা আদায় করেন। নগরে নগরে কাজি বা মুফ্‌তি থাকেন, তাঁহারা মুসলমান ধর্ম্ম শাস্ত্রানুসারে মামলা মোকদ্দমার বিচার নিষ্পত্তি করেন; কিন্তু অধিকাংশ বিষয়েই আফগানেরা চিরপ্রচলিত পুরুষপরম্পরাগত নিয়ম মানিয়া চলে। এই নিয়মের একটী প্রধান নিয়মকে "ভিতরে প্রবেশ" বলে। যে কোন ব্যক্তি গৃহস্থের বাড়ীতে প্রবেশ

করিয়া তাহার অনুমতি প্রার্থনা করতঃ যাহা কিছু চায়, নিজের ধন প্রাণ সর্ব্বস্ব গেলেও অভ্যাগত ব্যক্তিকে তাহা দিতে হয়। আবার উক্ত আইন মতে, কোন পথিক অতিথি হইলে গৃহস্থ তাহাকে আশ্রয় ও আহার দিতে বাধ্য; কিন্তু কেহ যদি পাঠানের কোনরূপ অনিষ্ট করে, বা তাহাকে অপমানিত করে, বা তাহার আত্মীয়জনের প্রাণবধ করে, তাহা হইলে তাহার প্রতিশোধ লওয়াও পাঠানের কর্ত্তব্য কর্ম্ম মধ্যে গণিত। যদি তখনই প্রতিশোধ লইবার সুযোগ না পায়, দীর্ঘকাল নীরবে সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। সর্ব্বদাই শত্রুকে ফাঁদে ফেলিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করে। এই সকলের, বিশেষতঃ প্রাণের বদলে প্রাণ লইতে না পারিলে পাঠানের বড় অপমান। পিতা প্রতিশোধ না লইয়াই মরিয়া গেলে পুত্র, তদভাবে পৌত্রাদিরা প্রতিশোধ লইতে বাধ্য। কেহ কাহাকে খুন করিলে পঞ্চায়েতের দ্বারা তাহার বিচার হইয়া থাকে; বিচারে হত ব্যক্তির আত্মীয়েরা প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ না লইয়া, ইচ্ছা করিলে প্রাণের মূল্য লইতে পারে। পাঠান আইন মতে অকারণে নরহত্যা, যুদ্ধে যাইতে অস্বীকার, পঞ্চায়েতের বিচার অগ্রাহ্য ও ব্যভিচার করিলে, বড় গুরুতর দোষ; এ সকল দোষে দোষী ব্যক্তির বিচার ও গুরুতর দণ্ড হইয়া থাকে। কোন্ সময়ে শত্রু আসিয়া প্রতিশোধ লইবে, তাহার স্থিরতা নাই, এই কারণে সকলেই সকল সময়ে সঙ্গে অস্ত্র রাখে; যখন মাঠে পশু চরায়, যখন বলদের পীঠে বোঝা চাপাইয়া তাড়াইয়া লইয়া যায়, এবং যখন মাঠে লাঙ্গল চসে, তখনও পাঠান অস্ত্র ছাড়ে না, অস্ত্র তাহার চিরসঙ্গী।

আফগানেরা সুন্নি সম্প্রদায়স্থ মুসলমান; কয়েকটী গোষ্ঠীয় আফগানেরা সিয়া মত মানে বটে, কিন্তু তাহারা বোধ হয়, প্রকৃত পাঠান নহে। ইহারা মোল্লাকে বড় মানে, বিশেষ মন্দ করিবে বলিয়া ভয় করে। যাহারা মুসলমান ধর্ম্ম মানে না, তাহাদিগকে

যত না ঘৃণা করে, সিয়াদিগকে পাঠানেরা তদপেক্ষা ঘৃণা করিয়া থাকে; পারসিকেরা সিয়া, এই জন্য সিয়া মাত্রকেই সুন্নিরা দুই চক্ষের বিষ মনে করে। অন্য দেশীয় মুসলমানেরা যেমন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রতিবাসিকে কাফের বলিয়া হেয়জ্ঞান করে, আফগানেরা তাহা করে না, তবে যখন ধর্ম্মের দোহাই দিয়া যুদ্ধারম্ভ হয়, তখন বিলক্ষণ ক্ষেপিয়া যায়।

আফগানেরা এক রাজার অধীন। রাজতন্ত্র শাসন বলিতে গেলে আমরা যাহা বুঝি, আফগানদিগের শাসন প্রণালী তেমন নহে। একদল সামরিক কুলীন সম্প্রদায় আছে, তাহাদের অধীনে নানা প্রজাতন্ত্র সম্প্রদায় আছে; রাজা উক্ত কুলীন সম্প্রদায়ের কর্ত্তা; কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্ব জীবনস্বত্ব মাত্র। সর্দ্দারেরা এক এক জিলার কর্ত্তা, আপনারা যেমন ভাল বুঝেন, জিলার কার্য্য সেই রূপে চালান। ইহাঁরা ঈর্ষ্যাপূর্ণ, উচ্চাভিলাষী, দুরন্ত; সর্দ্দারগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ জন্মাইয়া দিয়াই কেবল আমির ইহাদিগকে জব্দ করিতে পারেন। ইহাদের পরস্পর একতা নাই, কোন বিষয় চিরস্থায়ীও নহে। শান্তির সময়েই হউক, আর যুদ্ধ কালেই হউক, জমীদার ও সিপাহিরা অকাতরে এক পক্ষ ছাড়িয়া অন্য পক্ষে যোগ দেয়। এক জন প্রাচীন আফগানকে একদা কোন ইংরাজ বুঝাইয়া বলেন যে, বলবান্ রাজার শাসনাধীনে প্রজারা নির্ব্বিঘ্নে এবং শান্তিতে কাল যাপন করিয়া থাকে। তাহাতে আফগান বলে, "অনৈক্য, হুজুক, রক্তপাত, এই সকলই আমাদের ভাল লাগে, এক রাজার অধীনে নিষ্কণ্টকে থাকিতে ভাল লাগে না।" ইহারা রাজাকে আমির বলে।

খাইবর পাস নামক গিরিপথ অতি ভয়ানক; অতিশয় দীর্ঘ, অসমান, দুই পাশে পাহাড় খাড়া দেওয়ালের মত দাঁড়াইয়া আছে। এখানকার নিবাসিদিগকে খাইবরি বলে। ইহাদের পাগড়ি কৃষ্ণবর্ণ, গায়ের কোট বা চোগা ঘন কৃষ্ণবর্ণ, ইহাদের পায়ে

ঘাসের জুতা। তরোয়াল, ছোট খাট বড়শা, আর সে কেলে বন্দুক ইহাদের অস্ত্র ; ডাকাইতি ইহাদিগের পুরুষপরম্পরাগত ব্যবসায়। ভারতবর্ষ হইতে মহাজনেরা বাণিজ্যদ্রব্য লইয়া খাইবর পাশ দিয়া আফগানিস্থানে, বা কাবুলে যাতায়াত করিয়া থাকে। খাইবরিরা তাহাদিগের দ্রব্যজাত লুঠ করিত; তাহাদিগকে ঘুষ না দিলে বণিকদিগকে সর্ব্বস্ব হারাইতে হইত। পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের চূড়া হইতে তাহারা পাথর গড়াইয়া দিত, বা বন্দুক দিয়া গুলি করিত, পথিকেরা নিরুপায়, রক্ষা পাইবার উপায়ান্তর ছিল না। ইহারা অতি বিশ্বাসঘাতক, কথা দিয়া কথা রাখে না। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের কাছে টাকা লইয়া, অনেক সময়ে, পথিকদিগকে নিরাপদে পাস দিয়া লইয়া যাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও, লোভ সামলাইতে না পারিয়া তাহাদিগের সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া পলাইয়াছে। এক্ষণেও উহারা ভারত গবর্ণমেণ্ট হইতে বার্ষিক কিছু টাকা পায়। ইহাদিগকে খাইবর পাস সর্ব্বদা খোলা ও নির্ব্বিঘ্ন রাখিতে হইবে, এবং পথিকদিগকে নিরাপদে পার করিয়া দিতে হইবে, এই রূপ বন্দোবস্ত হইয়াছে।

ইহারা মুসলমান বটে, কিন্তু কোন কোন বংশীয় পাঠানেরা মুসলমান ধর্ম্মের কিছুই জানে না, মহম্মদের নাম পর্য্যন্তও জানে না। সকলেই নিজ নিজ গ্রামে এক একটা করিয়া পীরের কবর রাখে। গ্রামে পীরের কবর থাকিলে সেই পীরের কেরামতে যথাসময়ে বৃষ্টি ও আরও নানা মঙ্গল হইয়া থাকে, এই ইহাদের বিশ্বাস। অন্যান্য স্থান হইতে যাত্রিরা এই কবর দর্শন করিতে গিয়া সিন্নি চড়ায়। কয়েক বৎসর হইল, আফ্রিদি নামক আফগানদিগের গ্রামে এক ফকির ছিল, লোকটার বিস্তর বুজরুকি ছিল। এমন সাধু পুরুষের কবর গ্রামে থাকিলে যথেষ্ট মঙ্গল হয়। অনন্তর তাহারা তাহাকে বধ করিয়া গ্রামের মধ্যে তাহার কবর দেয়।

আবার কতকগুলি আফগান অতি অসভ্য। কাফির অর্থাৎ অবিশ্বাসিকে বধ করিলে তাহার ত স্বর্গ লাভ নিশ্চিত, এই আশায় অনেকে হত্যা করে। বিচারে হত্যাকারীর প্রাণদণ্ড হইলে, ধর্ম্মার্থ প্রাণ দিতে হইল বলিয়া তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। নিম্নে ইহার এক দৃষ্টান্ত দেখাইতেছি।

"কিছু দিন পূর্ব্বে এক জন লোক এমন দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, সে এক জন মোল্লাকে গুলি করে। হয় ত দৈবাৎ এইরূপ হইয়াছিল, অথবা ভুল করিয়া, এক জন ভাবিয়া আর এক জনকে মারিয়া ফেলিয়াছিল, অথবা দুষ্টামি বশতঃও হইতে পারে। মোল্লা মরিয়া

গেল, সুতরাং হত্যাকারীকে পলাইয়া দেশের সীমানার বাহিরে যাইতে হইল। প্রথমে বনিয়ার নামক স্থানে গেল; গিয়া দেখে, তাহার আগেই সেই হত্যাসংবাদ সেখানে পৌঁছিয়াছে, সুতরাং কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না। তার পর সোয়াট উপত্যকায় গেল, সেখানেও স্থান হইল না, আখন্দের দেশেও কেহ তাহাকে আশ্রয় দিল না। আফ্রিদী নামক পাঠানেরা মোল্লা টোল্লার বড় ধার ধারে না, তাহারাও সাধু হত্যাকারী পাষণ্ডকে জায়গা দিল না। নানা স্থানে গিয়াও আশ্রয় না পাওয়াতে লোকটার মনে শেষ অনুতাপের উদয় হইল। কেহই আমাকে জায়গা দিলে না, যা, তবে ধর্ম্মার্থ প্রাণ দিব ; যাই, একটা সাহেবকে (ইংরেজ) গিয়া গুলি করি। অতএব সে আবার পেশোয়ার জিলায় ফিরিয়া আসিল, কাণ্টন্মেণ্টের কাছে গিয়া, কোন সাহেব সেই পথে আইসে কি না, সেই তর্কে রহিল। কেহ না আসাতে সেখান হইতে চলিয়া যাইতে লাগিল, এমন সময়ে অশ্বারোহী সেনাদলের এক জন সার্জ্জন ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিল, তাহার ঘোড়াটা বড় দুষ্টামী করিতেছিল, সেই দুঃসাহসী আফগান তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল, গুলি লাগিল না ; আবার গুলি করিল, সে গুলি লাগিয়া সার্জনের টুপি উড়িয়া গেল। পাঠান যেই সেটা ধরিতে যাইবে, অমনি এক জন চালাক লোক তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। বৈকালে তাহার সরাসরি বিচার ও পরদিন প্রাতঃকালে ফাঁসি হইল।”

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নর্ম্মাণ সাহেব এবং গবর্ণর জেনারেল লর্ড মেয়ো, এই উভয়কে পাঠানে বধ করে। অন্য কোন ইংরাজে কোন পাঠানের প্রতি হয় ত অন্যায় করিয়াছিল, সেই রাগে অন্য পাঠানে উহাদের প্রাণ বধ করে।

বানিজ্য ব্যবসায় করণার্থে আফগানেরা সর্ব্বদা ভারতবর্ষে আসিয়া থাকে। ইহারা বড় অপরিষ্কার, ইহজন্মেও স্নান করে না, বা কাপড় কাচে না।

বেলুচি।

আফগানিস্থানের দক্ষিণেই বেলুচিস্থান। উত্তরে কোয়েটা। কোয়েটা এক্ষণে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের হাতে। ব্রিটিশ এলাকায় কম হইলেও দুই লক্ষ বেলুচি আছে, ইহাদের অধিকাংশের নিবাস সিন্ধু দেশে, এই সিন্ধুদেশ ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিবার পূর্ব্বে বেলুচি আমিরদিগের শাসনাধীনে ছিল।

বেলুচি ভাষা কয়েক রকম। এই ভাষা লিখিবার বিশেষ নির্দ্দিষ্ট অক্ষর নাই, অনেক ছাপার বহি আরবি অক্ষরে হইয়াছে।

স্বদেশে বেলুচিরা সচরাচর তাম্বুতে বাস করে। ইহাদের তাম্বুও আফগান তাম্বুর মত কালো কাপড়ের।

যে জাতি তাম্বুতে বাস করে, সে জাতি কখনও এক জায়গায় থাকে না; নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। লুঠপাট করা যদি তাহাদের ব্যবসায় না হয়, তবেই মঙ্গল। বেলুচি মাত্রেই ডাকাইত, পশ্চিমাঞ্চলের বেলুচির ত কথাই নাই। বেলুচি ডাকাইতেরা উষ্ট্রে চড়িয়া পথ খরচের জন্য খেজুর, চাপাটি, ও পনির এবং চামড়ার থলিয়াতে জল লইয়া বাহির হয়। যে আড্ডায় না থামিলে নয়, সেই আড্ডায় থামে, অবশেষে যে গ্রামে ডাকাতি করিবে, তাহার ক্রোশ খানিক দূরে আসিয়া থামে। এই খানে উটগুলিকে বিশ্রাম করিতে দেয়। রাত্রি হইলে আবার উটে চড়িয়া, বাকি পথটুকু যায়, গিয়া অবিলম্বে নির্দ্দিষ্ট গৃহস্থের বাটী আক্রমণ করে, উষ্ট্রের পীঠে দ্রব্যজাত বোঝাই করিয়া অন্য পথে নির্দ্দিষ্ট স্থানে ফিরিয়া যায়। কিন্তু বড় ত্রস্ত যায়। যাহাদিগকে ধরিয়া, গোলাম করিবার জন্য লইয়া যায়, তাহাদের বড় কষ্ট, ধরিয়াই তাহাদিগের হাত ও চক্ষু বাঁধিয়া ফেলে। অনন্তর উষ্ট্রের সঙ্গে বাঁধিয়া দিয়া টানিয়া লইয়া যায়। দেশে লইয়া গিয়া স্ত্রীলোকদিগের মাথার চুল ও পুরুষদিগের দাড়ি

কামাইয়া দেয়। পরে তাহতে চুন মাখাইয়া দেয়, সুতরাং আর চুল গজাইতে পারে না। যদি কেহ কখনও পলাইয়া দেশে ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হয়, তবে এই কারণে তাহারা বড় অপমান অনুভব করিয়া থাকে। বেলুচিরা যখন দেখিল যে, ইহারা আর পলাইয়া যাইবে না, তখন দাসেদের উপর অত্যাচার করে না।

কাপ্তান বার্টন বলিয়াছেন যে, সাধারণ সিন্ধি অপেক্ষা বেলুচি শারীরিকতঃ ও মানসিকতঃ অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ। বেলুচি সিন্ধি অপেক্ষা গৌরবর্ণ, হৃষ্টপুষ্ট এবং পরিশ্রমী। মান অপমানের বিষয়ে ইহাদের নিজের একটী ধারণা আছে, কাপুরুষতা ইহাদের বড়ই ঘৃণার বিষয়। ইহারা জাতীয়তা ও বংশমর্য্যাদার বড় পক্ষ-পাতী। এদিকে আবার বেলুচিরা আশুক্রোধী, বিশ্বাস-ঘাতক, ও বৈরনির্য্যাতন প্রিয়; অত্যন্ত ইন্দ্রিয়াসক্ত, অতি অপরিষ্কার এবং রূঢ়ভাষী। আচার ব্যবহারে নিতান্ত গোঁয়াড়। সুরাপান এবং শিকার বা ঘোড়-দৌড় ইহাদের অতি প্রিয় আমোদ; ইহা-দের বিবেচনায় পোষা বাজ পক্ষী দিয়া অন্য পক্ষী শিকার করা বা অশিক্ষিত ঘোড়াকে কদমে চলিতে শিক্ষা দেওয়া, এবং তরো-য়ালের এক চোপে একটা বড় মেষকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলা, লেখা পড়া ও বোগদাদ এবং বোখারার সমস্ত বিজ্ঞান অপেক্ষাও সম্মানজনক। এই প্রকার সংস্কার প্রচলিত থাকাতে, সিন্ধু-দেশে বেলুচিদিগের মধ্যে এক জনও পণ্ডিত লোক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রাজবংশীয় লোকেরাও বিদ্যার চর্চ্চা করেন না; একটু পারসি শিখিতে পারিলেই ইঁহারা মনে করেন, যথেষ্ট হইল; ইহাঁদের বংশের অনেকে গ্রন্থকার বলিয়া পরিচিত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল পদ্যময় গ্রন্থ বেতনগ্রাহী লোকে রচনা করিয়া দিত, ইহাঁরা তাহার নকল করিয়া, নিজের রচিত বলিয়া প্রকাশ করিতেন। রাজপরিবারস্থ অনেক ধনবান লোকে পারস্য ইত্যাদি দেশ হইতে অনেক দামী পুস্তক আনাইয়া

থাকেন, কিন্তু পাঠ করিবার জন্য নহে, বড় মান্‌ষি দেখাইবার জন্য। তালপুর পরিবারের এক জন ধনবান্ ব্যক্তি এক বার কাপ্তান বার্টনকে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন, আমি নিজে লিখিতে জানি না, কিন্তু কোথাও যাইতে হইলে মুন্সি সঙ্গে লইয়া যাই।

অন্যান্য দেশীয় মুসলমানের ন্যায় বেলুচিরাও কোরাণ মতে চারিটী বিবাহ করিতে পারে, তা ছাড়া চারিটী উপপত্নী রাখিতে পারে, ইহাও শাস্ত্রসঙ্গত। আবার বড় মানুষদিগের বাড়ীতে অনেক দাসী থাকে, দাসীদিগের গর্ভে যে সন্তান হয়, তাহারাও শাস্ত্র মতে উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। যে সে দাসী হইলে চলিবে না; যে দাসী উচিত মূল্য দিয়া কেনা হয়, বা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যায়, অথবা যুদ্ধে জয়ী হইয়া যাহাদিগকে লাভ করা যায়, তাহাদের গর্ব্ভস্থ সন্তানই উত্তরাধিকারী হইতে পারে। কেবল বড় লোকেরাই বহুবিবাহ করে, গরিব লোকে প্রায় করে না।

কোন ইংরাজ লেখক বেলুচি ও অফগানের এইরূপে পরস্পর তুলনা করিয়াছেন।—

"যুদ্ধ কালে বেলুচি ঘোড়া হইতে নামিয়া ঘোড়াটী একটা গোঁজের সঙ্গে বাঁধিয়া, তরোয়াল হাতে করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। পাঠানেরা দূর হইতে পাহাড়ের বা বৃক্ষের আড়ালে থাকিয়া, শত্রুকে গুলি করে, পার্য্যমানে শত্রুর নিকটবর্ত্তি হইয়া, হাতাহাতি যুদ্ধ করে না। বৈরনির্য্যাতন উদ্দেশ্য থাকিলে আফগান ঘুমন্ত শত্রুকেও বধ করিয়া থাকে। বেলুচি সম্মুখযুদ্ধে, সম্মুখ দিক হইতে, কিন্তু পাঠান পশ্চাদ্দিক হইতে লুকাইয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে ভাল বাসে।"

সিন্ধি।

সিন্ধু নদের ভাটির দিকে, একটী অঞ্চলে সিন্ধিদিগের বাস। ইহাদের দেশটী অযোধ্যা প্রদেশের দ্বিগুণ হইবে। দেশের অধিকাংশ অনুর্ব্বরা ও মরুভূমি মাত্র ; কেবল নদীর তীরবর্ত্তী ভূমিতে কৃষিকার্য্য হইয়া থাকে। এই দেশের বালুকাময় প্রান্তরে বালির রাশি পাহাড়ের ন্যায় ক্রমে উচ্চ হইয়া উঠিয়াছে, ঠিক যেন সমুদ্রের তরঙ্গমালা। এই দেশের লোকেরা বর্ণসঙ্কর, অর্থাৎ মিশ্রিত ; ইহাদের সংখ্যা ন্যূনাধিক ২,৫০,০০,০ হইবে।

ইহাদিগের ভাষাকেও সিন্ধি বলা যায়। পাঞ্জাবে এবং সিন্ধুদেশে প্রায় ৪০ লক্ষ লোকে এই ভাষা বলিয়া থাকে। এই ভাষার আদিম ভাব অনেকটা রহিয়া গিয়াছে, এই জন্য অন্যান্য আর্য্যভাষা অপেক্ষা এই ভাষা জটিল ও কঠিন। বিম্ সাহেব বলিয়াছেন, "হিন্দি ভাষাতে তিনটি সম্বন্ধ কারক ভাব আছে,

পাঞ্জাবিতে চারিটী, গুজরাটীতে নয়টী; কিন্তু সিন্ধি ভাষাতে ২০টী। ইহাতে চারিটী বিশেষ উচ্চারণ আছে, তাহা এদেশীয় অপর কোন ভাষায় নাই। দেশটী যেমন ভারতবর্ষের ও পারস্য দেশের মধ্যস্থলে, তেমনি সিন্ধু দেশের ভাষাও পারস্য ও ভারতবর্ষীয় ভাষার মধ্যবর্ত্তী।" এই ভাষাতে বিস্তর পুস্তক আছে। নানা অক্ষরে এই ভাষা লিখিত হইয়া থাকে। হিন্দুরা এক প্রকার দেশীয় অক্ষরের ব্যবহার করিয়া থাকে, কালক্রমে সেই অক্ষরের আকার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মুসলমানদের আমলে আরবি অক্ষরের প্রচলন হয়। আবার সিন্ধি উচ্চারণের অনুরোধে আরবি অক্ষর ছাড়া অনেক নূতন অক্ষরেরও যোগ হইয়াছে। আবার পাঞ্জাবী গুরুমুখী অক্ষরে সিন্ধি ভাষায় কতক পুস্তক লিখিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট এক প্রকার নাগরি অক্ষর প্রচলিত করিয়াছেন।

বর্টন সাহেব সিন্ধিজাতির নিম্নলিখিত বিবরণ লিখিয়াছেন, কিন্তু ইহা ৪০ বৎসর পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছিল। তৎপরে এই জাতীয় লোকের যে বিস্তর উন্নতি ও পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।—

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলের নিবাসী অপেক্ষা প্রকৃত সিন্ধি দীর্ঘাকার, বলবান্ ও হৃষ্টপুষ্ট। সিন্ধির আকৃতি সুগঠিত, মাথাটীর গঠনও ভাল; নীচা কপাল ও অনিবিড় কেশ ভারতবর্ষে প্রায়ই দেখা যায়, কিন্তু সিন্ধু দেশে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদিগের দাড়ি বড় চমৎকার—বিশেষ উচ্চ শ্রেণীস্থ লোকদিগের দাড়ি দেখিতে বড় সুন্দর; কিন্তু ইহাদিগের চরিত্র অতি কদর্য্য! বহুকাল ইহাদিগকে অতি বলবান্ ও ক্ষমতাশালী জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। তাহাদের এক প্রকার দাসত্ব করিতে হইয়াছে। আবার হিন্দু বেণে ও পোদ্দারের মুখ চাহিয়া থাকিতে হইয়াছে, তাহারাও ইহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া

লইয়া ইহাদিগকে হীনাবস্থায় রাখিয়াছে, বোধ হয়, এই কারণেই ইহাদের চরিত্র এত নীচ। এক্ষণে ইহাদের প্রধান উপজীবিকা কৃষিকার্য্য, মৎস্যধারণ, শিকার, এবং অশ্ব, উষ্ট্র ও মেষপালন।

সিন্ধি মুফ্‌তি।

ভারতবর্ষের লোকদিগের পোশাকে যেমন, সিন্ধিদিগের পোশাকে তেমন বাহার নাই, এ দেশের মুসলমানেরা আংটী ছাড়া সোনার গহনা বড় একটা পরে না। ইস্‌লাম ধর্ম্মের সে কালের রীতি অনুসারে প্রাচীন লোকেরা মাথার চুল কামাইয়া ফেলে; যুবকেরা লম্বা চুল ভাল বাসে, তাহা দুই ভাগ করিয়া, দুই কান্ধের উপর দিয়া ঝুলাইয়া দেয়, অথবা টিকি বাঁধিয়া তাহার উপর টুপি বা পাগড়ি পরে। ভারতবর্ষীয় ভদ্র মুসলমানদিগের ন্যায়

সিন্ধুদেশের মুসলমানেরাও দাড়ি পাকিলে কলপ দিয়া থাকেন; কলপ দিলে দাড়ি কতকটা লাল দেখায়। যুবকেরা মেন্দিপাতার রস দিয়া হাতের ও পায়ের তলা রাঙ্গা করিয়া থাকে। সিন্ধি-দিগের এক প্রকার চমৎকার টুপি আছে, তাহা দেখিতে অনেকটা ইংরাজদিগের সে কেলে বিভারের চামড়ার টুপির মত; বেলুচিরা যখন দেশের অধিপতি, তখন ঐ প্রকার টুপির প্রচলন হয়। এক্ষণে সকলেই এই প্রকার টুপির ব্যবহার করে, কেবল মোল্লারা মাথায় পাগড়ি দেন। উচ্চ জাতীয় এবং ধনবান্ লোকেরা গোল টুপি পরিয়া থাকেন। সাধারণ লোকে সাদা কাপড় বড় পরে না, নীল রঙ্গে ছোবান কাপড় পরিয়া থাকে; কারণ সাদা কাপড় শীঘ্র ময়লা হইয়া যায়; কতক লোকে, বিশেষতঃ, ফকি-রেরা, সবুজ রঙ্গে ছোবান কাপড় পরে।

ইহাদের ক্রীড়া কৌতুক নানা প্রকার; ছোট বড়, ধনী দরিদ্র, সকলেই ঘুড়ি উড়ায়। উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা বাজি ধরিয়া পায়রা উড়ায়। এদেশে নানা প্রকার ভাল ভাল পায়রা পাওয়া যায়। আফ্‌গানিস্থানের ন্যায় এদেশে বুল্‌বুল্ বা তুতি পাখির লড়াই হইয়া থাকে, ইহাতেও বাজি ধরা হয়। বালকেরা এই প্রকার পাখির লড়াই বড় ভাল বাসে। মোরগের লড়াই বড়ই প্রচলিত, মুসলমানেরা প্রায় সব শুক্রবারেই মোরগের লড়াই করিয়া থাকে। মেষের লড়াই বিলক্ষণ প্রচলিত, ভাল ভাল মেষের দাম ১৫ টাকারও অধিক।

ছেলে বুড়া, ধনী দরিদ্র; নরনারী সকলেই বাজি রাখিয়া খেলিতে বড় ভাল বাসে। বাজি রাখিতে যেমন ভাল বাসে, খেলা ভুলা করিতেও তেমনি ভাল বাসে। বাল্য কাল হইতেই ইহাদের এই অভ্যাস হয়। স্ত্রীলোকেরা সর্ব্বদাই বাজি ধরিয়া নানা প্রকার খেলা করে, ছেলেরা মায়ের কাছে কাছে থাকে, সুতরাং নানা প্রকার খেলা শিখিয়া ফেলে। সাত বৎসরের

ছেলে পাকা জুয়াড়ি হইয়া উঠে। সর্ব্বদা খেলিতে খেলিতে বালকেরা তাস, কুপন, কড়ি ও পয়সা খেলায় ওস্তাদ হইয়া উঠে, ফলে বালক বালিকারা সারা দিন এই করিয়াই বেড়ায়। বাজি না থাকিলেও সিন্ধিরা বড় আগ্রহ সহকারে খেলে। বাজি জিতিলে আনন্দে আটখানা, হারিলে বেজার মুখ। কেহই সততার সহিত খেলে না; কেবল ঠকাইবার ও ফাঁকি দিবার চেষ্টা, অনেক বাঙ্গালি যুবক যুবতী তাস খেলায় “চালাকি” করিয়া থাকেন, ফলে কিন্তু তাহা “প্রবঞ্চনা।” ইহাও পাপ। সিন্ধিরা খেলিতে খেলিতে বড় ঝগড়া করে।

ভারতবর্ষের পূর্ব্বাঞ্চলের লোক অপেক্ষা সিন্ধু দেশের স্ত্রীলোকেরা ফর্শা বটে, কিন্তু অঙ্গের গঠনে পূর্ব্বাঞ্চলের স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় লাবণ্য ও লালিত্য নাই, অতি অল্প স্ত্রীলোকে পড়িতে, তদপেক্ষা অল্প স্ত্রীলোকে লিখিতে পারে। কোরাণ পাঠ করা, অথচ অর্থ বুঝিতে না পারা বড় গুণপণা বলিয়া গণ্য; বড় বড় নগরে চার পাঁচ জন স্ত্রীলোকে যদি পারসি অক্ষরে কোবাণের কথা বানান করিতে পারে ত ঢের। মুসলমানদিগের মতে স্ত্রীলোকদিগকে লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া ভাল নহে; সিন্ধু দেশীয় মুসলমানেরা এই কুসংস্কারের বিলক্ষণ পোষক। সকলেরই মত এই যে, স্ত্রীলোকেরা একেই ত অত্যন্ত চালাক, ও দুষ্টবুদ্ধি, তাহার উপর যদি আবার লেখা পড়া শিখান যায়, তাহা হইলে ত তাহারা রাত্রিকে দিন ও দিনকে রাত্রি করিয়া তুলিবে। সুতরাং তাহাদিগকে কলমরূপ অস্ত্র চালনা শিক্ষা দেওয়া কোন মতে উচিত নহে। সিন্ধি স্ত্রীলোকেরা ভারতবর্ষীয় স্ত্রীলোকদিগের মত কোমলপ্রকৃতি ও সুশীলা ও পারস্য দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় প্রফুল্লমতি নহে।

সিন্ধু দেশীয় স্ত্রীলোকেরা খোসামোদ বড় ভাল বাসে; খোসামোদ চ্ছলে নিতান্ত অসম্ভব ও অসঙ্গত কথা বলিলেও ইহারা

আহ্লাদে আটখানা হয়। ইহাদের প্রধান গহনা হাতির দাঁতের চুড়ি। এই চুড়ি ইহারা ডাহিন হাতে পরে। এ দেশীয় মুসলমান স্ত্রীলোকেরা যেমন অনেক গুলি গালার চুড়ি পরিয়া থাকে, ইহারাও তেমনি করিয়া হাত ভরা গজদন্তের চুড়ি পরে। সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকের হাতেই অল্প বিস্তর চুড়ি আছে। সকল স্ত্রীলোকেই তামাক খায়, আবার অনেকে নস্যও নেয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় রমণীদিগের ন্যায় "দোক্‌তা" খায় না।

পূর্ব্ব-বাঙ্গালার ন্যায় সিন্ধু দেশের বারো আনা অধিবাসী মুসলমান। ১৮.৯ সালে এদেশে কেবল ২০টী গবর্ণমেণ্ট স্কুল, কিন্তু, ১৮৮৪ সালে ৩৪০টী ছিল। ছাত্র সংখা ২৩,২৭৩।

১৮৮৮ সালে কেবল ১৩ খানা পুস্তক রেজিষ্টারি হয়, ইহার ১১ খানা আরবি ও ২ খানা হিন্দি অক্ষরে লিখিত। করাচি ও হায়দ্রাবাদে মিশনরিরা স্কুল খুলিয়া সিন্ধুদেশীয় বালকবালিকাদিগকে বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন। অনেকে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

সিন্ধুদেশের ক্রমশঃই উন্নতি হইতেছে। করাচি ত এক্ষণে ভারতবর্ষের প্রকাণ্ড বন্দর।

কচ্ছদেশীয় লোক।

কচ্ছ শব্দের অর্থ সমুদ্রকূলবর্ত্তী ভূভাগ। দেশটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, কচ্ছ নামে যে উপসাগর আছে, তাহার উত্তর দিকে স্থাপিত; এবং এই দেশ ও সিন্ধু দেশের মধ্যস্থলে অগভীর লোণা বাদা বা হ্রদ আছে, তাহাকে লোকে সচরাচর বাণ বলে, ইহা অরণ্য শব্দের অপভ্রংশ। ইহার ক্ষেত্র পরিমাণ ৩০০০ হাজার ক্রোশ, নিবাসি সংখ্যা ন্যূনাধিক পাঁচ লক্ষ। রাজধানীর নাম "ভুজ।" দেশের রাজাকে "রাও" বলে। বোধ হয়, ইহাও রাজা শব্দের অপভ্রংশ।

দেশের উত্তর ও পূর্ব্ব দিকে প্রকাণ্ড লবণ-অরণ্য বা লোণা-মরুভূমি আছে, পরিমাণে তাহা দেশের অর্দ্ধেকের বেশি। লোকের বিশ্বাস এই যে, এই লোণা বাদা এক সময়ে সমুদ্র ছিল। ভূমিকম্প দ্বারা উচ্চ হইয়া উঠিয়া সমুদ্র হইতে পৃথক হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে এই বাদা কেবল বালিময়, বর্ষাকালে জলে ডুবিয়া যায়, অন্য সময়ে জল থাকে না। ইহার মধ্যে২ আবার কয়েকটা দ্বীপ আছে। এই বাদায় জন-মনুষ্য নাই। ক্বচিৎ কখনও এক আধটা পক্ষী, এক পাল বন্য গাধা, বা এক দল ব্যাপারী যাইতে দেখা যায়।

পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে দুটী পর্ব্বতমালা গিয়াছে। দেশটী সচরাচর অনুর্ব্বর। তবে উর্ব্বরা ভূমিও আছে, তাহাতে নানা শস্য ও কাপাস জন্মে। দেশের ভাষাকেও কচ্ছ বলা যায়, সিন্ধি ও গুজরতী ভাষার সম্মিলনে এই ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। সাধারণ কথোপকথনে এই ভাষার ব্যবহার হয়, সাহিত্যে ও বিষয়-কর্ম্মে গুজরতী ভাষাই প্রচলিত।

দেশটী এক টেরে। দেশের লোকও যে বড় মিশুক, তাহা নহে; আবার দেশের রাজাকে প্রজারা পিতার ন্যায় ভক্তি করে। এই কারণে কচ্ছদেশের লোককে এক স্বতন্ত্র জাতি বলা উচিত। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মধ্যে আর কোন সামন্তরাজ্য নাই, যাহার নিবাসিদিগকে স্বতন্ত্র জাতি বলা সঙ্গত।

বোধ হয়, কচ্ছ দেশের অধিকাংশ নিবাসী রাজপুতানা ও সিন্ধু দেশ হইতে আসিয়াছে। এই দেশে "জারেজা" নামে এক জাতীয় রাজপুত আছে, দেশের রাজা এই বংশীয়। ইহারা আপনাদিগকে কৃষ্ণের সন্তান, অর্থাৎ যদুবংশীয় বলে। ইহাদের সমাজে শিশু হত্যার নিতান্ত প্রাদুর্ভাব ছিল। জন্ম মাত্রেই ইহারা কন্যা সন্তান মারিয়া ফেলিত। লোকে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের এই কারণ দেয়;—এক সময়ে দেশের অতি ক্ষমতাশালী

কোন রাজার এক অতি পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল। রাজকন্যা যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলে, রাজা ঘটক ঠাকুরকে একটী সুপাত্র দেখিতে বলিলেন। ঘটক দেশ দেশান্তর খুঁজিয়াও সুপাত্র পাইলেন না; দুঃখিত মনে দেশে ফিরিয়া আইলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া রাজাকে পরামর্শ দিলেন যে, অবিবাহিতা কন্যা গৃহে থাকিলে অপমানের এক শেষ হইবে, অথচ যোগ্য পাত্রও খুঁজিয়া পাওয়া গেল না, অতএব কন্যাটীকে বধ করা শ্রেয়ঃ। রাজা বলিলেন, এ যে মহাপাপ! ব্রাহ্মণ কহিলেন, আচ্ছা, এ পাপের ভাগী আমি। অনন্তর কন্যাটীকে বধ করা হইল। সেই হইতে জারেজা রাজপুতেরা কন্যাসন্তান মারিয়া ফেলিত। স্বার্থপরতা ও অহঙ্কার এই মহাপাপের মূল ছিল। এখন আর ইহা হইবার যো নাই।

অনেকেই অহিফেণ খাওয়াইয়া মেয়েগুলিকে মারিয়া ফেলিত, অন্যত্র অযত্নে অনেক বালিকার প্রাণ যাইত। কেহ যদি কোন জারেজা রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিত, "এবার কি সন্তান হইয়াছে?" পুত্র সন্তান হইলে আনন্দসহকারে তাহা বলিত। মেয়ে হইলে মুখ ভারী করিয়া বলিত, "কিছুই না।" ইহাতেই বুঝা যাইত, কি হইয়াছে। ১৮০৯ শালে কর্ণেল ওয়াকর বরোদার রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনি জারেজা রাজপুতদিগকে এই নিষ্ঠুর রীতি উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করেন। জোনাথন ডন্‌কান্ তৎকালে বোম্বাইর গবর্ণর ছিলেন। তিনিও বিস্তর চেষ্টা করেন। অবশেষে অনেক বুঝাইয়া দিবার পর জারেজা রাজপুত দলপতিরা বালিকাহত্যা নিবারণ করিতে স্বীকৃত হয়েন। ১৮৪২ শালে জারেজা জাতিতে ৮ জন বালকের স্থলে ১ জন বালিকা ছিল। ১৮৮১ শালে প্রতি ২॥ জন বালকের স্থলে ১ জন করিয়া বালিকা পাওয়া যায়। এখনও কন্যা সন্তান হইলে লোকে বড় অসন্তুষ্ট হয়।

জৈন ধৰ্ম্মাবলম্বী।

জৈন নামে এদেশে এক ধৰ্ম্ম সম্প্রদায় আছে। মাড়বারি-দিগের বিবরণে ইহাদের কথা অনেকটা বলিয়াছি। ভারতবর্ষের পশ্চিমাংশে ইহাদের সংখ্যা বিস্তর, অতএব ইহাদের বিষয়ে আরো কিছু বলা আবশ্যক।

গুজরতী ভাষায় ইহাদিগকে“শ্রাবক” অর্থাৎশ্রোতা বা শ্রবণ-কারী বলা যায়। বঙ্গদেশে ইহাদগকে কেঁয়ে, অর্থাৎ ঝগড়াটে বলে। বঙ্গদেশের পুরাতন রাজধানী মুরশীদাবাদের নিকটবর্ত্তী আজিমগঞ্জ ও জিয়াগঞ্জ নগরে বিস্তর কেঁয়ের বাস।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় ইহারা ২৪ জন জিন কল্পনা করিয়া লই-য়াছে। জিনদিগকে আবার তীর্থঙ্কর বলে। ইহাঁরা জৈনদিগের গুরু এবং শিক্ষক। ইহঁারা পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করত লোক-দিগকে মুক্তিমার্গের শিক্ষা দিয়া নির্ব্বাণমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। শেষ দুই তীর্থঙ্করের নাম পরেশনাথ এবং মহাবীর। ইহাদের দুই সম্প্রদায়; এক দলের নাম “শ্বেতাম্বর”, অপর দলের নাম “দিগম্বর”। জৈনদিগের বিশ্বাস এই যে, শেষ তীর্থঙ্করদ্বয় হইতেই উক্ত দুই নামের আরম্ভ হইয়াছে। পরেশনাথ একখানি শাদা চাদর গায়ে দিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু মহাবীর সম্পূর্ণ উলঙ্গ থাকি-তেন। এক্ষণে দিগম্বর সম্প্রদায়স্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহারা একটু নিষ্ঠাবান, কেবল তাহারাই আহারের সময়ে উলঙ্গ হইয়া আহার করে। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মতের বিস্তর ভিন্নতা; মুল-শিক্ষা ও অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ৭০০ বিষয়ে মতান্তর। এ সকলই অতি সামান্য বিষয়। তবে জৈনেরা নিজেরা স্বীকার করে যে, কেবল ৮৪ টী বিষয় অতি সামান্য।

বৌদ্ধদিগের ন্যায় জৈনেরা নিরীশ্বরবাদী। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কোন জৈন মঠের প্রধান উদাসীন প্রকাশ্যরূপে বলিয়াছিলেন,

সমস্ত পৃথিবীর লোকে মিলিয়াও প্রমাণ করিয়া দিতে পারিবে না যে, এই জগতের এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন।

প্রাণীহত্যা না করাই ইহাদিগের ধর্ম্মের প্রধান মূলশিক্ষা। জৈনেরা দেশের নানা স্থানে পিঞ্জরপোল করিয়া দিয়াছে। এই প্রকার স্থানে জৈনদিগের ব্যয়ে বৃদ্ধ গো, মেষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদি সযত্নে রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইয়া থাকে। ইঁহাদের বিবেচনায় মানুষের প্রাণ অপেক্ষা গোরু, ঘোড়া, কুকুর বিড়াল ও পোকা মাকড়ের প্রাণ বহুমূল্য। অনাহারে, বা পীড়ায় যদি একটা মানুষ রাস্তাঘাটে পড়িয়া থাকে, অবশেষে মরিয়াও যায়, জৈনেরা তাহাকে দেখিয়াও দেখে না; কিন্তু পীড়িত বা বিপন্ন পশু পক্ষীর প্রাণ রক্ষা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কাথিবার রাজ্য ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হাতে গেলে জৈনেরা স্থির করিয়াছিল যে, ব্রিটিশ পল্টনের আহারের জন্য গো মেষ বধ করিতে দেওয়া হইবে না, অথচ এই "দয়ালু" জাতির মধ্যে পুরুষানুক্রমে শিশু কন্যা হত্যা বরাবর চলিয়া আসিতেছিল। তাহা রহিত করণার্থ কোন জৈন কখনও চেষ্টা করে নাই। এই কন্যা-হত্যা-কারিরা আবার এমন দয়ালু যে, পশু-পক্ষীর প্রাণ রক্ষার্থ পিঞ্জরপোল করিয়া দেয়।

বৃষ্টি হইলে বাহিরে বসিয়া, বা অন্ধকারে আহার করা নিষেধ, পাছে অজ্ঞাতসারে কেহ মশা মাছি খাইয়া ফেলে। জল বা দুধ ইত্যাদি কোন জলীয় পদার্থ খোলা রাখিতে নাই, পাছে তাহাতে কীটাদি পড়িয়া ডুবিয়া মরে। জৈনেরা মুখ বন্ধ করিয়া চলে, পাছে বাতাসে কোন পতঙ্গ উড়াইয়া আনিয়া মুখের ভিতর ফেলে। উদাসীনেরা ঝাঁটা হাতে করিয়া চলে, সম্মুখে পোকা মাকড় দেখিলে সাবধানে ঝাঁটি দিয়া সরাইয়া দেয়। কোন স্থানে আসন পাতিয়া বসিতে হইলে আগে ঝাঁটি দিয়া লয়। ইহারা সর্ব্বদা একখণ্ড পাতলা কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া চলে।

ইহারা বিছানার ছারপোকা মারে না, বা ছারপোকা মারিয়া ফেলিবার জন্য বিছানা রৌদ্রেও দেয় না। ধনী জৈনেরা পয়সা দিয়া গরিব লোকদিগকে আনিয়া আপনাদের বিছানায় শুইতে দেয়; ইহাদের রক্ত খাইয়া পেট ভরিলে, কর্ত্তারা যখন শুইতে যান, তখন আর তাঁহাদিগকে ছারপোকায় বড় একটা কামড়ায় না, সুতরাং সুখে নিদ্রা যাইতে পারেন।

এই সকল কাজ বড় পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া গণিত। ইহা করে বলিয়া জৈনেরা আপনাদিগকে অপরাপর ধর্ম্মাবলম্বী লোক অপেক্ষা বড় ধার্ম্মিক জ্ঞান করে। এ দিকে ইহাদিগের মত সুধ-খোর লোক ভারতবর্ষে আর নাই। সুধখোর বলিয়া এদেশের সুবর্ণ বনিকদিগের অপবাদ আছে, তাহাদের তবু দয়া মায়া আছে, কিন্তু ইহাদের তাহা নাই। ইহাদের কবলে কেহ এক বার পড়িলে আর তাহার রক্ষা নাই। তাহাকে জীয়ন্ত মহাজনের উদরস্থ হইতে হইবে।

তীর্থঙ্করদিগের নামে মন্দির প্রতিষ্ঠিত করা ইহাদের মতে বড় পুণ্যকর্ম্ম। কাথিবার প্রদেশে পালিতানার নিকটে শত্রুঞ্জয় নামে একটী পর্ব্বত আছে, এই পর্ব্বতময় কেবল জৈন মন্দির। কতক মন্দির প্রস্তর নির্ম্মিত, কতক মারবেল পাথরের। প্রত্যেক মন্দিরের মধ্যে কোন না কোন তীর্থ-ঙ্করের মূর্ত্তি স্থাপিত থাকে। তাহার সম্মুখে একটী রূপার দীপ জ্বলে। এই সকল মূর্ত্তির চক্ষু রূপার, তাহার উপরে কাচ বসাইয়া দেওয়া হইয়াছে, মন্দিরের ভিতর দিকে দৃষ্টি করিলে ঠিক বিড়ালের চক্ষের মত দেখায়। উৎসব সময় ছাড়া, এই স্থানে সতত যে অপূর্ব্ব নিস্তব্ধ ভাব বিরাজিত, তাহা বড় মনো-রম্য। কোন কোন দিন প্রাতঃকালে অনুচ্চ ঘণ্টার বা ঢোলের বাদ্য দুই এক বার কাণে আইসে; কিন্তু তাহার পরে সমস্ত দিনই নিস্তব্ধ ভাব, কেবল পায়রার পাল এক মন্দিরের চূড়া

হইতে অপর মন্দিরের চূড়ায় উড়িয়া গেলে সন্ সন্ শব্দ হইয়া থাকে। কাঠবিড়াল এবং টীয়াপাখীও বিস্তর, মধ্যে ২ ময়ূরও দেখিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতার বড় বাজারে অনেক ধনবান কেঁয়ে আছেন। ইহাঁদের অনেকের কুঠীতে কিন্তু সিন্দূরে অঙ্কিত গণেষমূর্ত্তি থাকে।

গুজরতী।

অনূ্যন এক কোটি লোকে গুজরতী ভাষা বলে। কাম্বে উপসাগরের আশে পাশে যে সকল জিলা আছে, সেই সকলেতে গুজরতিদের বাস। এই প্রদেশ দিয়া তাপ্তি, নর্ম্মদা ও অন্যান্য নদী প্রবাহিত। গুজরাতের অধিকাংশ ভূমি বড় উর্ব্বরা, এই কারণে ইহাকে ভারতবর্ষের "উদ্যান" বলা হয়। কালো মাটীতে কাপাসই বেশীর ভাগ জন্মে। বাজরাই এ দেশের প্রধান শস্য। উত্তরাঞ্চলের গোরু অতি চমৎকার।

গুজরতী। **GUJERATI.** (*Western India.*)

કેમકે દેવે જગત પર એવડી પ્રીતિ કિધી, કે તેણે પોતાનો એકાકીજનિત પુત્ર એ સાંરૂ આપો કે, જે કોઈ તે પર વિશ્વાસ કરે તેનો નાશ ન થાએ, પણ અનંત જીવન પામે.

গুজরতী ভাষা কতকটা হিন্দির মতন, কিন্তু ইহাতে হিন্দি অপেক্ষা পারসি শব্দের অধিক ব্যবহার হইয়া থাকে। অক্ষর-গুলি নাগরি, কিন্তু মাত্রা নাই।

নিবাসী।—গুজরাতের ব্রাহ্মণদিগের অধিকাংশই গুজার, ইহাঁরা দ্রাবড়ায় পঞ্চম শ্রেণীভুক্ত। ইহাঁদের ৮৪ গোষ্ঠী। বঙ্গদেশের কায়স্থদিগের ন্যায় গুজরতী ব্রাহ্মণদের অনেকেই সরকারি কার্য্য করিয়া থাকেন। অনেকে যাজনকার্য্যে নিযুক্ত, অনেকে গ্রামের মোড়ল, আবার অনেকে কৃষিকার্য্যও করিয়া থাকেন।

এ প্রদেশে নানা শ্রেণীর রাজপুতও আছে; কাথিবার প্রায়দ্বীপেই অনেক রাজপুত বাস করে। জারেজা রাজপুতেরা মদ্যপান ও মাংসভোজন করিয়া থাকে। কেবল গোমাংস খায় না, নহিলে প্রায় সকল সুখাদ্য মাংসই খাইয়া থাকে। পুরোহিতকে ইহারা বড় মান্য দেয় না, কেহ মরিলে বারো দিনের দিন তাহার শ্রাদ্ধ হয়, শ্রাদ্ধকালে এক খানি নূতন খাটিয়ায় পুরোহিত ঠাকুরকে শোয়াইয়া দেওয়া হয়। অনন্তর লোকের যেমন মৃত মানুষ সংকার্য্যের জন্য বহিয়া লইয়া যায়, সেইরূপে পুরোহিত ঠাকুরকে খাটিয়ায় করিয়া শ্মশানে লইয়া যায়। প্রকৃত মৃত ব্যক্তির আত্মীয়েরা খাটিয়ার পশ্চাৎ২ চলে। অবশেষে লোকে খাটিয়াস্থ পুরোহিত ঠাকুরকে ঢিল মারিতে আরম্ভ করে, তখন প্রাণভয়ে পুরোহিত বেচারা প্রাণপণে দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। এ প্রকার করাতে ভূত-প্রেত চলিয়া যায়। অন্যান্য জাতীয় লোকেরাও ইহাদের দেখাদেখি এই প্রকারে ভূত তাড়াইয়া থাকে।

কচ্ছ দেশের জারেজা রাজপুতদিগের ন্যায় ইহারাও অধিকাংশ কন্যাসন্তান মারিয়া ফেলিত, কিন্তু ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

কোন কোন জাতীয় লোক কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহারা বিলক্ষণ পরিশ্রমী, ভাল কাপড় পরে, এবং তাহাদের বাসগৃহও ভাল। এক শ্রেণীর কুন্‌বি জাতীয় লোকের বিবাহ, বৎসরের মধ্যে, কেবল এক নির্দ্দিষ্ট দিনে হইয়া

থাকে, অপর দিনে হইতে পারে না। কুন্‌বিরা স্বাধীনতা বড় ভাল বাসে। নিম্ন লিখিত প্রবাদগুলিই তাহার প্রমাণ,—"যে যেখানে বজ্র-ধ্বনি হয়, সেই খানেই কুন্‌বি জমিদার," "কুন্‌বির পিছনে ক্রোড় লোক চলে, কিন্তু কুন্‌বি কাহারও পিছনে যায় না।"

এ দেশে জৈনদিগকে "বেণে" বলে। নিরুপায় কৃষকেরা টাকা ধার করিয়া ইহাদের গোলাম হইয়া পড়ে। তবে ভদ্র কেঁয়েও আছে।

ধির নামে আর জাতীয় লোক আছে, গুজরাতের সর্ব্বত্রেই ইহাদের বাস। ইহাদের সংখ্যাও অনেক। ইহারা পথিকদিগের জিনিষপত্র বহিয়া লইয়া যায়, পল্লীগ্রামের ভদ্র লোকের বাটীতে ইহারাই ঝাঁটি দেয়, এবং মধ্যে মধ্যে গ্রাম্য চৌকিদারের কাজও করিয়া থাকে। কিন্তু সুতা-কাটা ও তাঁত-বোনা ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা হিন্দু, কিন্তু অতিশয় নীচ জাতীয়; তথাপি উচ্চ জাতীয় হিন্দুর ন্যায় শাস্ত্রীয় ও সামাজিক রীতি নীতি পালন করিতে বাধ্য। গুজরাতে ইহাদের বিষয়ে নিম্ন লিখিত গল্প লোকে বলিয়া থাকে।—

একদা কোন মুসলমান নবাব স্বীয় হিন্দু মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ জাতি সকলের অপেক্ষা নীচ? মন্ত্রী কহিলেন, এ বড় শক্ত কথা, কয়েক দিন পরে উত্তর দিব। নবাব ইহাতে সম্মত হইলে মন্ত্রী ধির জাতীয় লোকদিগের গ্রামে গিয়া, প্রধান প্রধান লোককে ডাকাইয়া বলিলেন, "বাদশা তোমাদের উপর বড় রাগ করিয়াছেন, এই জন্য তোমাদিগকে মুসলমান করিতে চাহেন।" এই কথা শুনিয়া উহাদের বড় ভয় হইল, অনন্তর সকলে মিলিয়া নবাব-বাড়ীর দ্বারে গিয়া, যথাবিহিত দূরে দাঁড়াইয়া, যথাসাধ্য উচ্চ শব্দে বলিতে লাগিল, "ধর্ম্মাবতার, যদি দোষ করিয়া থাকি, আর যে দণ্ড খুশি, তাই দিন, আমাদিগের জাতি নষ্ট করিবেন না। মারুন, কাটুন, ফাঁসি দিন, যাহা হুজুরের ইচ্ছা

হয়, তাহাই করুন, কিন্তু আপনকার এ গোলামদিগকে মুসলমান করিবেন না।” নবাব এই প্রকার কথা শুনিয়া হাসিলেন। মন্ত্রীবর অদূরে বসিয়া কাগজ পত্র দেখিতেছিলেন, এ সকল কথায় যেন তিনি কাণও দেন নাই। বাদশা তাঁহাকে কহিলেন, “তবে, উজির, মানিলাম, আমাদের জাতিই সকলের অপেক্ষা নীচ জাতি!”

ভাঙ্গী নামে এক জাতীয় হিন্দু আছে, ইহারা আমাদের দেশের ডোম। ইহারা ধির অপেক্ষাও নীচ জাতীয় বলিয়া গণ্য। ধিরেরা ইহাদের সহিত আহার ব্যবহার করে না, ঘর দ্বার ঝাঁটি দেওয়া ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা মরা জন্তুর মাংস খায়, ইহাদের ভাষা হিন্দুস্থানী, বোধ হয়, ইহারা হিন্দুস্থান হইতে গুজরাতে গিয়াছে।

ধর্ম্ম।—বড় লজ্জার বিষয় এই যে, অনেক গুজরতী, বল্লভী নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্ত, ইহারা আপনাদিগের প্রধান মোহন্তকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া মানে। স্ত্রী পুরুষ, বালক বলিকা, সকলে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাহার চরণতলে প্রণাম করে; ফুল, ফল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি উপহার দেয় এবং চামর দিয়া তাহাকে বাতাস করে। ইহাদিগকে লোকে সচরাচর মহারাজা বলে। মহারাজাদিগের রতিকামনার তৃপ্তি সাধন করিতে পারিলে মহাপুণ্য এবং তাহাতে স্বয়ং কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হওয়াতে ভক্তের বৈকুণ্ঠ-বাস হয়। “তন, মন, ধন,” সকলই মহারাজাদিগের চরণে সমর্পণ করিতে হয়। ধনী দরিদ্র সকল পরিবারেরই স্ত্রীলোকদিগকে বাল্যকাল হইতে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, মহারাজাকে রতিদান করিলে নিজের এবং পতি পুত্র ইত্যাদি সকলেরই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলসাধন হইয়া থাকে। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, যুবতীরা অকাতরে মহারাজারূপ কৃষ্ণের রাধিকার স্থানীয়া হয়। ১৮৬২ শালে বোম্বাই নগরে এক মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ পায় যে, লম্পটাচরণ দ্বারা এই প্রকার মহারাজাদের শরীর এবং স্বভাব,

উভয়ই নিতান্ত দূষিত হইয়া যায়, অথচ ইহাদেরই কামানলে আহুতি দিবার জন্য ধনকুবের গুজরতী মহাজনেরা আপনাদের যুবতী স্ত্রী ও কন্যাদিগকে অকাতরে বেশ্যাবৃত্তি করিতে দেন।

মহারাজারা কি কি বাবদে শিষ্যদিগের নিকট হইতে টাকা আদায় করেন, মিং মালাবারি তাহার এক তালিকা দিয়াছেন, তাহা এই।—

দর্শনী ৫; স্পর্শনী ২০; পাদপ্রক্ষালনী ৩৫; দোলানী ৪০; মহারাজের শ্রীঅঙ্গে চন্দন লেপনী ৪২; তাঁহার সহিত একাসনে বসিবার জন্য ৬০; তাঁহার শয়নগৃহে স্থান পাইবার জন্য ৫০, হইতে ৫০০; নৃত্য করিতে ২ তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করণার্থ ১০০, হইতে ২০০; মহারাজার অধরামৃতযুক্ত পান প্রসাদের জন্য ১৭; মহারাজা যে জলে স্নান করেন, বা যে জলে তাঁহার কাপড় কাচা যায়, সেই জল পান করণার্থ ১৯ টাকা।

এ সকল রেট ধনীদিগের জন্য, গরিব লোকে অল্প স্বল্প দিয়াই কাজ সারে। কি জঘন্য প্রথা!

গুজরাতের নানা স্থানে মিশনরিরা স্কুল স্থাপন করত মহাত্মা ইসার পবিত্র ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। ১৮৮১ শালে গুজরাতে ১৮৫২ জন গুজরতী খ্রীষ্টীয়ান ছিল। এক্ষণে ইহাদের সংখ্যা আরও বাড়িয়াছে। যেমন আগুনের সংস্পর্শে কয়লারও ময়লা দূর হয়, তেমনি খ্রীষ্টের শিক্ষা-প্রভাবে সমস্ত অপবিত্র ভাব দূর হইয়া গিয়া সকলই পবিত্র হয়।

সাহিত্য।—১৮৮৮ শালে ৪০৮ খানি গুজরতী ভাষার নানা প্রকার পুস্তক রেজিষ্টারি হইয়াছিল। ইহার ২৯৯ খানি নূতন, ৩১ খানি পুণর্মুদ্রিত, ৭৮ খানি অনুবাদিত। ইহার মধ্যে শতকরা ৮৪ খানি হিন্দুদের দ্বারা, শতকরা ৪ খানি মুসলমানদের ও ইউরোপীয়দিগের দ্বারা, এবং ১২ খানি পারসিদিগের দ্বারা লিখিত,

অনুবাদিত বা সম্পাদিত। যদিও গুজরতী সাহিত্য সম্পূর্ণ সন্তোষপ্রদ নহে, তথাপি ইহা যে মহারাষ্ট্রী সাহিত্য অপেক্ষা সুরুচিকর ও তৃপ্তিজনক, তাহা স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারা যায় না।

পারসি।

১৮৮১ শালে ভারতবর্ষীয় পারসিদিগের সংখ্যা ৮৫,০০০ ছিল। ইহারা পারস্য দেশ হইতে আসিয়াছে, এই কারণে ইহাদিগকে পারসি বলা যায়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে মুসলমানেরা পারস্য দেশ অধিকার করে, তৎকালে এই দেশের লোক অগ্নির উপাসক ছিল। অগ্নি দেবতার যে সকল মন্দির ছিল, মুসলমানেরা তাহা ভাঙ্গিয়া মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করে। এবং তাহাদের তরোয়ালের প্রভাবে দেশের প্রায় সকল লোকেই মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

তথাপি অনেকে ধর্ম্মরক্ষার জন্য দেশত্যাগ করিয়া বিদেশে চলিয়া যায়। কাম্বে উপসাগরে "দীউ" নামে একটী ছোট দ্বীপ আছে। পলায়িত পারসিরা প্রথমে এই দ্বীপে আসিয়া জাহাজ হইতে নামে। কিছু দিন এখানে থাকিয়া, ইহারা ৭১৭ খ্রীঃ অব্দে বোম্বাইয়ের উত্তর দিকে সঞ্জন নামক স্থানে চলিয়া যায়। এখানে গিয়া ইহারা গোরুর উপাসক বলিয়া পরিচয় দেওয়াতে তত্রত্য হিন্দু রাজা ইহাদিগকে দয়া করিয়া স্থান দেন। কিন্তু রাজার আদেশ ক্রমে তাহাদিগকে তদীয় দেশের ভাষায় কথা কহিতে ও কবচ এবং অস্ত্র ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কয়েক শতাব্দী কাল তাহারা হিন্দুদিগের সহিত শান্তিতে ও সুখে বাস করে। পারসিদিগের কেহ কেহ পরে মুসলমান নবাবদিগেরও অনুগ্রহভাজন হইয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে কতকগুলি পারসি বোম্বাই নগরে আসিয়া বসতি করে। ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দে লাউজি নামক জনৈক পারসির তত্ত্বাবধানে বোম্বাই নগরে ডক্ প্রস্তুত হয়। ইহাঁর বংশীয়েরা বহুকাল এই ডকের অধিকারী ছিলেন।

পারসিদিগের মুখাবয়ব অনেকাংশে আর্য্যদিগের ন্যায়, তবে বহুকাল ভারতবর্ষে বাস করাতে একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি ভারতবর্ষীয় পারসির চেহারায় অমিশ্র পারসিকের মুখাকৃতির অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্গদেশের মুসলমানদের ভাষাকে যেমন মুসলমানি বাঙ্গালা বলে, তেমনি পারসিদিগের ভাষাকে পারসি-গুজরতী বলে। এই ভাষাতে বিস্তর পারসি শব্দের ব্যবহার হয়। কলিকাতার ফিরিঙ্গিদিগের হিন্দুস্থানীতে যেমন মেলাই ইংরাজি কথা, পারসিদের গুজরতীতে তেমনি মেলাই পারসি কথা।

প্রসববেদনা উপস্থিত হইলেই পারসি নারীকে স্বতন্ত্র এক কুঠরীতে, প্রায়ই নীচের তলায়, যাইয়া সন্তান প্রসব করিতে হয়। প্রসূতি ৪০ দিন এই সূতিকা-গৃহে থাকিবার পর শুচি হইয়া পরিবারস্থ পাঁচ জনের সঙ্গে উঠিতে বসিতে পারে। সন্তানের জন্মতিথি নক্ষত্র ঠিক লিখিয়া রাখিয়া গণককে দেওয়া হয়। গণক ঠিকুজি প্রস্তুত করিয়া দেয়। সন্তান সাত বৎসরের হইলে, পুণ্য জামা ও তাগা পরে। এই তাগায় ৭২ খেই থাকে। ব্রাহ্মণদের পৈতায় নবগুণ, পারসিদের তাগায় ৭২ গুণ।

যখন গৃহে থাকে, তখন পারসি ভদ্র লোকে ঢিলা পা-জামা, মলমলের লম্বা পীরাণ, কোমরবন্ধ, টুপি পরেন। বাহিরে যাইতে হইলে লম্বা কোট (ইহাকে এক্ষণে পারসি কোট বলে) ও মাথায় ছোট টুপির উপরেই লম্বা টুপি পরেন। এ টুপিকেও লোকে পারসি টুপি বলে।

পারসি রমণীরা গৌরাঙ্গী—লাবণ্যময়ীও বটে। কিন্তু একখণ্ড

পারসি,—মিঃ এইচ. পি. কামা।

সাদা কাপড় দিয়া সমস্ত চুলসমেত মাথাটা বাঁধিয়া রাখাতে পারসি রমণীর রূপরাশির পূর্ণবিকাশ হয় না। ইহাঁরা শাড়ী পরেন, সে শাড়ী আমাদের ঢাকাই বা সিমলার শাড়ীর মতন ফিন্‌ফিনে নহে; পূর্ব্ববাংলার ভুনি নামক শাড়ীর মত পুরু। এই শাড়ী উড়িয়া শাড়ীর মত ১২ হাত লম্বা। ইহার পাইড়ে অনেক শিল্প কার্য্য। এক্ষণে বাঙ্গালি সুন্দরীরাও পারসি শাড়ীর অনুরাগিণী। হিন্দু নারীদিগের ন্যায় পারসি সুন্দরীরা অন্দর-মহলে আবদ্ধ থাকেন না, বা চেনা মানুষ দেখিলেই ঘোমটা টানিয়া দেন না। ইহাঁরা মাথায় কাপড় দেন বটে, কিন্তু ইংরাজ রমণীদিগের ন্যায় হাটে বাজারে যান, সভায় যান এবং চেনা লোক আসিলে অসঙ্কোচে আলাপ ও অভ্যর্থনা করিয়া থাকেন।

আচার ব্যবহারে পারসিরা কতক পরিমাণে ইংরেজ ও কতক বিষয়ে হিন্দু। ইহারা ক্রমেই সকল বিষয়ে উন্নতি লাভ করিতেছে। ইংরাজি আচার ব্যবহারের ইহারা খুব অনুকরণ করে।

ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট সভার প্রথম ভারতবর্ষীয় সভ্য পারসি, নাম দাদাভাই নওরোজি। ধনজি ভাই নামক এক জন পারসি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ইনি শেষে ইংলণ্ডের কোন মণ্ডলীর উপদেশকের পদে নিযুক্ত হইয়া স্বীয় পরিশ্রম ও ধর্ম্মভাবের গুণে সুখ্যাতি লাভ করেন। এক্ষণে ধনবান পারসিদিগের চাইল চলন ইংরাজদিগের মত, তাহাদের গৃহসজ্জাও ইংরাজদিগের মত দামী ও আহার ব্যবহার ইংরাজদিগের মত ব্যয়সাধ্য। কলিকাতার বড় মানুষদিগের ন্যায় বোম্বাইয়ে পারসিদিগের ও অন্য লোকের বাগান-বাড়ী আছে। কিন্তু পারসিদিগের বাগান-বাড়ীই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বৈঠকখানার সাজ সজ্জা অতি চমৎকার। রাত্রিকালে ধনবান পারসির বাড়ী আলোকের রাশি মাত্র। পূর্ব্বে ইহারা হিন্দুদিগের ন্যায় ঘরের মেঝেয় বসিয়া আহার করিত, এক্ষণে ঠিক ইংরাজদিগের মত টেবিলে আহার করে। উৎসব কালে অতি চমৎকাররূপে টেবিল সাজান হয়। পূর্ব্বে ইহারাও উৎসব কালে কলাপাতায় খাইত।

হিন্দুদিগের দেখাদেখি পারসি পুরুষেরা প্রথমে, শেষে স্ত্রীলোকেরা আহার করিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ একত্র আহারে বসিত না। এক্ষণে সুশিক্ষিত পারসিরা ইংরাজদিগের ন্যায় স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা, সকলে একসঙ্গে আহারে বসিয়া যায়। কলিকাতার বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ানেরাও এই রীতির অবলম্বন করিয়াছেন। পারসিদিগের অর্দ্ধেক লোক তেজারতি, দালালি, পোদ্দারি ইত্যাদি ব্যবসা দ্বারা যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করেন। বিষয় কর্ম্মে ইহারা বড় ঝানু। ইহারা এদেশের অন্যান্য জাতির সঙ্গে তুলনায় বিলক্ষণ ধনবান। পারসি সিবিলিয়ান, বারিষ্টার, ডাক্তার, কেরাণী

ইত্যাদিও আছে। রেলেওয়ে ষ্টেশনে অনেকে হোটেল করিয়া আছে। হিন্দুদের ন্যায় জাতিভেদরূপ শিকল পায়ে না থাকাতে ইহারা নানা দেশে বেড়াইয়া বাণিজ্য দ্বারা অগাধ ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকে।

বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে পারসিদিগের উদ্যোগ বিলক্ষণ। ইহারা যেমন ধনী, তেমনি দাতা। অনেক ধনবান লোকে পাপকর্ম্মে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া দরিদ্র ও অল্পায়ু হয়। কিন্তু পারসিরা তেমন করে না। মিং মালাবারি ভারতবর্ষের সমাজসংশোধনের জন্য প্রাণপণচেষ্টা করিতেছেন। ইনিও পারসি এবং সুচারু-রূপে শিক্ষিত।

অনেকে বলিয়া থাকেন, এক্ষণকার পারসি যুবকেরা পূর্ব্ব-পুরুষদিগের ন্যায় পরিমিতাচারী নহে। অনেক পারসি মদের দোকান করিয়াছেন। অনেকে থিয়েটরের দল করিয়াছেন, ইহাও সুলক্ষণ নহে। এই প্রকার অপ্রিয় ব্যবসায়ে পারসি যুবকদিগকে প্রবর্ত্তিত হইতে না দেওয়া প্রাচীন লোকদিগের কর্ত্তব্য।

ধর্ম্ম।—পারসিরা জরোস্তার বা জরথুস্ত্রার শিষ্য। ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের নাম আবেস্তা। ইহাতে একেশ্বরবাদ, দ্বৈতবাদ ও অদ্বৈতবাদ, এ সকলই পাওয়া যায়। কিন্তু শিক্ষিত পারসি মাত্রেই একেশ্বরবাদী। আবেস্তা শাস্ত্রের প্রধান দেবতার নাম "অহুর মজ্দা।" এই অহুর মজ্দা আর কেহ নহে, বেদের বরুণ-অহুর, অর্থাৎ বরুণ দেবতা। জেন্দ ভাষায় অসুরকে অহুর বলে, অর্থ প্রভু; মজ্দা অর্থে সর্ব্বজ্ঞ; পরে অহ্রিমাণ (অনিষ্টকর) নামে আর এক দেবতার অবতারণা হয়। অহুর ও অহ্রিমাণ, এই দুই জনে সর্ব্বদাই লড়াই করিতেন।

পারসিরা অগ্নিকে বড় মান্য করে, এই জন্য ইহাদিগকে অগ্ন্যোপাসকও বলা যায়। ইহাদের ধর্ম্মমন্দিরে দিবারাত্র আগুন
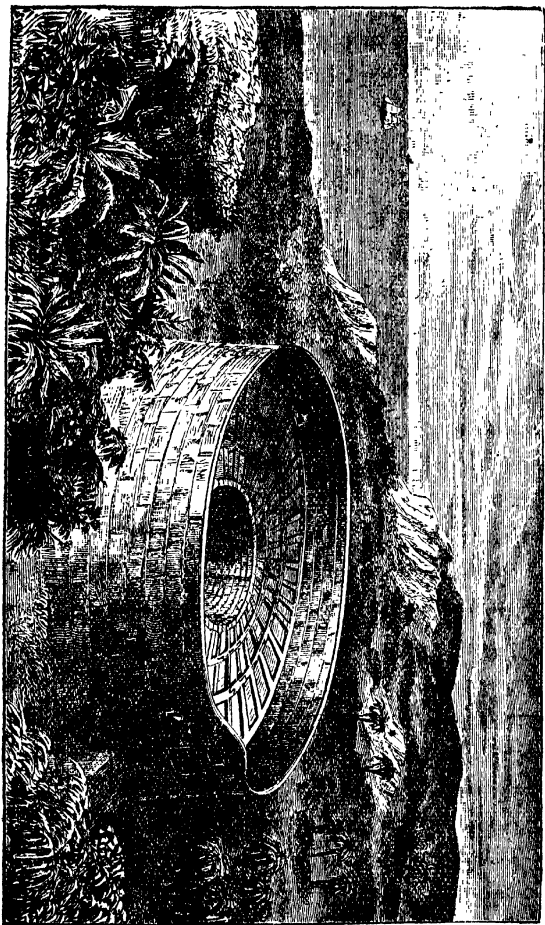
জ্বলে। আগুনের পরেই জলের বড় মান। কোন অপবিত্র জিনিসই ইহারা জলে ফেলে না। হিন্দুদিগের ন্যায় ইহারা গো-চনার বড় আদর করে। গো-চনাকে ইহারা "নিরঙ্গ" বলে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে একটু গো-চনা চাই। হিন্দুরা যেমন গঙ্গা-জল স্পর্শ করে, গায়ে মাথায় ছড়াইয়া দেয়, ইহারাও গো-চনা দিয়া তাই করে। কোন কোন সুরাও ইহাদের মতে পবিত্র, এবং বিশেষ পবিত্রীকৃত হইতে হইলে সেই বিশেষ সুরা পান করিতে হয়।

আবেস্তা গ্রন্থে লেখা আছে যে, লোকে মরা মানুষ মাটিতে পুতিয়া রাখে বলিয়া, বসুমতী বড় দুঃখ করিয়া থাকেন। কেহ মরিলে পারসিরা মৃতদেহ দাহ করে না, অথবা মাটিতে পুতিয়াও রাখে না। একটা গোল ঘর আছে, তাহার ছাদ নাই। পারসিরা মৃত দেহ তাহার মধ্যে রাখিয়া দেয়। শকুনিরা নামিয়া আসিয়া খাইয়া ফেলে। সর্ব্বদাই এই গোলঘরের প্রাচীরের উপরে কতকগুলি শকুনী বসিয়া থাকে। নীচের দিকে তাকাইয়া দেখে, শব রাখা হইল কি না। দেহ আনীত হইলেই শকুনিরা নামিয়া গিয়া খাইতে আরম্ভ করে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শেষ করিয়া দিয়া, আবার গিয়া যথাস্থানে বৈসে।

মহারাষ্ট্রী।

মহারাষ্ট্র অর্থে, বোধ হয়, মহার নামক আদিম জাতীয় লোক-দিগের দেশ বুঝায়; যেমন গুজরাষ্ট্র বলিতে গেলে গুজার জাতীয় লোকের দেশ বুঝিতে হয়। মহারাষ্ট্র দেশটী ত্রিকোণ—কিন্তু আবার ঠিক ত্রিকোণও নহে। ইহার পশ্চিমে আরব-সাগর ও গুজরাত, দক্ষিণ সীমানা পর্ত্তুগিজদিগের গোয়া, উত্তর সীমানা দামুন। সমুদ্র ও পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী অপ্রশস্ত ভূমি-

খণ্ডের নাম কঙ্কণ। এই ভূমি-খণ্ড দৈর্ঘ্যে ২০ ক্রোশ। দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকাভূমি ঘাট পর্ব্বত হইতে পূর্ব্বদিকে বিস্তৃত হইয়া গিয়াছে।

মহারাষ্ট্র দেশের ভূমির পরিমাণ ৫৫ হাজার বর্গ ক্রোশ। ১৮৮১ শালে দেশের লোকসংখ্যা এক কোটী সত্তর লক্ষ ছিল।

ভাষা।—ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বিম্ সাহেব বলেন, গুজরতী ভাষার ন্যায় মহারাষ্ট্রী ভাষার গঠনপ্রণালী অন্যান্য ভাষা অপেক্ষা বড় জটিল। হিন্দির পরে ইহার মত সুন্দর ও মধুর ভাষা আর নাই। এই ভাষার প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ কথা অন্যান্য ভাষা হইতে গৃহীত। ইহাতে আরবি, পারসি, ও সংস্কৃত শব্দও অনেক আছে। কঙ্কণ প্রদেশে কঙ্কণী নামে যে ভাষার প্রচলন আছে, তাহা মূল ভাষা নহে, মহারাষ্ট্রী ভাষার রূপান্তর মাত্র। পুস্তকের অক্ষর নাগরি, তবে একটু অন্য আকারের। এই অক্ষরকে সচারচর বালবোধ বলা হয়। সাধারণ বিষয় কর্ম্মের লেখাপড়ায় যে অক্ষর ব্যবহৃত হয়, তাহাকে "মুদি" বলে।

নিবাসী। মহারাষ্ট্রী লোকেরা খর্ব্বকায়, কিন্তু পরিশ্রমী ও ক্লেশসহিষ্ণু। মহারাষ্ট্রীয়েরা শিখদিগের মত এক থান কাপড় মাথায় জড়ায়। ভারতবর্ষের উত্তরাঞ্চলেই মুসলমানদের নিতান্ত প্রাদুর্ভাব ছিল,কিন্তু মহারাষ্ট্র দেশে তেমন ছিল না। এই জন্য অন্যান্য দেশীয় হিন্দু রমণী অপেক্ষা মহারাষ্ট্রীয়া নারী অপেক্ষাকৃত স্বাধীনা। ইহারা ঘোমটা দেয় না, স্বাধীন ভাবে পথে ঘাটে চলে।

মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণেরা রাজনীতিতে বিলক্ষণ পণ্ডিত। রাজ্যশাসন বিষয়ে ইহাঁদের বিলক্ষণ নিপুণতা আছে। বারাণসী ধামেও ইহাঁদের বড় মান।

মহারাষ্ট্রীয় রাজাদিগের মন্ত্রী মাহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ; বঙ্গদেশে কায়স্থেরা যেমন বিষয় কর্ম্ম-সংক্রান্ত লেখা পড়ায় পটু,

মহারাষ্ট্রী।

মহারাষ্ট্র দেশে ব্রাহ্মণেরাও তেমনি। ভিন্নতা এই, বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণেরা শূদ্র বলিয়া শাস্ত্রালোচনা করিতে পারেন না, ব্রাহ্মণদিগের সে বিষয়ে কোন বাধা নাই। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমে মহারাষ্ট্র ক্ষত্রিয় রাজাদিগের মন্ত্রিত্ব করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন ; কিন্তু শেষে তাঁহারা পেশোয়া নাম ধরিয়া আপনারাই সিংহাসন অধিকার করেন, এবং সৈন্যসামন্তেরও অধিনায়ক হইয়া প্রকাশ্য

রূপেই রাজ্যের শাসন করিয়াছিলেন। ইহাঁরাই মহারাষ্ট্রীয় জাতির মস্তকস্বরূপ ছিলেন, আর সকলে অঙ্গপ্রত্যঙ্গস্বরূপ ছিল। ব্রাহ্মণেরাই আর সকলকে চালাইতেন।

মহারাষ্ট্র দেশের কৃষকদিগকে কুন্‌বি বলে। ইহারাই উত্তর-ভারতে কুর্ম্মি নামে পরিচিত। ব্রাহ্মণেরা যদিও ইহাদিগকে শূদ্র বলিয়া হেয় জ্ঞান করেন, তথাপি ইহারা আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বা রাজপুতদিগের সমপদস্থ বলিয়া মানে। বলিতে গেলে, ইহারাই প্রকৃত মহারাষ্ট্রী। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুরা ২০০ শত জাতিতে বিভক্ত; ব্রাহ্মণ জাতিতে ৩১টা শ্রেণী আছে। স্বর্ণকার, কাংস্যকার ইত্যাদি জাতীয় লোকেরাই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের পরে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। বঙ্গদেশের বিপরীত; বঙ্গদেশে ইহারা নবশাখ, স্বর্ণকার আবার তাহাও নহে।

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিবজির প্রাদুর্ভাব হয়। মুসলমানদিগের দ্বারা দাক্ষিণাত্য অধিকৃত হইবার পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয়দিগের যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব ছিল, শিবজির বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে তাহারা পুনরায় তাহা লাভ করে। দুর্গমধ্যেই শিবজির জন্ম হয়, দুর্গমধ্যে থাকাতেই তাঁহার মহত্বলাভ হয়, আবার দুর্গমধ্যেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আরঙ্গজিব রাগ করিয়া তাঁহাকে "পাহাড়িয়া ইন্দুর" বলিতেন।

"গোব্রাহ্মণের রক্ষা," ইহাই শিবজির বীজমন্ত্র ছিল। ইহা ছাড়া সৈন্যসামন্তদিগকে লুঠলব্ধ দ্রব্যের অংশ দিতেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা ভারতবর্ষে যে লোমহর্ষণ অত্যাচার করিয়াছে, লর্ড মেকলে তাহার অতি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই;—

"ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলস্থ পর্ব্বতময় দেশ হইতে আর এক জাতীয় পরাক্রমী লোক আসিয়া পড়িল, ইহাদের ভয়ে বহুকাল রাজারা ভীত ছিলেন। কেবল ইংলণ্ডের প্রতিভার চরণতলে ইহাদিগকে নতশির হইতে হইল। আরঙ্গজিব বাদশার রাজত্ব

কালে এই পশুস্বভাব দস্যুরা সর্ব্বপ্রথমে আপনাদের পর্ব্বতাবাস হইতে নামিয়া আইসে। আরঙ্গজিবের মৃত্যুর পর অল্প কাল মধ্যেই তদীয় বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র প্রজারা মহারাষ্ট্রীয়দিগের নাম শুনিলেই কাঁপিয়া উঠিত।*

দিল্লীর অধান অনেক সমৃদ্ধিশালিনী "শুবা" সম্পূর্ণরূপে মহারাষ্ট্রীয়েরা অধিকার করিয়াছিল। ভারত-উপদ্বীপের এক সমুদ্র হইতে অপর সমুদ্র পর্য্যন্ত তাহাদিগের অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। মহারাষ্ট্র সেনাপতিরা পুনা, গোয়ালিয়র, গুজরাত, বেরার এবং তাঞ্জোর, এই সকল দেশ শাসন করিতেন। এত বড় সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়াও তাহারা লুঠ পাট করা ছাড়িয়া দেয় নাই। এ সময়েও তাহারা দেশের সর্ব্বত্র লুঠ পাট করিয়া বেড়াইত; ইহাই তাহাদিগের পৈতৃক ব্যবসায় ছিল। যে রাজ্য তাহাদের অধীনতা স্বীকার করিত না, লুঠ পাট করিয়া তাহারা সেই রাজ্যেরই সর্ব্বনাশ করিত। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কাড়ার শব্দ শুনিলেই চাষারা মাথায় চাউলের ছালা, ও কোমরে টাকা বাঁধিয়া স্ত্রীপুত্র লইয়া নিকটবর্ত্তী পাহাড়ে বা জঙ্গলে যাইয়া প্রাণ বাঁচাইত। মাঠে পাকা শস্য, কিন্তু মহারাষ্ট্রির অত্যাচারে তাহা কাটিয়া গৃহে আনিবার জো নাই। এ প্রকার অবস্থায় অনেক অঞ্চলের লোকে এই দস্যুদিগকে বার্ষিক কিছু কিছু টাকা দিত। এই সময়ে দিল্লীতে যে কাষ্ঠের পুতুল "বাদশাহি" করিতেন, তিনিও মহারাষ্ট্রীদিগকে এই লজ্জাকর কর দিতেন। দিল্লীর রাজবাটীর ছাতে উঠিলে অদূরে রাত্রিকালে "কোন এক মহারাষ্ট্রী সেনাপতির শিবিরের আগুন জ্বলিতে দেখা যাইত; আর এক জন অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া প্রতি বৎসর ধনধান্যশালিনী বঙ্গদেশে আসিয়া লুঠ পাট করিত।"

* বঙ্গদেশের কোন কোন অঞ্চলে এখনও "বর্গী এল দেশে" বলিয়া গান গাহিয়া ছেলে ঘুম পাড়ান হয়।

১৮১৭ শালে বাজি রাও মহারাষ্ট্রীদিগের প্রধান ছিলেন। ইনি একদা বহুসৈন্য-সামন্ত লইয়া পুনাস্থ ব্রিটিশ রেসিডেন্সি আক্রমণ করেন; কিন্তু হারিয়া যান, অবশেষে অগত্যা ইহাঁকে ইংরাজ-দিগের হাতে আত্মসমর্পণ করিতে হইয়াছিল।

ধর্ম্ম।—মহারাষ্ট্রীরা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী; কিন্তু ইহারা কতকগুলি স্থানীয় বিগ্রহের আরাধনায় বেশি অনুরক্ত। পুনার দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে পান্ধারপুর নামক স্থানে এক অতি বিখ্যাত দেবালয় আছে। নগরের যে অংশে এই দেবালয় স্থাপিত, সেই অংশই অতি পবিত্র বলিয়া গণিত, তাহাকে সচরাচর পান্ধরিক্ষেত্র বলে। দেবতার নাম "বিথবা" অথবা "বিথল।" এই নামে এক জন ব্রাহ্মণ ছিলেন, এক্ষণে লোকে তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণের অবতার বিশেষ বলিয়া মানে; তাই তাঁহার মূর্ত্তিস্থাপন করতঃ ঐ নাম দিয়াছে।

মহারাষ্ট্রীদিগের জাতীয় কবির নাম তুকারাম। তুকারামের মধুর কবিত্বই বিথবার দেবত্বলাভের কারণ। আড়াই শত বৎসর পূর্ব্বে শূদ্র জাতীয় বণিকবংশে তুকারামের জন্ম হয়। তুকারাম সুমধুর সঙ্গীতে বলিয়াছেন যে, বিথবা অনেক অতিমানুষিক কার্য্য করিয়া, অবশেষে বিষ্ণুর রথারোহণে সশরীরে স্বর্গে গমন করিয়াছেন। এক্ষণে লোকে বিথবাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া আরাধনা করে।

পুনা হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে জেজুরি নামক স্থানে একটী দেবালয় আছে। খাণ্ডব নামে এক রাজা ছিলেন, তাঁহাকে লোকে এক্ষণে শিবের অবতার বলিয়া মানে। বিগ্রহটী সস্ত্রীক অশ্বে আরোহণ করিয়া আছেন, নিকটে একটী কুকুর দাঁড়াইয়া আছে। শ্রীক্ষেত্রে যেমন, এখানেও তেমনি গৃহস্থেরা খাণ্ডব দেবের সেবার জন্য কন্যাদান করিয়া থাকে। কোন অনূঢ়া কন্যা আনীতা হইলে বিশেষ বিশেষ অনুষ্ঠান দ্বারা তাহাকে পবিত্র করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। তাহার অঙ্গে লোহা পোড়াইয়া দাগ দেওয়া হয়।

এইরূপ দত্তা কন্যারা বিগ্রহটীর ভার্য্যা বলিয়া বিখ্যাত হয় বটে, কিন্তু ফলে তাহারা বেশ্যা।

এক সময়ে "দানব" নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন। কথিত আছে যে, ইহাঁর গুণে একটা মহিষ মানুষের মত কথা কহিত, এবং বেদের একটা স্তোত্র আবৃত্তি করিতে পারিত। এক্ষণে আলান্দী নামক স্থানে বিগ্রহ স্থাপন করতঃ লোকে এই ব্রাহ্মণের পূজা করে। বেদজ্ঞ মহিষটার কিন্তু পূজা হয় না!

এক্ষণে মহারাষ্ট্র দেশের প্রধান প্রধান স্থানে ভগবান যীশু খ্রীষ্টের শিষ্যেরা বিদ্যালয় স্থাপন করতঃ লোকদিগকে মুক্তিপথ শিক্ষা দিতেছেন। নীলকণ্ঠ নিহিমায়া গোরে নামে এক জন মহারাষ্ট্রী পণ্ডিত খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। সম্প্রতি ইহাঁর মৃত্যু হইয়াছে। আরো অনেক লোক এই সত্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ১৮৮১ শালে মহারাষ্ট্রী খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ৮,০০০ হাজার ছিল।

সাহিত্য।—কলিকাতায় যেমন পাদরি ডফ্, বোম্বাই নগরে তেমনি পাদরি উইল্‌সন বড় জনপ্রিয় ছিলেন। উইলসন সংস্কৃত ভাষা উত্তম জানিতেন; তিনি বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে আরাধ্য দেবতাগণকে আকারন্তর অদ্বৈতবাদের সহিত সংযুক্ত করণ চেষ্টায় গদ্যে ও পদ্যে যে সকল পুস্তক লিখিত হইয়াছে, তাহা লইয়াই মহারাষ্ট্রী সাহিত্য। এ বিষয়ে তুকারাম প্রধান গ্রন্থকার। রামায়ণের ও ভিন্ন ভিন্ন পুরাণের পদ্যানুবাদ এবং আদিরস-ঘটিত গান ও গল্পও অনেক আছে। বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে অনেক ইংরাজি পুস্তকের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দে ৩০৪ খানা মহারাষ্ট্রী ভাষার নূতন পুস্তক রেজিষ্টারি হইয়াছিল। এই সকল পুস্তকের বিষয়ে রেজিষ্টার বলেন, "বর্ত্তমান কালের লোকদিগের অনেকেই ইংরাজি জানেন,

তাঁহারা ইংরাজি পুস্তকই পাঠ করিয়া থাকেন। প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রী ভাষার পুস্তক পাঠ করেন, কিন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত পুস্তক ভিন্ন অন্য পুস্তক পাঠ করিতে বড় ভাল বাসেন না। ইহাঁরা সে কেলে লোক; তাঁহাদের মতে, যে শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রকৃতি, তাঁহার সম্বন্ধে মনুষ্যের কর্ত্তব্য, এবং পরিত্রাণের বিষয় আলোচিত হয় নাই, তাহা শাস্ত্র নামে উল্লেখিত হইবার যোগ্য নহে। ধর্ম্মতত্ত্ব, এবং অতিমানুষিক দর্শনশাস্ত্রই তাঁহাদিগের সর্ব্বস্বধন। এই সকল পুস্তকের শতকরা ৯৯ খানা প্রাচীন কালের গ্রন্থকর্ত্তারা লিখিয়া গিয়াছেন, এক্ষণকার লোকেরা কেবল সেই সকল পুস্তক ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড করিয়া বা এককালে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করিতেছেন মাত্র। এ সকল পুস্তকের পাঠক বিস্তর এবং কাট্‌তিও খুব। বুঝুক আর নাই বুঝুক, এ সকল পুস্তক পাঠ, বা পাঠ শ্রবণ করিলে পুণ্য হয়, এই সংস্কারের বশে অনেকে পাঠ করে, যাহারা পাঠ করিতে জানে না, তাহারা পাঠ-শ্রবণ করিয়াই সন্তুষ্ট। এই সকল পুস্তকে নানা অদ্ভুত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে; তাই লোকে ভক্তিভাবে, আগ্রহসহকারে পাঠ ও শ্রবণ করিয়া থাকে।

"ইংরাজি পুস্তকের সমগ্র বা সংক্ষিপ্ত অনুবাদের আজ কাল বড় প্রাদুর্ভাব। স্কুলের বালকদিগকে টীয়া পাখি করিয়া তোলাই এই সকলের উদ্দেশ্য। লঘু সাহিত্যের কথা যদি বল, তবে তাহার বড়ই ছড়া ছড়ি। আখ্যায়িকা গুলি অবৈধ গুপ্তপ্রেমের ষড়যন্ত্রে পরিপূর্ণ, ইহাতে মনুষ্যচরিতের কৃষ্ণপক্ষই প্রদর্শিত হইয়া থাকে, জ্যোৎস্নাময় শুক্লপক্ষ কদাচিৎ প্রকাশিত হয়। ভাল ভাল আখ্যায়িকা যে নাই, তা বলি না; কিন্তু তাহার সংখ্যা বড় কম।"

পরিবর্ত্তনাকাঙ্ক্ষী।—এক্ষণকার শিক্ষিত মহারাষ্ট্রি দলের অনেকেই রাজনীতিক বিষয়ক পরিবর্ত্তনের বড় আকাঙ্ক্ষা।

আবার অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারা পুরাতন রীতিনীতির মায়া ছাড়িতে পারেন না। পুনা নগরেই এই প্রকার ভাবের লোক বেশি ; এক্ষণে পুনাই রাজনীতিক দলের কেন্দ্রস্থল।

পরিবর্ত্তনাকাঙ্ক্ষী দলের লোকেরা যে দেশহিতৈষিতার গর্ব্ব করেন, "সুবোধ পত্রিকা" এইরূপে তাহার আলোচনা করিয়াছেন।—

"ইহাঁদের দেশহিতৈষিতাভিমান আর কিছুই নয়, কেবল তলিয়ে না বুঝিয়া হিন্দু আচার ব্যবহারের, হিন্দুশাস্ত্রের গৌরব এবং পঞ্চমুখে পূর্ব্বপুরুষদিগের মাহাত্ম্যকীর্ত্তন করা, অথচ তাঁহাদের ইতিহাস আমরা কিছুই জানি না বলিলেই হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আবার ইউরোপীয় আইন কানুন ও রীতিনীতির, বিশেষতঃ আমাদিগের ইংরাজশাসনকর্ত্তাদিগের রীতিনীতির ছিদ্রান্বেষণের অনিবার্য্য আকাঙ্ক্ষা রহিয়াছে। এই সকল লোক এমন ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে যে, ইউরোপীয়েরা যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে আমাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা পর্য্যন্ত স্বীকার করিতে চাহে না। বোম্বাই নগরে এই হিতৈষি দলের এক খানি সংবাদপত্র আছে। ইহাতে ইংরাজি ও মহারাষ্ট্রীয় উভয় ভাষাতে প্রবন্ধাদি লিখিত হয়। এক বার এই সংবাদপত্রের মহারাষ্ট্রী স্তম্ভে লিখিত হইয়াছিল যে, পুরাকালের হিন্দুদিগের প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে এত দূর জ্ঞান জন্মিয়াছিল, এবং প্রকৃতিকে তাঁহারা এমন বশে আনিয়াছিলেন যে, যখন ইচ্ছা, এবং যেখানে ইচ্ছা, বৃষ্টি বর্ষণ করাইতে পারিতেন। পরিবর্ত্তনাকাঙ্ক্ষিরা যদি যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়াও এই বিলুপ্ত বিজ্ঞানের পুনরুদ্ধার করত প্রকাশ করিতে পারেন, তাহা হইলে নরলোকের যার পর নাই হিতসাধিত হইবে।

শিক্ষিত মহারাষ্ট্রি দলের সকলেই যে এই প্রকার হিতৈষী, তাহা নহে, মিঃ চন্দ্রবরকার, অধ্যাপক ভাণ্ডাববকার, এবং মান্যবর এম, জি, রাণাদে, ইহাঁরা ভারতবর্ষের বিখ্যাত সমাজসংস্কারক।

ওয়ারালি।

বোম্বাই রাজধানীর এলাকায় কতকগুলি বন্য জাতীয় মানুষের বাস আছে; তাহার একটী জাতির নাম ওয়ারালি। কয়েক বৎসর হইল, বোম্বাইয়ের বিখ্যাত মিশনরি ডাঃ উইলসন্ ইহাদিগকে দেখিতে যান। তাঁহার সঙ্গে ইহাদের যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার কিয়দংশ নিম্নে বিবৃত করিলাম।

"নিজের নাম বলিলে পর পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। কেবল তিন জনে পিতার নাম বলিতে পারিল।

তোমাদিগের স্ত্রীদিগের নাম কি?—আমরা স্ত্রীর নাম মুখে আনি না।

ব্রাহ্মণেরা কি তোমাদিগের বিবাহ দেন?—না; আমরা আপনারাই আপনাদিগের পুরোহিত। বিবাহ কালে কন্যা একবাটী মদ সম্মুখে রাখিয়া গান করে। পরে সেই মদ প্রথমে বর পান করে, তার পরে কন্যা, তার পরে উপস্থিত সকলে পান করে। বিবাহ হইয়া গেল।

তোমাদিগের একাধিক স্ত্রী আছে?—না, না; এক জনেরই পেট ভরাইতে পারি না, আবার দুই জন!

স্ত্রী কথা না শুনিলে, তোমরা কি কর?—শাস্তি দি। কখনও বেশি, কখনও কম শাস্তি দিয়া থাকি। দুই এক ঘা না দিলে কি সোজা হয়?

তোমাদিগের ছেলে মেয়েদিগকে কোন প্রকার শিক্ষা দেও কি?—হাঁ, তাহাদিগকে বলি, আলস্য করিও না। মাঠে গিয়া খুব খাটিবে, কাঠ কাটিয়া আনিবে, গোবর কুড়াইবে, ঘর ঝাঁটি দিবে, জল ভরিবে, গরু বাঁধিয়া দিবে।

তাহাদিগকে লিখিতে পড়িতে শিখাও কি?—ওয়ারালিরা লিখিতে পড়িতে জানে না।

তাহাদিগকে ঈশ্বরের বিষয়ে কিছু শিক্ষা দেও কি ?—তাহাদের কাছে ঈশ্বরের কথা বলিতে যাইব কেন ?

তোমরা কোন্ ঈশ্বরের পূজা কর ?—আমরা ওয়াঘিয়া নামক বাঘ ঠাকুরের পূজা করি।

সে দেবতার কোন আকার আছে কি ?—পাথর মাত্র, কোন গঠন নাই; সিন্দূর ও ঘি তাহাতে ঢালি।

কেমন করিয়া তাহার পূজা কর ?—তাহার কাছে মুরগি, পাঁঠা উৎসর্গ করি, তাহার মাথায় নারিকেল ভাঙ্গি, তেল ঢালি।

এই দেবতা তোমাদিগকে কি দেয় ?—বাঘের হাত হইতে রক্ষা করে, সুশস্য দেয়, ব্যায়রাম দূর করে।

কে তোমাদিগের দুঃখ কষ্ট ঘটায় ?—পূজা না দিলে ওয়াঘিয়া দুঃখ কষ্ট ঘটায়। সে বিড়ালের মতন আমাদিগের গলা টিপিয়া ধরে, সে যেন শরীরে লাগিয়া থাকে।

ওয়াঘিয়াকে কখনও গালি দিয়া থাক ?—কেন দিব না ? এই বলি, ওরে ওয়াঘিয়া, তোরে মুরগী, পাঁঠা, আর ঘি দিলাম, আর তুই কিনা, আমাদিগকে মারিস্ ? আর কি চাস্, বল্।

মরিলে আত্মা কোথায় যায় ?—তা কি করিয়া বলিব ?"

দক্ষিণ-ভারতের দ্রাবিড়ীয় জাতি।

মহারাষ্ট্র ও উড়িষ্যা দেশের দক্ষিণে যে সকল লোকের বাস, তাহাদিগের অধিকাংশের ভাষা দ্রাবিড়ীয় ভাষাপরিবারভুক্ত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহারা উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়া ভারতে প্রবিষ্ট হইয়াছিল।

বিশপ কাল্ডওয়েল গণনা করিয়া বলিয়াছেন যে, দ্রাবিড়ীয় ভাষা দ্বাদশটী; পাণ্ড্য, মালবারী, তৈলঙ্গী, কর্ণাটী, তুলু, কুদাগু

অথবা কুর্গ, এই ছয়টী মার্জ্জিত। তুদা, কোটা, গণ্ড, খন্দ, অথবা কূ, ওরাঁও (রাজমহলনিবাসী,) এই কয়টী অমার্জ্জিত।

নিম্ন লিখিত তালিকায় দ্রাবিড়ীয় ভাষা গুলির পরস্পর সাদৃশ্য ও সংস্কৃতমূলক ভাষার সহিত অসাদৃশ্য প্রদর্শিত হইল;—

বাংলা	হিন্দি	পাণ্ড্য	মালাবারী	তৈলঙ্গ	কর্ণাটী
মানুষ	মানস্	আল	আল	অল	আলু
শির	শের	তালেই	তালা	তালা	তালে
কর্ণ	কান	কান্নু	কানা	চেবী	কিবি
চক্ষু	আঁখ	কান	কান্না	কান্নু	কান্নু
মুখ	মুখ	বেই	বেয়	নোরু	বেই
দাঁত	দাঁত	পাল	পাল্লা	পাল্লু	কাল্লু
এক	এক	ওনরু	ওন্না	বকাতি	ওন্দু
দুই	দো	ইরান্দু	রেন্দু	রেন্দু	ইরন্দু
তিন	তিন	মুনরু	মুন্নু	মুডু	মূরু
চার	চার	নালু	নালা	নালুগু	নালকু
পাঁচ	পাঁচ	আঞ্জু	আঞ্জা	এয়েদু	এইদু

দ্রাবিড়ীয়েরা কোন্ সময়ে ভারতবর্ষে আইসে, ঠিক করিয়া বলা যায় না। কিন্তু উত্তর দিক দিয়া আর্য্যদিগের আগমনের পূর্ব্বেই যে দ্রাবিড়ীয়দিগের আগমন হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অনেক পণ্ডিতে অনুমান করেন, এক্ষণে আন্দামান দ্বীপে যে সকল অসভ্য পশুবৎ মনুষ্য আছে, ভারতবর্ষের সর্ব্বাদিম নিবাসিরাও সেই প্রকার লোক ছিল। ভারত-উপদ্বীপের দক্ষিণে আজিও বিস্তর কবর বাহির হইয়া থাকে, তাহা খুঁড়িলে মাটীর পাত্র ও পাথরের চক্র পাওয়া যায়। এই সকল কবর, মাটীর পাত্র ও পাথরের চক্র কাহাদের, তাহা আজ পর্য্যন্ত কেহ স্থির করিয়া উঠিতে পারেন নাই। এই সকল

কবরের মধ্যে সচরাচর মাটীর একটা হাঁড়ি পাওয়া যায়; তাহার মধ্যে মানুষের হাড়,—কোন কোনটার হাড়গুলি আধপোড়া!

মাটীর ছোট পাত্র ও লৌহনির্ম্মিত অস্ত্র ও কবরের মধ্যে থাকে। কোন কোন স্থলে এই সকল জিনিস এক জায়গায় রাশীকৃত আছে, পাথরের বাক্সের মধ্যে নহে, বা পাথরের চক্রবেষ্টিতও নহে, মাটীতে কেবল পোতা। পণ্ডিতেরা এই সকল পরীক্ষা করিয়া বলেন যে, এই সকল যাহারা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহারা অতি ছোট ২ হইলেও বিলক্ষণ বলবান মানুষ ছিল। আবার অনেকে ইহাতে ঐক্য হন না; তাঁহারা বলেন, হাড়গুলি দেখিয়া জানা যায়, তাহারা আমাদের মতন মানুষ ছিল।

প্রধান প্রধান দ্রাবিড়ীয় জাতির বিবরণ লিখিতেছি।—

পাণ্ড্য, বা তামিল।

পাণ্ড্য জাতির বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি। দ্রাবিড়ীয়-পরিবার-ভুক্ত যত ভাষা আছে, বোধ হয়, তন্মধ্যে সে কালে এই ভাষারই বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। এই ভাষায় পুরাকালীয় রীতিনীতি যত দেখিতে পাই, আর কোন ভাষায় তত নাই। মান্দ্রাজ নগরের দশ ক্রোশ দক্ষিণে পলিকট হইতে আরম্ভ করিয়া কুমারিকা অন্তরীপের ওদিক পর্য্যন্ত স্থানের নিবাসিরা এই ভাষা বলে। ঘাট পর্ব্বত ইহার পূর্ব্ব সীমানা। আবার সিংহলের কম হইলেও ছয় আনা লোকের ভাষা পাণ্ড্য। পাণ্ড্য দেশের ক্ষেত্রপরিমাণ ত্রিশ হাজার বর্গক্রোশ; ইংলণ্ড ও ওয়েল্‌স দেশ একত্র ধরিলে যত বড়, তত বড় হইবে না।

ভাষা।—তামিল ভাষা প্রায় এক কোটি ত্রিশ লক্ষ লোকের ভাষা।

দ্রাবিড়ীয় পরিবার-ভুক্ত অন্যান্য প্রচলিত ভাষায় যত সংস্কৃত শব্দের বাহুল্য, পাণ্ড্য ভাষায় তত নহে; তথাপি পাণ্ড্যের এক শত শব্দের মধ্যে ৪০ টী সংস্কৃত। অতি পুরাকালে যে দেবনাগর অক্ষর প্রচলিত ছিল, অনেকে বলেন, পাণ্ড্য অক্ষর সেই দেবনাগর অক্ষরের অনুকৃতি; আবার কেহ কেহ বলেন, তাহা নহে; দক্ষিণভারতের গিরিগুহায় যে অক্ষরের শিলালিপি দেখিতে পাওয়া যায়, সেই অক্ষরের অনুকরণে পাণ্ড্য অক্ষর হইয়াছে। কেবল উড়িয়াদিগের ন্যায় লোহার কলমে তালপত্রে লিখিতে হয় বলিয়া আকারের কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

আদিম সভ্যতা।—বিশপ কাল্‌ডোয়েল পাণ্ড্য শব্দের আলোচনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে, আর্য্যগণের দক্ষিণ-ভারতে গমনের অনেক পূর্ব্বে পাণ্ড্যেরা সভ্যতা-সোপানের কতক ধাপ উঠিয়াছিল। তৎকালে ইহাদের রাজা ছিল; রাজাদিগের বাসবাটী সুদৃঢ় ছিল; কিন্তু এই রাজাদিগের রাজ্য বড় ছোট ছোট ছিল। নাগা-পর্ব্বতে যেমন এক এক গ্রামে এক এক রাজা, পাণ্ড্য দেশেও, বোধ হয়, সেই রূপ ছিল। ইহাদিগের ভাট বা কবি ছিল, উৎসবকালে তাহারা পাঁচালির মত গীত গান করিত; ইহাদিগের ভাষাও লিখিত ভাষা ছিল, লোহার কলম দিয়া, তালপত্রে লেখা হইত। এই প্রকার লিখিত পাতার কতকগুলি একত্র বাঁধিয়া রাখিলে তাহাকে পুঁথি বা গ্রন্থ বলা হইত। ইহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব মানিত, তাঁহাকে "কো" অর্থাৎ রাজা বলিত। ইহাদের সমাজে পবিত্র পরিণয়-প্রথা প্রচলিত ছিল। ইহারা একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল, সেটাকে "কো—ইল," অর্থাৎ ঈশ্বরের গৃহ বলিত। টিন, সীস, ও রাং ছাড়া আর সকল ধাতুর ইহারা ব্যবহার করিত; উক্ত তিন ধাতুর অস্তিত্ব জ্ঞাত ছিল না। সে কালের লোকেরা সচরাচর যে সকল গ্রহনক্ষত্রাদির বিষয় জানিত, এই পাণ্ড্যেরাও, বুধ

ও শনি ছাড়া, সেই সকলের জ্ঞান লাভ করিয়াছিল। তাহাদের অনেকে একশত, আবার কোন কোন স্থাননিবাসিরা সহস্র পর্য্যন্ত গণিতে ও সংখ্যাপাত করিতে জানিত। চিকিৎসাশাস্ত্রেও ইহাদের জ্ঞান ছিল; ইহারা গ্রামে ও পল্লীতে বাস করিত, কিন্তু তৎকালে ইহাদের বড বড় নগর ছিল না। ইহাদের শাল্‌তি, নৌকা, ও ছোট ছোট জাহাজ ছিল। এই প্রকার জাহাজ এখনও আছে।

কৃষিকার্য্যে তৎকালে পাণ্ড্যেরা বিলক্ষণ পটু ছিল; যুদ্ধ করিতেও বড় ভাল বাসিত। ধনুর্ব্বাণ, বড়শা ও খড়্গ ইহাদের যুদ্ধাস্ত্র ছিল। জীবিকা নির্ব্বাহার্থ সচরাচর যে সকল শিল্প-কার্য্যের প্রয়োজন, তাহাও তাহারা জানিত। আবার সূতা কাটিতে, কাপড় বুনিতে ও কাপড রং করিতেও পারিত। মৃণ্ময় পাত্র নির্ম্মাণ বিষয়ে তৎকালে ইহাদের সমকক্ষ কেহ ছিল না। ইহাদের কবরের ভিতর হইতে যে সকল মৃণ্ময় পাত্র বাহির হইয়া থাকে, সে সকল অতি চমৎকার। কেবল ব্যাকরণে ও বিজ্ঞানে ইহাদিগের কোনই জ্ঞান ছিল না।

সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা দ্বারা দেখা যায়, দক্ষিণভারতের দ্রাবিড়ীয়েরা প্রথম হইতেই আর্য্যদিগের বন্ধু ছিল। তবে সংস্কৃত সাহিত্য মতে ইহারা বন নিবাসী। যে বানর সৈন্য লইয়া রাম সবংশে লঙ্কাপতি দশাননকে বধ করত জানকীর উদ্ধার করেন বলিয়া কথা আছে, সেই বানর সৈন্য দ্রাবিড়ীয় লোক।

লোক।—বিশপ কাল্‌ডোয়েল্‌ বহু কাল এই দেশে বাস করেন, বলিতে কি, এই দেশেই জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন, "যেখানে গেলে অর্থোপার্জ্জন হইবে, যেখানেই কোন দামোদর লোককে ঠেলিয়া ফেলিয়া যাওয়া আবশ্যক হয়, সেই খানেই পাণ্ড্যেরা গিয়া পড়ে; ইহারা ভারতবর্ষের গ্রীক্‌ বা স্কচ্‌; হিন্দু জাতি মধ্যে এমন অল্প কুসংস্কারাপন্ন ও উৎসাহি এবং অধ্যবসায়শীল লোক আর নাই।" সিংহলের চা-বাগানে

যে কুলিরা কাজ করে, তাহারা পাণ্ড্য ; কলম্বো নগরে যাহারা ব্যবসাবাণিজ্য দ্বারা ধনী হইয়াছে, ও হইতেছে, তাহাদিগের অধিকাংশ পাণ্ড্য। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির এলাকায় যত ইউ-রোপীয় বাস করে, তাহাদের চাকর বাকরের অধিকাংশ পাণ্ড্য ; সেনাগণের সঙ্গে যে সকল কুলি যায়, তাহারা সকলেই পাণ্ড্য, ইহা বলিলে বেশি বলা হয় না। ব্রহ্মদেশেও অনেক পাণ্ড্য আছে। কলিকাতায় আমরা যাহাদিগকে মান্দ্রাজী বলি, তাহা-দিগেরও অধিকাংশ পাণ্ড্য বা তামিল ; কলিকাতার বড় বাজারে অনেক পাণ্ড্য মহাজন আছে।

পাথর কাটিয়া মাটীর নীচে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া মহারাষ্ট্রী-য়েরা বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে ; মাটীর উপরে পাণ্ড্যেরা যে সকল মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছে, তাহাও ভারতবিখ্যাত।

"গলাবাজিতে" মান্দ্রাজের লোকেরা অন্যান্য প্রেসিডেন্সির লোকেব সঙ্গে পারিয়া উঠে না, মানি। কিন্তু শিক্ষা-সম্বন্ধে ইহাদের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে। কলিকাতাস্থ ডফ্ সাহেবের কলেজের ন্যায় মান্দ্রাজের খ্রীষ্টীয়ান কলেজ অতি বিখ্যাত। ফলে এই কলেজই মান্দ্রাজ নগরের প্রধান কলেজ। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়েও মান্দ্রাজের বিশেস উন্নতি হইয়াছে। বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে এই প্রেসিডেন্সির খ্রীষ্টীয়ানেরা যেমন উন্নতি করিয়াছে, আর কোন অঞ্চলের খ্রীষ্টীয়ানেরা তেমন করিতে পারে নাই।

মান্যবর চিন্তাশীল রাও পাণ্ড্য জাতীয় শিক্ষিত লোকদিগের বিষয়ে বলেন,—

"পাশ্চাত্য শিক্ষাদ্বারা যাহারা উপকৃত হইয়াছে, তাহারা হয় লোভী, না হয় গো-বেচারী। তাহারা কল্পনা করিতে শিখি-য়াছে, কাজ করিতে শিখে নাই। বিদ্যাশিক্ষা দ্বারা তাহাদের চক্ষু যতটা খুলিয়াছে, হৃদয় ততটা খুলে নাই। সুখের বিষয় এই যে, যাঁহারা সমাজসংস্কারের চেষ্টায় আছেন, ইহারা তাঁহাদের

বিরোধী নহে, অথচ হাতে-কলমে তাঁহাদের সাহায্যও করে না। একথা কেবল মোটের মাথায় কহিলাম। স্বীকার করি, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকে আমাদিগের বিশেষ সাহায্য করিতেছেন, কিন্তু আবার তাঁহাদের অনেকে সুশিক্ষিত এবং বিশ্যবিদ্যালয়ের উপ্রাধিধারী হইয়াও বিরুদ্ধ পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন, এবং সংস্কার কার্য্যে যথাশক্তি বাধা দিতেছেন।"

সমাজসংস্কারকদিগের মধ্যে রঘুনাথ রাও দেওয়ান বাহাদুরের নাম বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। কলেজের অধ্যক্ষ ওয়ার্ডসোয়ার্থ সাহেব দেওয়ান বাহাদুরের বিষয়ে বলিয়াছেন যে, "প্রচলিত নিষ্ঠুর রীতি-নীতির, এবং বিকৃতিপ্রাপ্ত সাহিত্যের সঙ্গে ইনি এককই ঘোর যুদ্ধ করিতেছেন।"

"হিন্দু" নামক সংবাদ পত্রের সম্পাদক আর এক জন সমাজসংস্কারক। তাঁহার বিষয় স্থানান্তরে লিখিত হইল।

ধর্ম্ম।—ভূত প্রেতের পূজাই পাণ্ড্যদিগের আদি ধর্ম্ম, কোন কোন শ্রেণীর লোকের এখনও এই কুসংস্কার আছে। এই কুসংস্কারের প্রাদুর্ভাব দক্ষিণ অঞ্চলের পাণ্ড্য সমাজেই বেশি দেখিতে পাই। ইহাদের পূজ্য ভূত প্রেতেরা এক সময়ে মানুষ ছিল; হঠাৎ কিছু হইয়া মরিয়া যাওয়াতে, অথবা অপমৃত্যু হওয়াতে ভূত হইয়া স্বপ্নে দেখা দিত। তাই তাহাদের পূজাপদ্ধতি প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। ইহারা বড় দুর্দ্দান্ত, হিংস্রক, এবং যখন তখন মানুষের কাজে বাধা দেয়। পশু-পক্ষীর বলি ও এক প্রকার বিদ্ঘুটে নাচ ইহাদিগের বড় প্রিয়। কোন ভূত পাঁঠায় তুষ্ট, শূয়র নহিলে কোন ভূতের মন উঠে না, আবার কোন কোন ভূত মুরগি বড় ভাল বাসে;—আবার চণ্ডালজাতীয় ভূতের পূজায় বলির সঙ্গে মদ চাই। স্বপ্নে যে মানুষ ভয় খায় বা চেঁচাইয়া উঠে, এ সকল ভূতের কর্ম্ম। ভূত আসিয়া ঘুমন্ত মানুষের বুকে চাপিয়া বসিয়া তাহার নিশ্বাস বন্ধ করিবার চেষ্টা করে।

এক শ্রেণীর লোক ভূতের নাচ নাচে। তাহাদের আকৃতি ও পোষাক দেখিলে সামান্য লোকের ভয় হয়। শিঙ্গা, করতাল, একতারা, এই সকল ইহাদের বাদ্যযন্ত্র। একতারার বাঁশে ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকে, নর্ত্তকেরা পাগলের মত নাচে, একতারাটা মাথার উপরে লাঠির মত ঘুরায়, লম্ফ দেয়। ইহার কারণ এই যে ভূত তাহাকে আশ্রয় করিয়াছে। তখন মুরুব্বিরা পূজার পরামর্শ ও আয়োজন করে।

এদেশে যে জৈন-ধর্ম্ম-মতের বিস্তার হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যাহারা জৈন-ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল, রাজা সুন্দর পাণ্ড্য তাহাদিগের অনেককে শূলে দিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য কাশীতে শৈব-ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করিলে পর, সুন্দর পাণ্ড্য নিজ রাজ্যে উক্ত ধর্ম্ম পুনরায় প্রচলিত করিতে বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

আবার রামানুজ শিবকে বেদখল করিয়া, বিষ্ণুর উপাসনা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করেন। বৈষ্ণবদিগের দুইটী সম্প্রদায় আছে; তেঙ্গল (দক্ষিণ বেদী), এবং বদগল (উত্তর-বেদী)। দাশরথীর পাঁচালিতে শাক্ত বৈষ্ণবে যে দ্বন্দ্বের কথা আছে, এই দুই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে তাহা অপেক্ষাও ঘোর বিবাদ হইয়া থাকে। অনেক বার রক্তপাত পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

বিশপ কাল্‌ডোয়েল বলিয়াছেন, "কোন হিন্দু দেবালয়েই জীবনের কর্ত্তব্য বিষয়ে শিক্ষা দত্ত হয় না। দেবতারা এই সকল কর্ত্তব্য পালন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন, এমন কথাও বলা হয় না, অথবা ঐ সকল কর্ত্তব্য যথাবিহিত পালন করিতে সমর্থ হইবার জন্য শক্তিরও প্রার্থনা করা হয় না।"

সর্ব্বসাধারণে যে রূপে দেবার্চ্চনা করে, তাহাতে মনুষ্য-চরিত্র বা স্বভাব পবিত্র করণযোগ্য কোন কিছু নাই। পবিত্রতার ভাব হিন্দু আরাধনা-প্রণালীতে নাই বটে, কিন্তু যাহাতে মনুষ্যস্বভাব

অপবিত্র হইয়া পড়ে, এমন ভাব বিস্তর আছে। পুরী ও দক্ষিণ-ভারতের অনেক মন্দিরে "দেবদাসী" নাম্নী নর্ত্তকী আছে; তাহারা বেশ্যামাত্র—আর কিছুই নহে। ইহারা না থাকিলে মন্দিরস্থ বিগ্রহের পূজার্চ্চনা কার্য্য হইতেই পারে না। ব্রাহ্মণেরা পূজা করিয়া থাকেন, সত্য বটে, কিন্তু প্রতিদিন এই বেশ্যারা পূজার আয়োজন করিয়া দেয়। পুরীতে আরতির পরে দেবদাসীরা কীর্ত্তন করিয়া জগন্নাথকে শুনায়। তবে যে বামণরূপ রথে দর্শন করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না, সেই বামণমূর্ত্তিধারী জগন্নাথ যখন বেশ্যার সঙ্গীত ভাল বাসেন, তখন হিন্দুরা যে পূজা-পার্ব্বণে বেশ্যার নৃত্য দর্শন ও সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া থাকেন, সে জন্য তাঁহাদিগের দোষ দেওয়া বৃথা। ১৮৮১ খ্রীঃ অব্দের গণনা অনুসারে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে ১১,৫৭৩ জন নৃত্যকী ছিল। গ্রিকেরা সে কালে যখন প্রতিমা পূজা করিত, তাহাদের দেশেও এই প্রথা প্রচলিত ছিল। বিশপ লাইটফুট যে যে কথায় গ্রিকদিগের বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, ভারতবর্ষের বিষয়েও তাহার প্রয়োগ হইতে পারে।—

"যদি পার, ভাবিয়া দেখ, এই সর্ব্ববাদী-সম্মত নির্লজ্জতা, এই ধর্ম্মভাবের লম্পটতা, ধর্ম্মানুমোদিত, এবং সর্ব্বসাধারণের চক্ষের উপরে চলিতেছে, এদিকে রাজনীতিক ও দেশহিতৈষী লোকেরা দেখিয়াও দেখিতেছেন না, এবং ইহার নিবারণার্থ একটী কথাও কহিতেছেন না, এবং একটা অঙ্গুলিও উত্তোলিত করিতেছেন না।"

খ্রীস্টাব্দের ষোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত মিশনরি ফ্রান্সিস্ জেবিয়রের যত্নে বিস্তর পাণ্ড্য রোমাণ কাথলিক খ্রীষ্টীয়ান হয়। দেন্মার্কের রাজা দুই জন প্রটেষ্টাণ্ট মিশনরি পাঠাইয়া দেন, তাঁহাদের পূর্ব্বে আর কোন প্রটেষ্টাণ্ট মিশনরি পাণ্ড্য দেশে আইসেন নাই। ১৭০৬ খ্রীঃ অব্দে উক্ত দুই জন মিশনরি ত্রাঙ্কু-ইবার নামক স্থানে জাহাজ হইতে নামেন।

১৮৮১ খ্রীঃ অব্দে পাণ্ড্য খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ছয় লক্ষ ছিল। ইহার মধ্যে রোমাণ কাথলিকদিগের সংখ্যা চারি লক্ষের অধিক। প্রটেষ্টাণ্ট দুই লক্ষের কিছু কম।

সাহিত্য।—পাণ্ড্য ভাষার প্রথম লিখিত কথার একটী বাইবেলে পাওয়া যায়। শলোমনের জাহাজ ভারতবর্ষে আসিত, অনেকে এই রূপ অনুমান করেন; সেই জাহাজে এদেশ হইতে পলেষ্টীয় দেশে ময়ূর নীত হয়। বাইবেলে ইব্রীয় ভাষায় ময়ূরার্থে যে শব্দের ব্যবহার হইয়াছে, সেটী দ্রাবিড়ীয় ভাষার শব্দ।

পণ্ডিতেরা বলেন, অগস্ত্য মুনি দক্ষিণভারতে সংস্কৃত সাহিত্যের ও সংস্কৃত সভ্যতার বিস্তার করেন। কথিত আছে যে, বিন্ধ্যগিরি নত হইয়া অগস্ত্যকে প্রণাম করিয়াছিল। প্রথম পাণ্ড্য রাজার আমলে অগস্ত্য দক্ষিণভারতে গমন করত দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা আরব্ধ করেন, এবং রাজা তদীয় শিষ্যত্ব স্বীকার করিলে তাঁহার জন্য নানা পুস্তক লিখেন, অবশেষে স্বর্গে গমন করত নক্ষত্র-বিশেষরূপে বিরাজ করিতেছেন। কুমারিকা অন্তরীপের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে অগস্ত্যের পূজা হইয়া থাকে; বিগ্রহের নাম "অগস্ত্যেশ্বর", লোকের বিশ্বাস এই, ইনি এখনও ধরাতলে জীবিত আছেন, পশ্চিম-ঘাট পর্ব্বতের কোন স্থানে লুকাইয়া রহিয়াছেন। তদীয় আশ্রয়-গিরিকে "অগস্ত্য গিরি" বলে। অনেকে অনুমান করেন, অগস্ত্য মুনি পাণ্ড্য অক্ষরের সৃষ্টি করেন, এবং প্রথম পাণ্ড্য ব্যাকরণ লিখেন, ইনিই পাণ্ড্যদিগকে চিকিৎসা শাস্ত্রের মূলশিক্ষা, যাদুবিদ্যা, ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তর উপদেশ দেন। নানা বিষয়ে ৫০ খানি পুস্তক আছে, ইহার অধিকাংশই আধুনিক; কিন্তু লোকে বলে, তাঁহার রচিত। উত্তর-ভারতে যেমন লোকে পুস্তক রচনা করিয়া, কোন সুবিখ্যাত গ্রন্থকারের রচিত বলিয়া প্রকাশ করিত, দক্ষিণ ভারতেও অনেক গ্রন্থকার তাই করিয়াছেন।

অনুমান খ্রীঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে বিজয় সিংহ মগধ দেশ হইতে সিংহলে গমন করেন, বোধ হয়, উত্তর ভারতের আর্য্য-সভ্যতা তাঁহারই সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে নীত হয়, কিন্তু বদ্ধমূল হইতে বহু শতাব্দী লাগিয়াছিল। ৬৪০ খ্রীঃ অব্দে জনৈক চীনদেশীয় ভ্রমণকারী দেশ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে পাণ্ড্য দেশে আইসেন, তিনি বলিয়াছেন যে, তৎকালে এই দেশের নিবাসি-দিগের অধিকাংশ দিগম্বর জৈন ছিল। খ্রীষ্টাব্দের অষ্টম বা নবম শতাব্দী হইতে দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাণ্ড্য ভাষায় জৈনধর্ম্ম সংক্রান্ত সাহিত্যের প্রাদুর্ভাব ছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজা সুন্দর পাণ্ড্য জৈনদিগকে পাণ্ড্য দেশ হইতে দূর করিয়া দেন, এরূপ কথিত আছে।

"কুবল" নামে এক খানি কাব্যগ্রন্থ আছে, ইহার রচকের নাম তিরু বল্লুবার। অনুমান দশম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ রচিত হয়। ইহার বিষয় যেমন গুরুতর, ইহার রচনাও তেমনি মধুর, ফলে এমন সুরচিত গ্রন্থ পাণ্ড্য ভাষায় আর নাই। লোকে বলে, কবি অতি নীচ (পারিয়া) জাতীয় ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায়ও নীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় এমন গ্রন্থ নাই। একটী পদের অনুবাদ দেওয়া গেলঃ—

"যিনি পবিত্র জ্ঞানময়, তাঁহার চরণে যদি যোগ্য ভক্তি পুষ্পা-ঞ্জলি না দেওয়া হইল, তাহা হইলে মনুষ্যজ্ঞানের ফল কি?"

আর এক খানি কাব্যের নাম "চিন্তামণি," ইহাতে ১৫,০০০ পংক্তি কবিতা আছে; ইহা নিশ্চই কোন জৈন করিব রচিত। ইহার রচণাপ্রণালী কম্বনকৃত পাণ্ড্য রামায়ণের রচনা অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। বিদ্যালয়ে কতকগুলি সংক্ষিপ্ত পদ্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, লোকে বলে তিরুবল্লুবারের ভগিনী অরিয়ার এগুলির প্রণেত্রী।

কতকগুলি স্তোত্র আছে, এগুলি দুই খণ্ডে বিভক্ত। কথিত

আছে যে, পাণ্ড্যবংশীয় শেষ রাজা সুন্দর পাণ্ড্যের রাজত্ব কালে যখন শৈব ধর্ম্মমত পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তৎকালে এই সকল স্তোত্র সঙ্কলিত হইয়াছিল। শৈব সম্প্রদায়ের লোকেরা এই গ্রন্থকে "পাণ্ড্যবেদ" বলিয়া মানে। "চতুঃসহস্র পদাবলি" নামে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক প্রকাণ্ড গ্রন্থ আছে, তাহাকেও বৈষ্ণবেরা "পাণ্ড্য বেদ" বলে।

বিশপ কাল্‌ডোয়েল বলেন।—

"বিগত দুই শত বৎসরের মধ্যে দ্রাবিড়ীয় সাহিত্যের বড় একটা উন্নতি হয় নাই। দেশীয় লোকেরা বলে যে, বিদেশী লোকেরা দেশাধিকার করাতে উৎসাহের অভাবে সাহিত্যের উন্নতি হয় নাই। কিন্তু ফলে তাহা নয়, বহি লিখিয়া কোন বিখ্যাত গ্রন্থকারের নাম দিয়া তাহা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করিলেই ক্রমে সাহিত্যের অবনতি ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

"এক্ষণে দেশীয়দিগের বিদ্যাশিক্ষার প্রকৃত পক্ষেই উন্নতির আরম্ভ হইয়াছে, ইউরোপীয় বিদ্যা, ইউরোপীয় সভ্যতা এবং ইউরোপীয় খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের মর্ম্ম ও উপকারিতা লোকে জ্ঞাত হইতেছে, এবং বুঝিতেছে, এখন দ্রাবিড়ীয় লেখকেরা স্বাধীন ভাবে পুস্তক লিখিবেন, ও নিজ ২ নামে প্রকাশ করিবেন, সন্দেহ নাই।"

১৮৮৮ শালে তামিল ভাষায় ৪২৯ খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়। পুস্তক গুলির আলোচ্য বিষয় এই;—ধর্ম্ম, ২২৫; পদ্য, ৫০; ভাষা, ৩৪; আখ্যায়িকা, ২২; বিজ্ঞান, ১৯; নাটক, ১৪; ইহার মধ্যে ২৪৪ খানি পুনঃমুদ্রিত। এই সকল পুস্তক সম্বন্ধে মান্দ্রাজের সরকারি রেজিষ্টার কৃষ্ণ মাচারিয়ার লিখিয়াছেন,—

"সমস্ত বৎসরে যে সকল পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, সে সকলের আলোচনা করিলে দেখা যায়, (১) সংক্ষিপ্তসার, টীকা, ভাষ্য, ইত্যাদি প্রকাশ করণের রোগটা দিন দিন বাড়িতেছে;

(২) ইংরাজি ভাষাজ্ঞদিগের মধ্যে নহে, কিন্তু যাঁহারা ইংরাজি জানেন না, তাঁহাদের অনেকের গদ্য সাহিত্যের স্বাদবোধ অনেকটা হইতেছে; (৩) এবং শিক্ষিত সমাজে সামাজিক ও ধর্ম্মসংক্রান্ত সংস্কারের বিলক্ষণ ইচ্ছা দেখা যায়।”

মান্দ্রাজে সন্ধ্যাবেলা একটা বাজার বসে, সেখানে পুস্তক-বিক্রেতারাও বই লইয়া আইসে। ইহার অধিকাংশ সে কেলে গ্রন্থের পুনঃসংস্করণ। সচরাচর স্কুলের পাঠ্য পুস্তকেরই কাট্‌তি বেশি।

সংবাদপত্রসম্বন্ধে দক্ষিণ-ভারতের লোকেরা বড় পশ্চাতে পড়িয়া আছে। ভারতের অন্যান্য অংশে দেশীয় লোকের দ্বারা সম্পাদিত সংবাদপত্রের সংখ্যা যত, দক্ষিণ-ভারতে তত নহে। কিন্তু সংখ্যায় কম হইলেও, দক্ষিণ-ভারতের সংবাদপত্রের গুণ বেশি। “হিন্দু” নামে একখানি ইংরাজি দৈনিক সংবাদ পত্র দেশীয় লোকের দ্বারা সম্পাদিত; এখানি অতি উৎকৃষ্ট কাগজ। সম্পাদক বিলক্ষণ স্বদেশানুরাগী, কিন্তু কলিকাতার কোন কোন সম্বাদপত্রের ন্যায় ইনি হিংসাভাবের উত্তেজনা করেন না। সম্পাদকের নাম সুব্রহ্মণ্য আইয়ার, সুপরিমিত উৎসাহসহকারে ইনি সমাজসংশোধনের আবশ্যকতা প্রদর্শিত করিয়া থাকেন। আমাদিগের বিদ্যাসাগরের ন্যায় ইনিও মুখে ও কলমে যাহার পোষকতা করিয়া থাকেন, কার্য্যেও তাহাই করিয়াছেন।

“ভারতবর্ষীয় সমাজসংশোধক” নামে আর একখানি উত্তম কাগজ আছে। মান্দ্রাজের “খ্রীষ্টীয়ান দেশহিতৈষী” ইংরেজি কাগজ, এখানিও অতি চমৎকার। বঙ্গদেশের বাঙ্গালি খ্রীষ্টীয়ানদিগের এমন কাগজ নাই।

মালাবারি।

পাণ্ড্য• ভাষার পরেই মালাবারী ভাষার উল্লেখ করা বিহিত, কেননা মালাবারী পাণ্ড্য ভাষার অতি প্রাচীন শাখা। ত্রিবনদ্রুম হইতে মাঙ্গালোরের নিকটস্থ চন্দ্রগিরি পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল-নিবাসী লোকেরা এই ভাষা বলে। মালাবার শব্দের অর্থ "পর্ব্বতময় দেশ।" সংস্কৃত ভাষায় এই দেশকে "কেরল" বলে।

দেশটী প্রধানতঃ পর্ব্বত ও উপত্যকাময়। মধ্যে২ পূর্ব্ব দিক হইতে পশ্চিম দিকে নদীনালা বহিয়া গিয়াছে। তাহাতে বড় বড় ঝিল হইয়াছে, এই সকল ঝিলের সঙ্গে সমুদ্রের যোগ আছে। রাস্তা ঘাট ভাল নাই। কেবল এই সকল নদী-নালা দিয়া নৌকা-যোগে লোকে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। এ অঞ্চলে গ্রাম নাই, অর্থাৎ কাছা-কাছি, বা পূর্ব্ববাংলার কোন কোন স্থানের ন্যায় লোকে চালে চালে ঘর বান্ধিয়া বাস করে না। জলা ধান জমির নিকটে বা নদার তীরে এক এক জন নিজ নিজ তালবাগানে বাস করে।

কালীকুট নামে একটী বন্দর আছে। ১৪৯৮ শালে ভারতবর্ষের এই বন্দরে পর্ত্তুগিজেরা প্রথমে জাহাজ লাগাইয়া ডাঙ্গায় নামে।

ভাষা।—প্রায় ৫০ লক্ষ লোকে মালাবারী ভাষায় কথা কহে। ইহাতে অনেক সংস্কৃত ধাতুমূলক শব্দ আছে, দ্রাবিড়ীয় আর কোন ভাষাতে এত সংস্কৃত-মূলক শব্দের ব্যবহার নাই। গ্রন্থের অক্ষরই মালাবারী ভাষার অক্ষর; এই অক্ষরে পাণ্ড্য দেশে সংস্কৃত লিখিত হইয়া থাকে।

মালাবার উপকূলের মুসলমানেরা এবং লাক্ষাদ্বীপের নিবাসিরা এক প্রকার মালাবারী ভাষা কহে, তাহাকে মাপিলা বা

মোপ্লা কহে। এই ভাষাতে বিস্তর আরবি ও পারসি শব্দ আছে। আরবি অক্ষর একটু রূপান্তর করিয়া লইয়া মুসলমানেরা তাহাতেই আপনাদিগের ভাষায় পুস্তক লিখে।

নিবাসী।—মালাবার দেশের দক্ষিণ সীমানায় ত্রিবাঙ্কোর; ব্রাহ্মণেরা এই দেশকে "ধর্ম্মভূমি" বলিয়া থাকেন; কথাটী মিথ্যা নয়। কারণ ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে ব্রাহ্মণভোজনে এত টাকা ব্যয় হয় না। একটী ক্রিয়া উপলক্ষ্যে মহারাজা স্বয়ং অল্পক্ষণ মাত্র দেশস্থ প্রধান ব্রাহ্মণের পাল্কির বাহক হয়েন; পরে তাঁহার পা ধুইয়া দিয়া পাদোদক পান করেন। ত্রিবাঙ্কোরের রাজবংশ শূদ্র জাতীয়; কিন্তু সিংহাসনে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে, একটী সুবর্ণময়ী গাভী বা পদ্মের মধ্য দিয়া গিয়া রাজা দ্বিজত্বপ্রাপ্ত হয়েন। রাজা নিজে যত ভারী, সোণার গাভীও তত ভারী; ক্রিয়ান্তে গাভীটা ভাঙ্গিয়া সোণা ব্রাহ্মণদিগকে বিতরণ করিয়া দেওয়া হয়। এই অবধি মহারাজা আর স্বীয় জ্ঞাতি গোষ্ঠীর সহিত বসিয়া আহার করিতে পারেন না—তাঁরা শূদ্র যে!—আবার ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে বসিয়াও আহার করিবার যো নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা আহারে বসিলে, দাঁড়াইয়া দেখিতে এবং তাঁহাদের সাক্ষাতে বসিয়া নিজেও আহার করিতে পারেন; ইহাও সামান্য সৌভাগ্যের বিষয় নহে।

শূদ্রেরাই ত্রিবাঙ্কোরের মধ্যম শ্রেণীর লোক। দেশের অধিকাংশ ভূমিই ইহাদের হস্তগত। অতি অল্প কাল পূর্ব্বে ইহাদের যত কৃতদাস ছিল, দেশের আর কোন শ্রেণীস্থ লোকের তত দাস ছিল না। ইহাদিগকে সচরাচর লোকে "নায়ার" বলে, ইহায় অর্থ, কর্ত্তা, মহাশয়। ইহাদিগের বিবাহপ্রণালী বড় চমৎকার! অতি বাল্যকালে বালিকাদিগের বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু এ কেবল নামমাত্র বিবাহ; আইবুড় নাম দূর করা ইহার উদ্দেশ্য। কিন্তু মেয়েরা প্রাপ্তযৌবনা হইলে, যাহার সহিত

ইচ্ছা, তাহার সহিত ঘর করিতে পারে; বাল্যকালে যে বিবাহ হইয়াছিল, তাহাতে শেষে কোন বাধা জন্মিতে পারে না। এই জন্য ত্রিবাঙ্কোরে লোকে পিতার বিষয় পায় না, মাতুলের বিষয়ের অধিকারী হইয়া থাকে। এদেশে কোন কোন স্থলে এক স্ত্রীর একাধিক স্বামীও আছে। ইহা দেশাচার অনুমোদিত।

এই দেশে পুলেয়ান নামে এক জাতি আছে। ইহারা দাস্যবৃত্তি করিয়া খায়। ব্রাহ্মণ দেখিলে ইহাদিগকে ৯৬ পদ দূরে থাকিতে হয়; নায়ার জাতীয় লোকেরা ব্রাহ্মণের নিকটবর্ত্তী হইতে পারে, তাহাতে কোন দোষ নাই; কিন্তু ব্রাহ্মণকে স্পর্শ করিবার অধিকার তাহাদের নাই। যাহারা তাল গাছ হইতে তাড়ি পাড়িয়া খায়, ব্রাহ্মণ দেখিলে তাহাদিগকে ৩৬ পদ দূরে থাকিতে হয়। ত্রিবাঙ্কোর দেশে ব্রাহ্মণদিগের বড় প্রাদুর্ভাব। এক্ষণে এদেশেও বিদ্যাশিক্ষা দিন দিন বিলক্ষণ প্রচলিত হইতেছে। বাঙ্গালিরা যেমন শিক্ষাপ্রভাবে ক্রমে ক্রমে জাতিভেদের অনিষ্টকারিতা টের পাইয়াছেন, ত্রিবাঙ্কোরেও তাই হইবে।

ধর্ম্ম।—মালাবার দেশের অধিকাংশ লোকই হিন্দু; কিন্তু এদেশে যত খ্রীষ্টীয়ান, ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশে তত নাই। খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মশিক্ষক পাঠাইবার জন্য সিকন্দরিয়া নগরের বিশপ অনুরুদ্ধ হয়েন, তদনুসারে তিনি পন্তিনুস্ নামক জনৈক বিদ্বান ব্যক্তিকে ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন। আমরা যত দূর জানি, ইহাঁর পূর্ব্বে আর কোন খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মপ্রচারক ভারতবর্ষে আইসেন নাই। চতুর্থ শতাব্দীতে কতকগুলি স্থরীয় খ্রীষ্টীয়ান মালাবার উপকূলবর্ত্তী অঞ্চলে আসিয়া বসতি করিতে আরম্ভ করে। মালাবারের রাজা ইহাদিগকে বড় অনুগ্রহ করিতেন, এবং ইহাদের বিশপের হাতেই ইহাদের সমাজের সকল প্রকার শাসনভার ছিল। শেষে পর্ত্তুগিজেরা ভারতবর্ষে আসিয়া স্থরীয় খ্রীষ্টীয়ানদিগকে রোমাণ কাথ-

লিক হইতে লওয়ায়। তাহাতে কেহ কেহ রোমাণ কাথলিক মতাবলম্বন করে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই পূর্ব্বমত ত্যাগ করে নাই। ১৮:৬ শালে মালাবার উপকূলে প্রটেষ্টাণ্ট মিশ-নের আরম্ভ হয়।

রোমাণ কাথলিক মালাবারী খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৩৮০,০০০; স্থরীয় খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ন্যূনাধিক ৩০০,০০০।

সাহিত্য।—দ্রাবিড়ীয় ভাষা-পরিবার ভুক্ত আর সকল ভাষা অপেক্ষা মালাবারী ভাষা অধিক পুরাতন নহে। খান-কতক তাম্রলিপিও আছে, সত্য বটে, তদ্ভিন্ন "রামচরিতই" এই ভাষার সর্ব্বপ্রাচীন পদ্যময় পুস্তক। পর্ত্তুগিজদিগের আসিবার শত বৎসর পূর্ব্বে, এবং এক্ষণে মালাবারী ভাষা লিখিতে যে সংস্কৃত বর্ণমালার ব্যবহার হয় তাহাও প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে, এই রামচরিত রচিত হইয়াছিল, তাই ইহাতে ভাষার আদিম ভাব অনেকটা দেখিতে পাওয়া যায়। মহাভারত, রামায়ণ, ও নানা পুরাণও পদ্যে অনু-বাদিত হইয়াছে; এ সকল ত দুই তিন শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

১৮৮৮ শালে মালাবারী ভাষায় ৭২ খানি পুস্তক প্রকাশিত হয়।

এদেশে মুসলমান আছে, তাহাদিগকে মাপিলা বা মোপ্লা বলে, তাহাদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষ। মান্দ্রাজের খানেস্থমারি রিপোর্টে লিখিত হইয়াছে, "ইহারা স্থানীয় দ্রাবিড়ীয় লোক; তবে কাহার কাহারও দেহে আরবশোণিতের আভাষ থাকিতে পারে, কিন্তু সে বহু কালের কথা, কেবল পিতা আরব, মাতা চিরকালই দ্রাবিড়ীয় ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক অনেকে এক বারে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করাতে ইহাদের সংখ্যার বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। অনেক মাপিলা মুসলমান দায়ভাগ মতে উত্তরাধিকারস্বত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে; আবার হিন্দু থাকিতে যাহারা যে প্রকার

শিল্পকার্য্য করিত, মুসলমান হইয়া তাহা পরিত্যাগ করে নাই, বরং সেই ব্যবসায়দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছে। উপকূলে যাহাদিগের বাস, তাহারা মৎস্যধারী, জাহাজের খালাসি, এবং কুলির কাজ করে; অন্যত্র কৃষিকার্য্যদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কর্ণাট।

মহীশূরের সমস্ত অধিত্যকানিবাসী এবং তথা হইতে উত্তর দিকে নিজামরাজ্যের বিদের নামক স্থান পর্য্যন্ত লোকেরা কর্ণাটিকা ভাষা বলে। পশ্চিম-উপকূলে কনারা অঞ্চলেও এই ভাষা প্রচলিত। ক্ষেত্রপরিমাণ ৩৩ হাজার বর্গক্রোশ হইবে।

মহীশূরে এখানে একটা, সেখানে একটা, এই প্রকার কতকগুলি শৈল আছে, দেশের লোকেরা সে গুলিকে "দ্রুগ্" বলে, "দ্রুগ্" সংস্কৃত "দুর্গ" শব্দের অপভ্রংশ। এই সকল উচ্চ শৈলে উঠা অতি দুঃসাধ্য। সে কালে এই সকল শৈলে রাজারা দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

ভাষা।—কম হইলেও ৯০ লক্ষ লোকে কর্ণাটিকা ভাষায় কথা কহে, বর্ণমালা অনেকটা তৈলঙ্গী বর্ণমালার সদৃশ। কর্ণাটিকা দুই প্রকার—সাবেক এবং আধুনিক। কর্ণাটিকা ভাষার প্রাচীন কালের যত তাম্র বা শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, সে সকলের অধিকাংশ সংস্কৃত অক্ষরে লিখিত।

নিবাসী।—কর্ণাটিকেরা কৃষিজীবী। ইহারা পুরাতন বিষয় বড় ভাল বাসে, নূতনের গোঁড়া নহে। ইহাদের প্রধান খাদ্য রাজি। কথিত আছে যে, রামের মিত্র সুগ্রীব এই দেশের রাজা এবং হনুমান তাঁহার সেনাপতি ছিলেন। ১১১৮ হইতে ১৫৬৫

খ্রীষ্ট অব্দ পর্য্যন্ত বিজয়নগরে কোন হিন্দু রাজবংশ অতি প্রতাপসহকারে রাজত্ব করেন। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ-তীরে এই প্রবলপ্রতাপ রাজবংশের দ্বারা নির্ম্মিত দেবালয়ের, দুর্গের, দীর্ঘিকার, এবং সেতুর ভগ্নাবশেষ রাশি রাশি ইট-পাথর পড়িয়া রহিয়াছে। গত শতাব্দীতে হায়দর-আলির বাহুবলে মহীশূর কিছু দিন বিলক্ষণ প্রতাপশালী রাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

ধর্ম্ম।—অতি প্রাচীন কাল হইতে খ্রীষ্টাব্দের প্রথমাংশ পর্য্যন্ত কর্ণাট দেশে জৈন ধর্ম্মের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। মহীশূর রাজ্যের হাসান জিলার কোন নগরে গোমতেশ্বর নামক তীর্থঙ্করের বিখ্যাত প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে। এই মূর্ত্তি প্রায় ৪০ হাত উচ্চ, একখানি আদত পাথর কাটিয়া, এই মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। একটা শিলাময় পাহাড়ের চূড়ায় মূর্ত্তিটা দণ্ডায়মান, অনেক ক্রোশ দূর হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। জৈনেরা বলে যে, তাহাদিগের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভ বড় দীর্ঘকায় ছিলেন,—পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত শিকি ক্রোশেরও বেশি। ২৪শ তীর্থঙ্কর বিকৃতিপ্রাপ্ত হইয়া সাধারণ মনুষ্যাকার ধারণ করেন। মূর্ত্তিটী দিগম্বর, সুতরাং বোধ হয়, এই মূর্ত্তির নির্ম্মাণকর্ত্তা দিগম্বর-জৈন-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিলেন। ২০ বৎসরে এক বার এই মূর্ত্তির স্নান হয়। এই সমারোহ কালে অনেকে এই পাহাড়ে গিয়া থাকে।

কর্ণাট দেশে যত লিঙ্গোপাসক আছে, এত ভারতবর্ষের আর কোন দেশে নাই। লিঙ্গোপাসকদিগকে আবার বীর-শৈব বলে। ইহারা শৈবদিগের ন্যায় শিব-শক্তি উভয়ের উপাসনা করে না, কেবল শিবলিঙ্গের আরাধনা করিয়া থাকে। ফলতঃ ইহারা যোনি-উপাসক নহে। ধাতুনির্ম্মিত একটা ছোট্ট কৌটার ভিতর একটী ধাতুময় লিঙ্গ রাখিয়া, ইহারা সর্ব্বদা কৌটাটী গলায় ধারণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে লোকে লিঙ্গধারী বলে। ইহাদিগের আর এক নাম "জঙ্গম" অর্থাৎ শিবের গতিশীল জীয়ন্ত)

নিদর্শন। এই সম্প্রদায়ের উদাসীনেরা একটা ষাঁড় সঙ্গে করিয়া বেড়ায়, এটাও শিবের ষাঁড়ের প্রতিনিধি। ইহারা আপনাদিগকে বীর বলে, তাহার কারণ এই যে, এক সময়ে দক্ষিণাবর্ত্তের অনেক স্থানে ইহারা বাহুবলে জৈনমতাবলম্বিদিগকে নির্ম্মূল করিয়াছিল।

এক সময়ে "কল্যাণ" নামে দক্ষিণাবর্ত্তে এক বিস্তৃত সাম্রাজ্য ছিল। কল্যাণরাজ্যের এক সময়কার প্রধান মন্ত্রীর নাম ছিল বাসব। ইনিই লিঙ্গোপাসক সম্প্রদায়ের স্থাপনকর্ত্তা। বাসবের পিতামাতা অতিশয় শিবপরায়ণ ছিলেন। এই পুণ্যগুণে শিবের বাহন নন্দী নামক ষণ্ড তাঁহাদিগের পুত্ররূপে ধরাতলে জন্মগ্রহণ করে। উপনয়নের উপযুক্ত বয়স হইলে, পিতামাতা বাসবের উপনয়নের আয়োজন করিলেন, কিন্তু বাসব কোন মতে যজ্ঞোপবীত ধারণ, বা শিব ছাড়া আর কাহাকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিলেন না। বাসব বড় হইয়া কল্যাণ-রাজধানীতে গিয়া শেষে এক মন্ত্রীর কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন। শ্বশুরের মৃত্যু হইলে বাসব তদীয় পদে নিযুক্ত হইলেন। কথিত আছে যে, বাসব ও তাঁহার শিষ্যেরা নানাবিধ আশ্চর্য্য কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহাঁরা কতকগুলি মটর কলাই হাতে লইয়া, সেগুলিকে মুক্তা করিতেন, এবং লুক্কায়িত ধনরাশি বাহির করিয়া দিতেন। একদা দুই জন শিবোপাসককে আনাইয়া কল্যাণের রাজা তাহাদের চক্ষু তুলিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। ইহাতে নিতান্ত মনোপীড়া পাইয়া, বাসব রাজধানী ত্যাগ করিয়া, সঙ্গমেশ্বর নামক স্থানে চলিয়া গেলেন। গমন কালে কল্যাণ রাজধানীকে শাপ দিয়া গেলেন, বাসবের শাপে, কল্যাণ নগরের লোকেরা পরস্পর ভয়ানক যুদ্ধ করিল, সেই যুদ্ধে নগরটি এক বারে ধ্বংস হইয়া যায়।

বাসব সঙ্গমেশ্বরে থাকিয়া শিষ্যদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। অবশেষে এক দিন হরপার্ব্বতী উভয়েই সঙ্গমেশ্বর মন্দিরস্থ লিঙ্গ

হইতে বাহির হইয়া বাসবকে দেখা দিলেন। অনন্তর তাঁহারা বাসবকে মন্দির মধ্যে লইয়া গেলেন, এমন সময়ে অকস্মাৎ তিন জনেই অন্তর্ধান হইলেন।—আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং শিষ্যেরা বাসবের শিবত্ব প্রাপ্তির ঘোষণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। অলম প্রভু নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, লোকে তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া মানিল। বাসবের স্থলে ইনি গুরু হইলেন। গুরু হইয়া কল্যাণ নগরে রাজবিপ্লব উপস্থিত করেন, তাহাতে বিজল নামক রাজা হত হন। তদবধি এই নূতন ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হয়।

কর্ণাট দেশের প্রধান প্রধান স্থানে মিশনরিরা স্কুল স্থাপন করিয়া লোকদিগকে সনাতন খ্রীষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দিতেছেন।

সাহিত্য।—কর্ণাটিকা সাহিত্যের প্রধান অনুষ্ঠানকর্ত্তা জৈনেরা; ইহারা সংস্কৃত এবং দক্ষিণাবর্ত্তের দেশীয়, এই উভয় ভাষারই আলোচনা করিত। চতুর্থ শতাব্দীর রচিত সংস্কৃত গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। কেশব নামে জনৈক পণ্ডিত সে কালের কর্ণাটিকা ভাষায় একখানি ব্যাকরণ সঙ্কলিত করেন, ইহার নাম "শব্দমণি দর্পণম্." ইহার তুল্য আর কোন ব্যাকরণের আদর নাই। ইনি যে সকল কবিদের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদিগের অধিকাংশ জৈন। কেশব তৎপূর্ব্ববর্ত্তী একাদশ জন কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অনেক অজ্ঞাতনামা কবির কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই সকল কবির রচনাকে কেশব প্রাচান কালের কর্ণাটিকা ভাষা বলিয়াছেন, এক্ষণে তাঁহার লেখাকেই লোকে প্রাচীন কালের ভাষা বলে। বোধ হয়, দ্বাদশ শতাব্দীতে ইহাঁর প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। এক্ষণে কর্ণাটিকা ভাষায় যে সকল সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার হইতেছে, কেশবের সময়ের লেখকেরা সে সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। কর্ণাটীয়েরা "অমরকোশ" অভিধানের টীকা লিখিয়াছিল।

লিঙ্গোপাসকেরাও কতকগুলি পদ্যগ্রন্থ লিখিয়াছে। "বাসব-পুরাণ" তাহাদিগের অতি আদরের গ্রন্থ। আর এক খানি প্রাচীন গ্রন্থের নাম "প্রভুলিঙ্গলীলা"। ইহাতে অলম প্রভুর ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ইনি অবশেষে কল্যাণপুরস্থ গুরুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ গ্রন্থ পাণ্ড্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

কর্ণাটিকা ভাষায় শৈব ও বৈষ্ণবদিগেরও অনেক গ্রন্থ আছে।

১৮৮৮ শালে ব্রিটিশ এলাকায় কর্ণাটিকা ভাষার ৭৮ খানি এবং মহীশূরের রাজার এলাকায় ৭৬ খানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

নীলাচলবাসী।

মহীশূরের উত্তর দিকে নীলগিরি নামক পর্ব্বতে "তুদা" নামে এক জাতীয় লোক বাস করে, ইহাদের সংখ্যা অতি অল্প। ইহা-দিগকে এই পাহাড়ের আদি নিবাসি বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু এই পাহাড়ের অপর জাতীয় লোকেরা ইহাদিগকে আপনাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মানে। নীলাচলের শিখরদেশে বিস্তর কবর রহিয়াছে, তুদারা সে সকলের বিষয় কিছুই জানে না, এবং বলিতেও পারে না। কবরের উপরে বড় বড় আদত পাথর চাপা দেওয়া রহিয়াছে। পাথর সরাইলে দেখিবে, নীচে মাটীর পাত্রে ভস্ম, আধপোড়া অস্থি, বাঘের ও হরিণের মূর্ত্তি, বড়শার ফলার মত ধাতুখণ্ড রহিয়াছে। এই সকল কবর খুলিতে গেলে তুদারা কোন আপত্তি করে না; যদি এ সকল তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কবর হইত, তাহা হইলে ছুঁইতেই দিত না।

তুদাদিগের দেহের গঠন ভাল, ইহারা বিলক্ষণ বলবান, নাক বড় এবং গরুড় পাক্ষীর চঞ্চুর ন্যায় বক্র। কিন্তু ইহারা বড়ই অলস, কোন প্রকার কাজই করিতে চাহে না। গোচারণ,

গোদোহন, এবং ঘৃত প্রস্তুত করাই ইহাদের কাজ, আর কিছুই করে না। ইহারা কোমরে কাপড় পরে না, খুব বেশি বহরের এক খানা মোটা চাদর গায়ে দেয়, তাহাতে গলা হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত ঢাকা থাকে; ইহারা মাথার চুল ও দাড়ি কামায় না, বা ছাঁটে না। ইহারা তাম্রবর্ণ। পাগড়ি বা টুপি পরার রীতি ইহাদের ছিল না; তবে আজ কাল কেহ কেহ পরিয়া থাকে; স্ত্রীলোকেরা মোটা মোটা হাঁসুলি পরে, অনেকেই মুক্তকেশী, কেহ কেহ বিনুনী করিয়াও থাকে। ইহারা গলায়, হাতে, ও ওষ্ঠে উল্কি পরে।

পূর্ব্বে তুদাদিগের ভাষা সাবেক কর্ণাটিকা ছিল, কিন্তু এক্ষণে প্রায় পাণ্ড্য হইয়া পড়িয়াছে। জন্মাবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত ইহারা ক্কচিৎ স্নান করে ও কাপড় কাচে। বাঁশের চটা তুলিয়া তাহাই খুব ঘন করিয়া বুনিয়া, ইহারা ঘরের বেড়া দেয়, ও চাল ছায়। ঘরের পিছন দিকের বেড়া খুব শক্ত, সম্মুখের বেড়ায় যে দ্বার রাখে, তাহা এত ছোট যে, হামাগুড়ি দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতে হয়।

তিব্বতের ন্যায় তুদা জাতিতে এক স্ত্রীর বহুস্বামী হইয়া থাকে। দুই তিন ভ্রাতায় মিলিয়া এক স্ত্রীকে বিবাহ করে। এই স্ত্রী পালা করিয়া এক এক জনের সঙ্গে এক এক মাস বাস করে। সন্তানগুলি বড় ভায়ের সন্তান বলিয়াই বিখ্যাত হয়। ভ্রাতারা যাহা উপার্জ্জন করে, ঐ স্ত্রীর সন্তানেরা তাহার উত্তরাধিকারী হয়। পূর্ব্বকালে ইহারা কন্যাসন্তান মারিয়া ফেলিত, কেবল একটী মাত্র রাখিত, এখন ব্রিটিশ রাজ্যের এলাকায় আসিয়াছে বলিয়া তুদারা কন্যাহত্যা করিতে পারে না।

তুদারা মহিষও পোষে, কিন্তু মহিষকে বড় মানে। সন্ধ্যা কালে মহিষগুলি মাঠ হইতে গৃহে আসিলে গৃহস্থেরা তাহাদিগকে প্রণাম করে। কোন কোন মহিষী দেবতার ন্যায় মানিতা হয়;

সে মহিষী কেহ দুহে না, মাঠে মাঠে যথেচ্ছা চরিয়া বেড়ায়। কোন কোন মহিষও দেবতা বিশেষ; লোকে ভক্তিভাবে সে গুলির পূজা করে। এ প্রকার মহিষ প্রায়ই বনে থাকে, পুরোহিত ভিন্ন আর কাহাকেও বড় একটা দেখা দেয় না; পুরোহিত দুধ ইত্যাদি পূজার সামগ্রী লইয়া গিয়া ইহাকে দেয়। ইহাদের এক "মৃগয়াদেব" আছে, সকলেই তাহার পূজা করে; ইহারই আশীর্ব্বাদে ইহারা বাঘ মারিতে পারে। তাহাদের এক মাত্র প্রার্থনা এই, "সকলেরই মঙ্গল হউক"।

ইহাদের সমাধিক্রিয়া অতি চমৎকার। ইহারা কবর দেয় না, হিন্দুদের মত দাহ করে। দাহ হইয়া গেলে মহিষ কাটিয়া, পাঁচ জনকে ভোজ দেওয়া হয়। ইহাকে "কাঁচা শ্রাদ্ধ" বলে। এক বৎসর পরে "পাকা" শ্রাদ্ধ হয়, এ শ্রাদ্ধের ঘটা বড় বেশি। যাহার যেমন সঙ্গতি, তদনুসারে কতকগুলি মহিষ মারিয়া পাঁচ জনকে ভোজ দিতে হয়। এই ভোজে গ্রামান্তরের লোকেরাও নিমন্ত্রিত হইয়া থাকে।

ইহাদিগের ছেলেদিগকে স্কুলে আনিয়া লেখা পড়া শিখাইবার জন্য ব্রিটিশ রাজকর্ম্মচারিরা অনেকে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু ইহারা কোন মতে কিছু শিখিতে চাহে না।

নীলাচলে আরও চারি জাতীয় লোক আছে; তাহাদের নাম বাদাগা, কোটা, কুরুম্বা, ইরুলা।

বাদাগা জাতীয় লোকেরা উত্তরাংশে বাস করে, অনেকে অনুমান করেন, ন্যূনাধিক তিন শত বৎসর পূর্ব্বে আকাল ও অত্যাচার হেতু উত্তর-প্রদেশ হইতে আসিয়া পর্ব্বতে বাস করিতেছে। ইহারা যে ভাষা বলে, তাহাতে সে কালের কর্ণাটিকা ভাষার কথা বিস্তর। নীলাচলে যত পাহাড়িয়া লোক আছে, তম্মধ্যে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা বহুসংখ্যক, সঙ্গতিপন্ন ও সভ্য। ১৮৮১

শালে ইহাদের সংখ্যা ২৪,০০০ হাজার ছিল। ইহারা তুদা-দিগকে কর দিয়া থাকে।

কোটারা বড় অপরিষ্কার, পশু পক্ষীর পচা মাংস খাইতে বড় ভাল বাসে। ইহারা তুদা এবং বাদাগাদিগের দাস্যবৃত্তি করিয়া খায়।

কুরুম্বা শব্দের অর্থ মেষপালক। ইহারা জঙ্গল হইতে ফল মূল কুড়াইয়া আনিয়া, বিক্রয় করে। সকলেই ইহাদিগের ভয়ে সসংব্যস্ত। ইহাদের কেহ কেহ আবার তুদা ও বাদাগাদিগের পুরোহিত।

ইরুলারা অতি নিম্নস্থ পাহাড়ের গায়ে বাস করে। ইহারা সকল প্রকার পশু পক্ষীর মাংস খায়,—বড় শিকারী।

তুলু।

দ্রাবিড়ীয় ভাষা হইতে তুলু ভাষার উৎপত্তি। বোম্বাই ও কুমারিকা অন্তরীপের মধ্যবর্ত্তী পশ্চিম উপকূলবাসী প্রায় পাঁচ লক্ষ লোকে এই ভাষায় কথা কহে। এ ভাষায় গ্রন্থাদি নাই, লিখিবার জন্য অক্ষরও হয় নাই। মাঙ্গালোরের মিশনরিরা কর্ণাটিকা অক্ষরে তুলু ভাষার বহি ছাপিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এ ভাষায় আর কোন পুস্তক ছাপা হয় নাই। এক্ষণে এই কর্ণাটিকা অক্ষরই তুলু ভাষার অক্ষর হইয়া পড়িয়াছে, এ সত্ত্বেও দ্রাবিড়ীয়-ভাষা-পরিবার মধ্যে এমন মার্জ্জিত ভাষা কমই আছে। পাণ্ড্য ভাষা হইতে এ ভাষা অনেক ভিন্ন, কিন্তু কর্ণাটিকার সহিত ইহার অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। তুলু জাতীয় খ্রীষ্টীয়ানেরা তুলু ও কর্ণাটিকা, এই উভয় ভাষাই লিখিয়া থাকে। তুলু ভাষা যে কখনও লোপ পাইবে, এরূপ বোধ হয় না; তুলুরা আপনাদের ভাষা বড় ভাল বাসে। তুলু শব্দের অর্থ সুশীল, নম্র।

তৈলঙ্গী।

দ্রাবিড়ীয় পরিবারভুক্ত ভাষার মধ্যে তৈলঙ্গী ভাষাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোকের ভাষা। পূর্ব্ব-উপকূলে পুলিকট হইতে আরম্ভ করিয়া চিকাকোল পর্য্যন্ত এই ভাষা প্রচলিত; চিকাকোল হইতে ভাষাটী উড়িয়াত্ব প্রাপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সমুদ্র-কূল হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের প্রায় মাঝা-মাঝি পর্য্যন্ত এই ভাষা গিয়াছে। পুরাকালে গঙ্গার সাগর-সঙ্গম স্থান পর্য্যন্ত তৈলঙ্গী ভাষা প্রচলিত ছিল। পাণ্ড্য দেশে ও মহীশূর রাজ্যে অনেক তৈলঙ্গী ভাষাবাদী লোক গিয়া বাস করিয়াছে। ভূমির পরিমাণ ন্যূনাধিক ৫ লক্ষ বর্গক্রোশ। ১৮৮১ শালে তৈলঙ্গী ভাষাবাদী লোকের সংখ্যা এক কোটি সত্তর লক্ষ ছিল। মহারাষ্ট্রি ভাষাবাদী লোকের সংখ্যাও প্রায় এইরূপ।

ভাষা।—বর্ণমালার আকার অনেকটা কর্ণাটিকা অক্ষরের মতনই। তৈলঙ্গী ভাষা পাণ্ড্য ভাষার ন্যায় মার্জ্জিত, কিন্তু দ্রাবিড়ীয় পরিবারে ইহার ন্যায় মধুর ভাষা আর নাই। ইউরোপে ইতালীভাষা যেমন, ভারতবর্ষে তৈলঙ্গী ভাষা তেমনি মধুর। দেশকে তৈলঙ্গ দেশ বলে। সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা এই দেশকে অন্ধ্র দেশ বলিয়াছেন। পুরাকালের গ্রিক ভূগোলকারেরা বলিয়া গিয়াছেন যে, গঙ্গাতীরে বা গঙ্গার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে অন্ধ্র নামে এক জাতীয় লোক বাস করে।

দ্রাবিড় পরিবারের পাঁচটী ভাষাই বিলক্ষণ সম্মার্জ্জিত। ইহাদের সকলেরই পরস্পর অতি নিকটসম্বন্ধ, কিন্তু পাণ্ড্য ও তৈলঙ্গী ভাষাতে বড় দূরকুটুম্বিতা। এ উভয় ভাষার অনেক শব্দের ধাতু একই, স্বীকার করি; কিন্তু বিভক্তিযোগে এমন আকারপ্রাপ্ত হয় যে, আর চিনিতে পারা যায় না।

লোক।—প্রাচীন কাল হইতেই অন্ধ্র ও কলিঙ্গ, এই দুই

শ্রেণীর তৈলঙ্গির নাম প্রকাশ আছে। প্রাচীন কালের আর্য্যেরা তৈলঙ্গিদিগকে অন্ধ্র বলিতেন। ঋগ্বেদেও অন্ধ্র নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঋগ্বেদে অন্ধ্রদিগকে অতি অসভ্য বলা হইয়াছে। পরবর্ত্তী কালে অন্ধ্র নামে এক রাজবংশ উত্তরভারতে রাজত্ব করেন। বিক্রমাদিত্য অন্ধ্রবংশীয় রাজা বলিয়া বিখ্যাত। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংবৎ এখনও চলিতেছে। বরুঙ্গল দক্ষিণ-ভারতের কোন রাজধানীর নাম। ১৩০৯ খ্রীঃ অব্দে মুসলমানেরা এই রাজধানী দখল করে। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে মুসলমানেরা এই নগর হইতে তাড়িত হয়। ১৫১২ ও ১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে, হিন্দু-রাজ্যের যে টুকু বাকি ছিল, তাহা গোলকন্দা রাজ্যভুক্ত হইয়া যায়। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা নিজামের নিকট হইতে সমুদ্র-কূলবর্ত্তী অঞ্চল প্রাপ্ত হয়েন।

সে কালে তৈলঙ্গিরা বিলক্ষণ উদ্যোগী লোক ছিল, কিন্তু এক্ষণে ইহাদের সে ভাব আর নাই। প্রাচীন কালে যে রাজারা উপনিবেশ স্থাপন, দেবালয় নির্ম্মাণ এবং যাবা ও সুমাত্রা দ্বীপের উপরেও কর্ত্তৃত্ব করিতেন, তাঁহারা তৈলঙ্গী ছিলেন। খ্রীষ্টাব্দের ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে তৈলঙ্গিরা পাণ্ড্য দেশ বার বার দখল ও লুট পাট করিয়া যাইত, কিন্তু দেশে বাস করিত না। এক্ষণে পূর্ব্বদ্বীপ পুঞ্জে যে সকল লোক ক্লিং নামে বিদিত, তাহারা পাণ্ড্য।

পাণ্ড্য দেশে তৈলঙ্গী ভাষাকে "বাদুগু" বলে, "বাদা" শব্দের অর্থ উত্তর, তৈলঙ্গী দেশ পাণ্ড্য দেশের উত্তরে।

মালাদিগকে গুজরাতে ঢের, এবং পাণ্ড্য দেশে পারিয়া বলে; ইহাদের সংখ্যাও বিস্তর।

ধর্ম্ম।—তৈলঙ্গীপণ্ডিতেরা আপনাদিগের ভাষাকে "ত্রৈলিঙ্গী" বলেন। তৈলঙ্গ দেশে ভারতবিখ্যাত তিনটী লিঙ্গমন্দির আছে। সুতরাং ত্রিলিঙ্গপ্রধান দেশের ভাষাকে পণ্ডিতেরা

ত্রৈলিঙ্গী বলিয়া থাকেন। অধিকাংশ লোক শিবোপাসক, উড়িষ্যার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের লোকে জগন্নাথের উপাসনাও করিয়া থাকে।

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে তৈলঙ্গ দেশে প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ান মিশন স্থাপিত হয় নাই। কয়েক বৎসর ধরিয়া অতি অল্প মিশনারি ছিলেন। ১৮৮১ শালে তৈলঙ্গী প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টীয়ানের সংখ্যা ১৭,০০০ হাজার ছিল।

সাহিত্য।—কণ্ব নামে কোন এক জন মুনি অন্ধ্ররায় নামক রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। এই রাজার শাসনকালে সর্ব্ব প্রথমে তৈলঙ্গ দেশে সংস্কৃত ভাষার আলোচনা হয়। কণ্ব মুনিই তৈলঙ্গী ভাষার সর্ব্বপ্রথম বৈয়াকরণ। নন্নপ নামক ব্রাহ্মণকৃত তৈলঙ্গী ব্যাকরণই সর্ব্বপ্রাচীন,—এ খানি এখনও বর্ত্তমান আছে। ইহার ভাষা সংস্কৃত; ফলে তৈলঙ্গী ভাষার অধিকাংশ ব্যাকরণই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। এই ভাষায় পদ্যময় মহাভারত আছে, কথিত আছে যে, ইহার অধিকাংশ উক্ত ব্রাহ্মণের রচিত। তৈলঙ্গী ভাষায় ইহার তুল্য প্রাচীন রচনা আর বর্ত্তমান নাই।

খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতাব্দীতে চালুক্য বংশীয় কলিঙ্গ-শাখাজাত বিষ্ণুবর্দ্ধন নামে এক রাজা রাজমাহেন্দ্রী নগরে রাজত্ব করেন। কবি নন্নপ উক্ত রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইনি তৈলঙ্গী পদ্যে কতকগুলি ভাষ্য লিখিয়া গিয়াছেন।

দ্বাদশ শতাব্দীর কাছা-কাছি কয়েক খানি পুস্তক রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে তৈলঙ্গী ভাষায় যে সকল প্রাচীন পুস্তক প্রচলিত আছে, সে সকলই প্রায় চতুর্দ্দশ ও তৎ পরবর্ত্তী শতাব্দীতে বিজয় নগরে রাজধানী স্থাপিত হইলে পর লিখিত হয়। অধিকাংশ পুস্তকই অতি অল্পকাল হইল রচিত হইয়াছে।

এক খানি গ্রন্থে ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ে বিস্তর শ্লোক সংগৃহীত

হইয়াছে ; ইহার দুই সহস্র উপদেশ বিমান নামক কবির রচিত বলিয়া বিখ্যাত। এই সকলে একেশ্বরবাদের মত ব্যক্ত ; এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ও ক্রিয়াকলাপের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই কবি ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, লোকে এই প্রকার অনুমান করে। আধুনিক লোকপ্রিয় যে সকল গ্রন্থ আছে, সে সকলের আর বিমানের রচনাপ্রণালী প্রায় একই প্রকার

১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে তৈলঙ্গী ভাষার অক্ষর প্রস্তুত ও ছাপাখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু ১৮৩০ শাল পর্য্যন্ত মুদ্রা কার্য্যের বিশেষ উন্নতি হয় না। ১৮৩৫ শালে মান্দ্রাজ নগরে তৈলঙ্গী ভাষায় কতক কাব্য গ্রন্থ মুদ্রিত হয়।

১৮৮৮ শালে তৈলঙ্গী ভাষায় ২৩১ খানি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। তাহার এক খানি প্রাপ্ত্য "কুরালের" অনুবাদ, পদ্যময়।

কোই।

গোদাবরী নদীর তীরে ইহাদিগের বাস। ইহাদের সমাজে পুরুষপরম্পরাগত এই কথা প্রচলিত আছে যে, দুই শত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত নদীর আরো উজান দিক হইতে তাড়িত হইয়া ইহাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা এই থানে আসিয়া বসতি করিয়াছে। অনেকে ইহাদিগকে খন্দ জাতীয় মনে করেন। কিন্তু ইহাদের স্বতন্ত্র বিবরণ লিখিত হইল।

সচরাচর কোই জাতীয় লোকেরা উপযুক্ত বয়স হইলেই বিবাহ করে, কিন্তু বাল্যবিবাহও প্রচলিত আছে। এক প্রকারের বিবাহ এইরূপে হয় ;—স্ত্রী লোকটী মাথা হেঁট করিয়া দাঁড়ায়, পুরুষটী তাহার মাথার উপরে মাথা রাখিয়া বাঁকা হইয়া দাঁড়াইলে

আত্মীয়েরা পুরুষের মাথায় জল ঢালিয়া দেয়, সেই জল বরের মাথা বহিয়া কন্যার মাথায় গিয়া পড়ে: এই ত বিবাহ হইয়া গেল! অলাবুর বসে করিয়া জল ঢালিতে হয়। কোই কোথাও যাইতে হইলে বসে করিয়া জল লইয়া যায়। হিন্দুস্থানীদের যেমন লোটা সঙ্গের সঙ্গী, বস ইহাদের তেমনি।

ছেলে ও যুবতী স্ত্রী লোক মরিলে ইহারা তাহাদের দেহ পুতিয়া রাখে। সন্তান জন্মিয়া এক মাসের মধ্যে মরিলে বাড়ীর খুব কাছেই পুতিয়া রাখা হয়। বর্ষাকালে চাল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল কবরের উপরে পড়িলে, পোয়াতী আবার অতি শীঘ্র গর্ভবতী হয়, এই ইহাদের বিশ্বাস। বয়ঃপ্রাপ্ত লোক মরিলে দাহ করা হয়. চিতার উপরে শব স্থাপন করিয়া, একটা গাভী বা ষাঁড় বধ করত তাহার লাঙ্গুল কাটিয়া লইয়া, শবের হাতে দিতে হয়।

সৎকার কার্য্য হইয়া গেলে সেই গোরুর মাংস রাঁধিয়া শ্মশান-বন্ধু ও আত্মীয় কুটুম্বগণকে ভোজ দিতে হয়। তিন দিন পরে লোকেরা শ্মশানে গিয়া ধান চাউল ছড়াইয়া দেয়, এবং একটা, বা দুইটা গোবধ করিয়া আবার খাওয়া দাওয়া করে।

ইহাদের বিশ্বাস এই যে, মানুষ মরিয়া পিশাচ হয়, এবং বনে বনে বেড়াইয়া বেড়ায়। আমরা যাহাকে স্বাভাবিক মৃত্যু বলি, ইহারা সে প্রকার মৃত্যু মানে না। কেহ মরিলে ইহারা মনে করে যে, মৃত ব্যক্তির, বা তাহার আত্মীয়গণের কোন শত্রু যাদুকরকে দিয়া বাণ মারিয়াছে, তাই মৃত্যু ঘটিয়াছে। ইংরাজ-দিগের আমলের পূর্ব্বে কেহ মরিলে, তাহার আত্মীয় লোকেরা অনু-সন্ধান করিয়া দেখিত, কাহার্ সহিত ইহার শত্রুতা ছিল। অনন্তর এক জনকে ঠিক করিয়া মৃত দেহটা তাহার উঠানে লইয়া গিয়া ফেলিত, আপনার নির্দ্দোষিতা প্রমাণার্থে তাহাকে তপ্ত জলে বা তপ্ত তৈলে হাত দিতে কহিত। পাঁচ জনে যাহাকে ডায়িনী, বা

যাদুকর বলিয়া বিশ্বাস করিত, কেহ তাহাকে দুই চক্ষে দেখিতে পারিত না। সে কালে এ প্রকার লোককে ধরিয়া মারিয়া ফেলা হইত। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাহা করিতে দেন নাই বলিয়া, লোকে প্রথম প্রথম ব্রিটিশশাসন-প্রণালীর নিন্দা করিত।

ইহারা এক দেবতার পূজা করে, তাহাকে মা মেলী বলে। বৎসরের আরম্ভেই এই দেবতার পূজা দিতে হয়; ইনি প্রসন্ন থাকিলে যথেষ্ট শস্য জন্মে। এই দেবী নরবলি বড় ভাল বাসেন। কিন্তু মহারাণীর রাজ্যে তাহা হইবার যো নাই। তবু, বোধ হয়, ইহারা নরবলি দেয়; প্রতি বৎসর বাস্তার জিলায়, লোকে পথিকদিগকে ধরিয়া গোপনে বলিদান করে।

মহাভারতে লিখিত আছে যে, ধর্ম্মরাজ কুকুর বেশে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সঙ্গে চিরকাল ছিলেন। এই জন্য ইহারা বন্য কুকুরকে পঞ্চপাণ্ডবের দূত বলিয়া মানে। বন্য কুকুরে যদি তাহাদিগের সর্ব্বনাশও করে, তবু একটীও মারে না।

গোদাবরী নদীর উজান দিকে খ্রীষ্টীয়ান মিশনরিরা স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। কতকগুলি লোক খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে।

কোই ভাষা।

নন্ন তেদি, না তোপেনগ্গ, ও ইয়াইপা, নন ন দেবুনি মুন্নে নি মুন্নে পাপম্ তুঙ্গি মিন্নান। লূক ১৫; ১৮।

আন্দামানি।

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রায় ৮০ ক্রোশ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে কতকগুলি দ্বীপ আছে। সে গুলিকে আন্দামান-দ্বীপ-পুঞ্জ বলে। এই দ্বীপ-পুঞ্জের তিনটী দ্বীপই প্রধান, এক একটী প্রায় ২৫ ক্রোশ

দীর্ঘ। এই বড় বড় তিনটী দ্বীপের আশে পাশে কতক গুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। একটী স্বতন্ত্র দ্বীপের নাম ছোট-আন্দামান; এটী বড় দ্বীপ-পুঞ্জ হইতে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণে। এই সকল দ্বীপে চতুষ্পাদ জন্তুর বড় অভাব। এই দ্বীপপুঞ্জ যখন প্রথম আবিষ্কৃত হয়, তখন এখানে কেবল শূকর, ইন্দুর, মন্‌গুজ ছিল, আর কোন চতুষ্পাদ প্রাণী ছিল না; কিন্তু মৎস্য ও কচ্ছপ অপর্য্যাপ্ত ছিল।

অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে. এশিয়া খণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব্ব অংশে এবং পূর্ব্ব আর্কিপিলেগোর দ্বীপপুঞ্জে যে খর্ব্বকায়. কৃষ্ণবর্ণ কোঁকরা চুলবিশিষ্ট এক জাতীয় লোক বাস করিত, আন্দামানদ্বীপবাসিরা তাহাদের সজাতীয়। এই জাতীয় লোকের বংশ অনেক স্থানে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু ইহারা প্রায়ই পর্ব্বতময় দুর্গম স্থানে বাস করে। ইহাদিগকে ইংরাজিতে ছোট কাফ্রি বলে।

ইহাদের মত খর্ব্বকায় মানুষ এশিয়াখণ্ডে আর নাই। স্ত্রীলোক বড় জোর তিন হাত লম্বা। পুরুষ বড় জোর তিন হাত চারি অঙ্গুলি। ইহাদের বর্ণ যে কাফ্রিদের মত নির্দ্দোষ কৃষ্ণবর্ণ, তাহা নহে। ইহাদের মস্তক গোলাকার, ইহাদের মাথার চুল পশমের মত, কিন্তু কোঁকরান। আন্দামানিরা, বলিতে গেলে, উলঙ্গই থাকে, কেবল কতকগুলি গাছের পাতা গাঁথিয়া কোমরে বাঁধিয়া রাখে। মৃত আত্মীয়গণের মাথার খুলি ইহাদের প্রধান অলঙ্কার। বড় যত্নে আন্দামানিরা তাহা গলায় ঝুলাইয়া রাখে। লাল মাটী দিয়া ইহারা সর্ব্বাঙ্গ চিহ্নিত করিয়া থাকে।

ইহারা কৃষিকার্য্য করে না, গ্রাম্য পশুও পোষে না। কিন্তু মাটী দিয়া ইহারা এক প্রকার মোটা-মুটি হাঁড়ি তৈয়ার করিতে জানে। আশামের নাগা কুকিদিগের মত ইহারা মোটা ফাঁপা বাঁশ দিয়া জলপাত্র তৈয়ার করে। মাচ ধরিবার জন্য ইহারা যে জাল বুনে, তাহা বড় চমৎকার; ইহাদের তৈয়ারি চুবড়িও ভাল।

ইহারা হাঁসের মত সাঁতার দিতে, এবং পানি-কৌটীর মত ডুব দিতে পারে। ইহাদের এক প্রকার ডিঙ্গি নৌকা আছে; এই নৌকা অতি সরু, তালের ডোঙ্গার মত। আন্দামানী জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যে দুই হাতে দুইটা মাচ লইয়া উঠে। তীর-ধনুকই ইহাদিগের প্রধান অস্ত্র; পাথর কাটিয়া তাই দিয়া তীরের ফলা তৈয়ার করে। এক্ষণে ইহারা বড়শা ও টেঁটা চালাইতেও জানে। ইংরাজদিগের এই দ্বীপে গমনের পূর্ব্বে নিবাসিরা ধাতু কাহাকে বলে, জানিত না। বন্য শূকর, কচ্ছপের মাংস, বনের ফল মূল, পোকা মাকড়ের ডিম, এবং বনমধু ইহাদের খাদ্য।

বড় বড় গাছের ডাল টানিয়া, নীচু করিয়া বাঁধিয়া রাখে। ইহাই আন্দামানির বাসগৃহ। কেহ মরিলে, গাছের ডাল পালা ভাঙ্গিয়া, এক স্থানে জড় করিয়া, মৃত দেহ চাপা দিয়া রাখে। দেহটা পচিয়া ধসিয়া গেলে লোকে মাথার খুলি ও হাড়গুলি লইয়া অলঙ্কারস্বরূপ পরে। বিধবার প্রধান অলঙ্কার মৃত স্বামীর মাথার খুলি। ছোট আন্দামানের লোকেরা বাঁশ দিয়া গোলাকার বড় বড় ঘর বাঁধে, তাহার এক একটাতে শতাধিক লোক ধরে।

কেহ মরিলে, আত্মীয় জনেরা মাথা কামায়, এবং সাদা মাটী গুলিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপ দেয়। ঈশ্বরের বিষয় ইহারা কিছুই জানে না—কেবল জানে, একটা ভূত আছে, সেই যত রাজ্যের রোগ জন্মায়।

১৭৮৯ শালে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট কয়েদিদিগকে লইয়া গিয়া এই দ্বীপে বসতি করাইতে আরম্ভ করেন, কিন্তু কিছু দিন পরে ক্ষান্ত হয়েন। এক্ষণে আন্দামানে যে কয়েদিদিগের বসতি আছে, ১৮৫৮ শালে তাহার আরম্ভ হয়। স্থানটীর নাম পোর্ট ব্লেয়র। এক্ষণে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণ দিকস্থ দ্বীপে ১২,০০০ হাজার কয়েদী বাস করিতেছে।

নিকোবারী।

নিকোবার আন্দামানের দক্ষিণে, এই দ্বীপপুঞ্জ আন্দামান দ্বীপ-পুঞ্জ অপেক্ষা ছোট। সকলকার বড় দ্বীপটী দীর্ঘে ১৫ ক্রোশ। কোন কোন দ্বীপে মধ্যে মধ্যে ঘন বন, ও মধ্যে মধ্যে সমতল ভূমি আছে; এই সমতল ভূমিতে লম্বা লম্বা ঘাস জন্মে। আন্দামান দ্বীপে নারিকেল বৃক্ষ নাই, কিন্তু নিকোবার দ্বীপপুঞ্জে প্রচুর নারিকেল বৃক্ষ জন্মে। কুকুর, শূকর, ও হাঁস মুরগী, এই সকল গৃহপালিত পশু পক্ষী। মাচ অপর্য্যাপ্ত।

এই জঙ্গলময় দ্বীপেও মানুষের বসতি আছে। এখানকার লোকদিগকে আমরা দ্বীপের নামানুসারে নিকোবারী বলি। ইহারাও আন্দামানিদিগের ন্যায় খর্ব্বকায় কিন্তু তাম্রবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ নহে। ইহাদের চক্ষু চীনেদের চক্ষুর মত; নাক ছোট, আবার চ্যাপটা; মুখের হাঁ খুব বড়; পুরুষদিগের মুখে অতি অল্প দাড়ি গজায়; চুল কৃষ্ণবর্ণ এবং খাড়া। ইহারা সমুদ্রের বেলাভূমিতে কুঁড়ে ঘর বাঁধিয়া বাস করে; এক এক গ্রামে পনের কুড়ি ঘর থাকে, কুটীরগুলি নিতান্ত ছোট নহে: এক এক ঘরে কুড়ি বাইশ জন ধরে। বর্ম্মারা যেমন মাচা বাঁধিয়া তাহার উপর ঘর তোলে, ইহারাও তেমনি বড় বড় খুঁটি পুতিয়া ছয় সাত হাত মাচা বাঁধিয়া, তাহার উপরে ঘর বাঁধে, ঘরের চাল ঘাস দিয়া ছায়; জানালা রাখে না, ঘরগুলি গোলাকার। মাচার ভিতর দিয়া সিঁড়ি বহিয়া নীচের দিক দিয়া ঘরে উঠিতে হয়। রাত্রিকালে ইহারা সিঁড়ি তুলিয়া লয়।

মাচ ধরাই ইহাদের প্রধান কার্য্য। শূকরমাংস, পক্ষিমাংস, কচ্ছপের মাংস, মৎস্য, নারিকেল, জাম, ও অন্যান্য ফল ইহাদের খাদ্য।

ইহারা অলস, ভীরু, বিশ্বাসঘাতক, এবং মাতাল। আগে

আগে বিলাতী জাহাজের খালাসিরা তীরে নামিত, আর সুযোগ পাইলেই ইহারা তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিত। অনেক সময়ে ইহারা খালাসিদিগকে যত্ন করিয়া গৃহে লইয়া গিয়া কিছু খাইতে দিত, খালাসিরা যখন অন্যমনস্ক হইয়া আহারে বসিয়া যাইত, অমনি নিকোবারিরা তাহাদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া মারিয়া ফেলিত; বেচারারা আত্মরক্ষার পর্য্যন্ত সুযোগ পাইত না।

১৩ হইতে ১৫ বৎসরের মধ্যে যুবতীদিগের বিবাহ হয়। যুবতীরা যে যার বর পছন্দ করিয়া লয়। নিকোবারিরা একাধিক বিবাহ করে না; কিন্তু সামান্য কারণে, অথবা বিনা কারণেই স্ত্রীত্যাগ করিয়া অপরাকে গ্রহণ করিয়া থাকে।

কেহ মরিলে, তাহার তীর ধনুক, বিছানা পত্র ইত্যাদি সমস্ত তাহার সহিত মাটীতে পুতিয়া দেয়। পরিবারের কেহ মরিলে দুই মাস কাল সকলে হবিষ্যান্ন গ্রহণ করে—তামাকু পর্য্যন্ত খায় না। ঐসচ কাল অতীত হইলে কবর খুঁড়িয়া পচা দেহটা বাহির করে; বাহির করিয়া, মাথাটা লইয়া গিয়া মৃত ব্যক্তির স্ত্রী অথবা মা অতি পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলে; দেহের অবশিষ্টাংশ পুনরায় মাটীতে পুতিয়া ফেলে; আর কখনও তোলে না। ইহারা এক প্রকার পরকাল মানে, ইহাদিগের বিশ্বাস এই যে, কেহ মরিলে তাহার আত্মা প্রেতলোকে যায়, এবং প্রেতদিগের সঙ্গে যুটিয়া নরকুলের মঙ্গলামঙ্গল করে। জালে মাচ না পড়িলে, সে দোষ প্রেতের, গ্রামে জ্বর বা অন্য কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হইলে, সে দোষও প্রেতের। ইহারাও ওঝা ডাকাইয়া ভূত ছাড়ায়। ভূতে মানুষের দেহ মধ্যে কোন ফিকিরে পাথরের টুকুরা বা শূয়রের দাঁত প্রবেশ করাইয়া দেয়, ওঝাড়া মন্ত্রবলে তাহা বাহির করিয়া ফেলিলে পীড়া আরোগ্য হয়।

অনেক সময়ে ভূত তাড়াইবার জন্য ভোজের আয়োজন হয়। পুরোহিত ও নিমন্ত্রিত লোকেরা সকলে মিলিয়া, মদ খাইতে ও

তামাকু টানিতে থাকে। এ দিকে স্ত্রীলোকেরা স্বর করিয়া গান গাহিতে গাহিতে ভূতের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে নানা উপহার দ্রব্য টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দিতে থাকে। এত গেল সাধ্য সাধনা; ইহাতে ভূত চলিয়া না গেলে, ওঝারা তাড়ি খাইয়া চুর হইয়া, সর্ব্বাঙ্গে তৈল ও রং মাখিয়া ভূতকে আক্রমণ করিতে যায়; কখনও সাধ্য সাধনা, কখনও প্রহার, অবশেষে ভূতের সঙ্গে ওঝাদের হাতাহাতি লড়াই হয়। এ দিকে স্ত্রীলোকেরা চীৎকার করিতে থাকে। পূর্ব্বেই এক খানি খেলনা নৌকা প্রস্তুত করতঃ তাহা পাতা দিয়া সাজাইয়া রাখা হয়। ওঝারা তাড়াইয়া অবশেষে ভূতগুলিকে এই নৌকায় লইয়া যায়। যুবকেরা মিলিয়া এক খানি নৌকায় চড়িয়া, তাহার সহিত ভূতের নৌকা বান্ধিয়া দেয়। এই প্রকারে যুবকেরা সমুদ্রের অনেক দূরে লইয়া গিয়া ভূত-সমেত খেলনা নৌকা খানি ডুবাইয়া দিয়া আনন্দ করিতে করিতে তীরে আইসে। তীরে আসিয়া আমোদ আহ্লাদে আবার যোগ দেয়। কাঁধে কাঁধে হাত দিয়া যুবকেরা চক্রাকারে দাঁড়াইয়া নৃত্য করে; নৃত্য আর কিছুই নয়, লম্ফ ঝম্প মাত্র; কিন্তু তালে তালে লম্ফ দেয়। নৃত্য কালে যে বাদ্য বাজায়, তাহা অতি বিকট। গত শতাব্দীতে ওলোন্দাজেরা এই সকল দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করে। কতক লোক আসিয়া বসতিও করে, কিন্তু কিছু কাল পরে তাহারা জ্বর হইয়া মরিয়া যায়। ১৮৬৯ শালে এই সকল দ্বীপ বৃটিশসাম্রাজ্য ভুক্ত হইয়াছে। তদবধি নিবাসিরা আর জাহাজডুবি খালাসিদিগকে মারিয়া ফেলিতে বা কোন জাহাজ আসিয়া লাগিলে লুঠ করিতে পারে না। এই সকল দ্বীপে বিস্তর নারিকেল জন্মে। এখানকার নারিকেল ও সুপারি কলিকাতায় ও ভারতবর্ষের অন্যান্য বন্দরে আমদানি হইয়া থাকে। আমরা যে সুপারিকে জাহাজী সুপারি বলি, তাহা এই সকল দ্বীপ হইতে আইসে।

উপসংহার।

ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান জাতীয় ও কতকগুলি পর্ব্বত-নিবাসী অসভ্য লোকের বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল। এদেশে যে এত প্রকার লোকের বাস, এবং এখনও এত লোক অতি অসভ্য অবস্থায় রহিয়াছে, তাহা দেশের অনেকেই জ্ঞাত নহেন। বহুসংখ্যক লোকে এখনও, আফ্রিকার কাফ্রিদিগের ন্যায়, ভূত-প্রেত মানে। কেবল পর্ব্বতনিবাসী অসভ্য লোকেই যে ভূত প্রেতের পূজা দেয়, তাহা নহে; নগরনিবাসী যে সকল লোক কিয়ৎপরিমাণে লেখা পড়া জানে, তাহারাও ভূতের পূজা দেয়। ইহা অতি দুঃখের বিষয়। আমরা সভ্য হইয়াছি, লেখা পড়া শিখিয়াছি, সাহিত্য বিজ্ঞানের আলোচনা করি, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিষয়ে আমাদিগের দেশের অবস্থা কিরূপ, বল দেখি?

স্যর মনিয়র উইলিয়ম্ কি বলেন, শুন;—

"আকাশে ও পৃথিবীতে এমন কিছু নাই, হিন্দুরা যাহার উপাসনা করিতে না পারে;—চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রাবলি; পাহাড়, গ্রাম্যপশু, পাথর; বৃক্ষ, লতা, ঘাস; সমুদ্র, পুষ্করিণী, এবং নদী; ব্যবসায়ের যন্ত্র; উপকারী জন্তু; সর্প ইত্যাদি সরীসৃপ; বিশেষ গুণবান, বীর্য্যবান ও সাধু বা অসাধু মানুষ; দৈত্য দানব, ভূত প্রেত, পিতৃলোকের আত্মা; অসংখ্য অর্দ্ধমনুষ্য ও অর্দ্ধদেবাকৃতি প্রাণী, সপ্ত পৃথিবী ও সপ্ত আকাশ মণ্ডলস্থ নিবাসীগণ, এ সকলেই ন্যূনাধিক পরিমাণে হিন্দুদিগের পূজা পায়।"

ঠিক কথা! ওলাবিবি, ঘেঁটু, পঞ্চানন্দ ইত্যাদিও ত এদেশের পূজ্য দেবতা। আবার ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের লোকেরা মাঘ ফাল্গুন মাসে মাটি দিয়া এক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া

তাহার পূজা করে। এই দেবতার নাম "দক্ষিণরায়।" আবার স্ত্রীলোকেরা কত প্রকার ব্রত করিয়া থাকে, তাহা অনেকেরই জানা আছে; মেয়েলী ব্রত গুলির উদ্দেশ্য বড় সরল, কিন্তু মূল কুসংস্কার ও অজ্ঞানতা।

হিন্দুরা এত রাজ্যের জীব জন্তুর পূজা করেন, কিন্তু এক জনের আরাধনা করেন না—ঈশ্বরের আরাধনা কোন্ হিন্দুতে করেন? ঈশ্বরকে তাঁহারা সৃষ্টিস্থিতি-পালন-কর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁহার আরাধনা করেন না; তাঁহারা সোনা ফেলিয়া আঁচলে গিরা দেন।

সে কালে কুপথগামী যিহূদীদিগের উপর বিরক্ত হইয়া ঈশ্বর বলিয়াছিলেন, "আমিও তোমার মত, তুমি এমত অনুমান করিতেছ?" এই পৃথিবীর সৃষ্টিস্থিতি-পালন-কর্ত্তা এক মাত্র ঈশ্বর, ইহা স্বীকার করিয়াও, হিন্দুরা তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়া, নানা কল্পিত দেবতার ও সৃষ্ট বস্তুর আরাধনা করিতেছেন। আজিও যে গয়ার ও পুরীর দালালেরা দেশময় বেড়াইয়া, গদাধরের পাদপদ্মে পিণ্ড-দানের এবং রথে বামনমূর্ত্তি দর্শনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করিয়া যাত্রি সংগ্রহ করে, সে কি উপচিকীর্ষা বৃত্তি-প্রণোদিত হইয়া? বালকেও বলিবে, তাহা নহে; তাহারা টাকা উপার্জ্জনের জন্য এরূপ করে। কলিকাতা সহরে, এবং নানা পল্লীগ্রামে উড়িয়া ব্রাহ্মণেরা ছোট বড় জগন্নাথমূর্ত্তি স্থাপন করিয়া বসিয়া আছে—কেন? যাহারা পুরী যাইতে অক্ষম, নকল বামনমূর্ত্তি দেখাইয়া তাহাদিগকে পুনর্জন্মগ্রহণের দায় হইতে উদ্ধার করিবার জন্য? —না; টাকার জন্য, ইহাই তাহাদিগের জীবিকা।

ঠিক এই রূপে সে কেলে চতুর লোকে এক একটা দেবতার কল্পনা করিয়া ধর্ম্মভীরু সরলমতি লোকদিগের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়াছে।

আবার পুস্তকের নায়ক নায়িকাদিগকেও অনেকে দেবতা

বলিয়া মানে, যেমন রাম ও কৃষ্ণ; কবিরা মধুর পদ্যে ইহাদিগকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, লোকে তাই ইহাদিগকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া মানে। ফলে ইহারা মানুষ মাত্র।

মহারাণীর কোন প্রজা,—ধর, খুব ক্ষমতাশালী প্রজা যদি আপনাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করে, তবে কি হয়? মহারাণী তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ধরিয়া আনিয়া দণ্ড দেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভিন্ন আর কাহাকেও সম্রাট বা সম্রাজ্ঞী বলিয়া মানা নিষিদ্ধ। তেমনি এই সৃষ্ট জগতে ঈশ্বরই একা সৃষ্ট প্রাণীর আরাধ্য, তিনি সমগ্র সৃষ্টির আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। "আমার সমক্ষে তোমার অন্য দেবতা না থাকুক," ইহাই ঈশ্বরের প্রথম আজ্ঞা।

ঈশ্বর আমাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাই আমাদিগের পিতা; আবার তিনি আমাদিগের রাজাও।

সুতরাং ঈশ্বরকে ত্যাগ করিয়া অন্য কোন কিছুর আরাধনা করিলে ঈশ্বরের অপমান হয়, তাঁহার আজ্ঞা অমান্য করা হয়। তাহাতে প্রকাশ পায় যে, আমরা আর তাঁহাকে আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতে দিতে চাহি না। এই পৃথিবীর নিতান্ত প্রজাবৎসল ও দয়াময় রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিলে যে দোষ হয়, পরম পুত্রবৎসল পিতার আজ্ঞালঙ্ঘন, এবং পরম উপকারী বন্ধুর প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলে যে দোষ হয়; সেই সকল দোষকে যদি অযুত অযুত বার গুণ কর, তথাপি জানিবে, দেবতার আরাধনায় তাহা অপেক্ষাও অধিক পাপ হয়।

ঈশ্বর স্বয়ম্ভূ; অপরিবর্ত্তনশীল; অসীম ক্ষমতাশালী, অসীম মঙ্গলময়, অসীম করুণাপূর্ণ, ও পবিত্র। এমন মঙ্গলময় প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের আরাধনা না করিয়া লোকে কি না গাছপাথর ও ভূত প্রেতের ও মাটীর প্রতিমার পূজা করে! ভারতবর্ষের মধ্যে হিন্দুরাই না বড় সভ্য?—এই সভ্য হিন্দুরা কি না শিবলিঙ্গের

পূজা করেন। বাস্তবিকই হিন্দুধর্ম্ম পাপ ও কুসংকারে পরিপূর্ণ। এক্ষণে যে প্রকার ভাবগতি দেখিতেছি, তাহাতে নিরুৎসাহ ও উৎসাহ, এ উভয়ের কারণ আছে।—

হিন্দু সমাজের যাঁহারা উত্তম শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, যাঁহারা জানেন যে, রাহু নামক চণ্ডালে চন্দ্র বা সূর্য্যকে গ্রাস করে না, অন্য কারণে গ্রহণ হইয়া থাকে, তাঁহারাও গ্রহণ লাগিলে হাঁড়ি ফেলেন এবং স্নান করিয়া শুদ্ধ হয়েন; যাঁহারা শিক্ষা প্রভাবে জানেন যে, পৃথিবী অনন্ত নাগের মাথায় স্থাপিত নহে, শূন্যে রহিয়াছে, ভূমিকম্প হইলে তাঁহারাও শঙ্খ বাজাইয়া থাকেন; পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের আলোচনাদ্বারা যাঁহারা জ্ঞাত হইয়াছেন যে, কোন জিনিষ বিশেষের আহারে শরীর অশুচি হয় না, তাই অকাতরে উইলসন হোটেলে আহার করেন, অথচ ঘটা করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করেন; তাঁহাদের কপটাচরণ দেখিলে ভারতহিতৈষীর মনে নিতান্ত নিরুৎসাহ জন্মে। লোকে মনে মনে যাহা ঘৃণা করেন, সমাজে প্রকাশ্যরূপে সেই সকল কুসংস্কারমূলক আচার ব্যবহারের পোষকতা করিয়া থাকেন। ইহাতে অজ্ঞান ও অনক্ষর লোকদিগের কুসংস্কার আরও দৃঢ় হইয়া যায়। অনেকে এই প্রকার আচরণকে দেশহিতৈষিতা বলিয়া থাকেন, ফলে ইহা দেশ-বিদ্রোহিতা।

উৎসাহের কারণও আছে।—

ইংরাজি শিক্ষা-সুলভ জ্ঞানজ্যোতি ভারতবর্ষীয় লোকদিগের হৃদয়ের অন্তঃস্তরেও প্রবিষ্ট হইয়াছে। আইন তুলিয়া দিলেও কি আজি কোন হিন্দু যুবতী কন্যাকে তদীয় স্বামীর চিতায় ধরিয়া ফেলিয়া দিবেন? কখনও না। আর নরবলি হয় না; আর লোকে শিশু কন্যাহত্যা করে না; আর কেহ সাগরে শিশু সন্তান ফেলিয়া দেয় না, আর কেহ প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গম-স্থলে ডুবিয়া মরে না। আইন তুলিয়া দিলেও এ সকল কাজ আর

কেহ করিবে না। এ সকল ইংরাজি শিক্ষার ফল। ভারতবর্ষে আর দাসত্ব প্রথা নাই। নানা জাতীয় লোকে একত্র অকাতরে রেল গাড়িতে এবং ষ্টিমারে যাতায়াত করিতেছে। জাতিভেদ-প্রথাজনিত অত্যাচার হেতু যাহারা সমাজের অন্ধকারাবৃত কোণে পড়িয়াছিল, তাহারা উন্নত হইয়া উঠিতেছে। সে কালে স্ত্রীলোকে লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হইত, এক্ষণে লেখা পড়া না শিখিলে ভদ্র লোকের মেয়ের সুপাত্র যোটে না। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রেই যে ন্যূনাধিক পরিমাণে বিধবাবিবাহ বিষয়ে আন্দোলন চলিতেছে, তাহারও মূল ইংরাজি শিক্ষা। ম্যাথরের ছায়া স্পর্শ করিলে সে কালে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, এক্ষণে ব্রাহ্মণের ছেলেরা অকাতরে মেডিকেল কলেজে মেথরের মরা কাটিয়া শারীরস্থান বিদ্যা শিখিতেছেন।

লোকের মতামত ক্রমে মার্জ্জিত হইতেছে। হিন্দুধর্ম্মসুলভ কুসংস্কার ও অত্যাচারে সহস্র সহস্র বৎসর লোকের সংবেদ কলুষিত ও সমাজ অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হইয়াছিল। হিন্দু সমাজেই অনেকে ইহা বুঝিতে পারিয়া সমাজ সংশোধনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। ইহাঁদিগের অপেক্ষা সূক্ষ্মদর্শী আর এক দল লোক বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমূল পরিবর্ত্তনের আবশ্যক। হিন্দুধর্ম্মপ্রণালীর ভিত্তিমূলই ভ্রান্তির উপরে স্থাপিত ; ঈশ্বর সকলের পিতা, এবং মনুষ্যেরা পরস্পর ভ্রাতা, হিন্দুধর্ম্ম এই দুই প্রধান মূলশিক্ষার বিপরীত ; আমাদের প্রধান অভাব কি ? পাপ ক্ষমা—হিন্দুধর্ম্মে তাহা পাওয়া যায় না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আসামের খাসিয়া জাতীয় লোকেরা গারো, নাগা, কুকি ইত্যাদি লোকদিগের ন্যায় অসভ্য ছিল, কুসংস্কার-রূপ ঘোরান্ধকারে ডুবিয়া ছিল। ইহাদের ভাষায় এক খানিও পুস্তক ছিল না। এক্ষণে মিশনারিদিগের যত্নে হাজার হাজার খাসিয়া পবিত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের ভাষায়

পুস্তক হইয়াছে; অনেকে লেখা পড়া শিখিয়া বাঙ্গালিদিগের ন্যায় গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী হইয়াছে। খাসিয়া প্রদেশে স্কুল হইয়াছে. খাসিয়াদিগের ছেলে মেয়েরাও লেখা পড়া শিখিতেছে। তিনেবেলি ও ত্রিবাঙ্কোর অঞ্চলের লোকেরাও বড় অসভ্য ছিল। যাহারা পূর্ব্বে মদ খাইয়া মত্ত অবস্থায় ভূতের পূজা করিত, এক্ষণে তাহাদের অনেকে সে সকল ছাড়িয়া একমাত্র সত্য ঈশ্বরের সরল ভক্ত ও খ্রীষ্টের ভক্ত হইয়াছে।

ভারতবর্ষীয় চার্ব্বাকেরা যেমন ধর্ম্মের বিরোধী, সকল দেশেই এই প্রকার এক এক দল লোক থাকে। এই প্রকার নাস্তিক ইংলণ্ডেও আছে। ইউরোপে খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের ক্রমেই বিলোপ হইতেছে; শিক্ষিত ও তীক্ষ্নবুদ্ধি লোকে আর এ ধর্ম্মের ধার ধারে না; কেবল অশিক্ষিত অবোধ লোকেই খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম মানে; কতকগুলি ইংরাজ নাস্তিকে ভারতবর্ষীয় শিক্ষিত হিন্দুদিগের অনেকের মনে এই ধারণা জন্মাইয়া দিয়াছেন। এ বড় ভুল। ইংলণ্ডের বিস্তর বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, ব্যবস্থাজ্ঞ পণ্ডিত প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান। গ্লাডষ্টোন্ সাহেব কি অশিক্ষিত নিম্ন শ্রেণীস্থ লোক? আবার দেখ, পৃথিবীর সর্ব্বত্র খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারিত হইতেছে। এই কার্য্যের জন্য, ইউরোপ ও আমেরিকার লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছে। ইহা দ্বারাই জানা যাইতেছে, খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের প্রভা দিন দিন বর্দ্ধিত ও বহুবিস্তৃত হইতেছে।

এই ধর্ম্মের স্থাপনকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বলিয়াছেন, "দরিদ্রদিগের নিকট সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে।" প্রথমে দরিদ্রেরাই এই ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিল; ধনবান, ও বড় মানুষেরা পর্থিব সুখে মগ্ন এবং পার্থিব মানমর্য্যাদা লইয়া ব্যস্ত ছিল। আমাদের ভারতবর্ষেও তাই হইয়াছে; তথাপি এদেশীয় রাজবংশীয় এবং উচ্চ জাতীয় অনেক লোকেও খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন। কর্পূরতলার রাজকুমার হরনাম সিংহ, কোচীনের রাজপুত্র

রামবর্ম্ম; জ্ঞানেন্দ্র মোহন ঠাকুর, কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি। স্বর্গীয় নীলকণ্ঠ নিহিমায়া মহারাষ্ট্রী পণ্ডিত ছিলেন।

এক দিন না এক দিন ভারতবর্ষে পৌত্তলিক ধর্ম্মের বিলোপ হইবে। এক্ষণে ভারতবর্ষীয় লোকে যে সকল প্রতিমার পূজা করিয়া থাকে, ইউরোপের লোকেও এক সময়ে অন্যান্য নামে এই প্রকার নানা প্রতিমার পূজা করিত। এক্ষণে আর ইউরোপে পৌত্তলিক ধর্ম্ম নাই। ভারতবর্ষেও কালক্রমে তাই হইবে। এক্ষণে যুপিতর ও মিনার্বার মন্দির যেমন খালি পড়িয়া রহিয়াছে, ভারতবর্ষের শিবের ও বিষ্ণুর মন্দিরও তেমনি খালি পড়িয়া থাকিবে।

"যে দেবগণ গগনমণ্ডলের ও ভূমণ্ডলের সৃষ্টি করে নাই, তাহারা এই ভূমণ্ডল হইতে ও এই গগনমণ্ডলের অধো হইতে উচ্ছিন্ন হইবে।" বাইবেল শাস্ত্রের এই বচন অবশ্য সফল হইবে।

ইউরোপে মোক্ষমূলর নামক জর্ম্মণ পণ্ডিত অতি বিখ্যাত। সংস্কৃত ও অন্যান্য প্রাচ্য ভাষায় ইনি বড় পণ্ডিত। মোক্ষমূলর বলিয়াছেন, "এক সময়ে হিন্দু, ইংরেজ ও অন্যান্য আর্য্যবংশীয় লোকেরা একই ধর্ম্ম মানিতেন, এবং কিছু কাল একই নামে একই ঈশ্বরের আরাধনা করিতেন, সেই নামের অর্থ স্বর্গপিতা।" এমন সময় আসিতেছে, যখন আবার সকল দেশীয় আর্য্য সন্তানেরা এক জন আর এক জনকে ভ্রাতা বলিয়া আলিঙ্গন করিবে, এবং একই স্থানে জানু অবনত করিয়া, "হে আমাদিগের স্বর্গস্থ পিতঃ," বলিয়া সেই বহুকালের পুরাতন স্তোত্র বলিবে।

পাঠক, লোকের প্রশংসার লোভে কোন কাজে হাত দিও না, অথবা সমাজের ভয়ে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইও না। যাহাতে দেশের লোকের ইহ পরকালে মঙ্গল হয়, কর্ত্তব্য জ্ঞানে তাহা করিও।

কিন্তু ঈশ্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে কেহ সংক্রিয়াসাহস পাইতে পারে না। ঈশ্বরের নিকট জ্ঞান প্রার্থনা করা তোমার প্রথম কার্য্য, এই রূপে প্রার্থনা কর।

"হে জ্ঞানের আকর ঈশ্বর, হে পরম দয়াময়, হে জগৎ পিতঃ, তোমার উজ্জ্বল জ্ঞানরশ্মিতে আমার অজ্ঞানান্ধ হৃদয় আলোকিত করিয়া দেও; এবং তোমার তত্ত্ব আমাকে জ্ঞাত কর।"

যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য অবহেলা করিয়াছ, চিন্তায়, কথায় ও কার্য্যে যে সকল পাপ করিয়াছ, তদ্বিষয় মনে আন্দোলন কর, তাহা হইলে তোমার মন আপনি ঈশ্বরের কাছে দোষ স্বীকার করিতে চাহিবে; বলিবে, "হে স্বর্গস্থ পিতঃ, আমি পাপ করিয়া তোমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিবার অযোগ্য হইয়াছি।"

হিন্দু ধর্ম্ম মতে কর্ম্মফল ভোগ না করিলেই নয়। ব্রাহ্মেরা বলেন, পাপ করিলেই সমুচিত যাতনা ভোগ করিতে হইবে; কিন্তু খ্রীষ্টীয়ান ধর্ম্মের সার এই, মানুষকে পাপে মগ্ন, এবং নিজ গুণে পাপের দণ্ড এড়াইতে অক্ষম দেখিয়া ঈশ্বর স্বীয় অদ্বিতীয় পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে ধরাতলে প্রেরণ করেন। তিনি প্রাণ দান করতঃ আমাদিগের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন। এক্ষণে যীশু পাপী নরের একমাত্র ত্রাণকর্ত্তা। ঈশ্বর পবিত্র আত্মা পাঠাইয়া আমাদের অন্তঃকরণ পবিত্র করিতে চাহেন। এস্থলে খ্রীষ্ট ধর্ম্মের শিক্ষা বিস্তারিত রূপে বলিবার স্থান নাই। বাইবেল পাঠ করিলেই সমস্ত জ্ঞাত হওয়া যায়।

এরূপ করিলে কেবল নিজে শিক্ষিত হইলে হইবে না, স্ত্রী পুত্র ও আত্মীয় স্বজনকেও শিক্ষা দিবার ক্ষমতা ও আকাঙ্ক্ষা জন্মিবে।

সমাপ্ত।

Billings: Saptahik Sambad Press, Bhowanipore, Calcutta, 1896